

ব্লাড লাইন

প্রাপ্তবয়স্ক থ্রিলার

সিডনি শেলডন

রূপান্তর ● অনীশ দাস অপু



বিশ্বের অন্যতম ধনবান পিতার একমাত্র কন্যা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি এলিজাবেথ রোফ। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে তার হাতে এসে যায় অগাধ ক্ষমতা ও কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ। আর সেই মুহূর্তে কোথাও একজন সিদ্ধান্ত নেয় মরতে হবে এলিজাবেথকে... শুরু হয়ে যায় টানটান এক রোমাঞ্চোপন্যাসের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা। কয়েকটি মহাদেশকে ঘিরে অতিবাহিত হতে থাকে কাহিনী যার উপজীব্য রোমান্স, সেক্স, ষড়যন্ত্র এবং আরও অনেক কিছু ...

ISBN 984 8740 03 1

প্রাপ্তবয়স্ক রোমাঞ্চোপন্যাস

ব্লাড লাইন

সিডনি শেলডনের বিশ্বখ্যাত রোমাঞ্চোপন্যাস

ব্লাড লাইন

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪ ০৩

বর্ণবিন্যাস
সেতু কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৩৬০৫

প্রচ্ছদ : ধ্রুবএষ

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

BLOOD LINE : TRANSLATED BY ANISH DAS APU
Published by Afzal Hosen, Anindya Prokash
6 Shrishdas Lane Dhaka-1100 Phone 71 2 44 03
First Published : February 2007
Price : Taka 200.00
US $ 8

ISBN 984 8740 03 1

উৎসর্গ

ইয়াসির ইয়ামীন
প্রধান সম্পাদক, *সিলেট বাজার*

এ বইয়ের পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক তিনি। লেখার মান নিয়ে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের এ মানুষটি যখন 'ব্লাড লাইন' পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন; পাঠক, আমার বিশ্বাস আপনারও ভালো লাগবে এ বই।

ভূমিকা

ব্লাড লাইন সিডনি শেলডনের অন্যতম জনপ্রিয় বেস্ট সেলার। দুর্দান্ত গতিশীল এর কাহিনী। রোমাঞ্চোপন্যাসটি সম্পর্কে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর মন্তব্য : 'শেলডন এমন একজন লেখক যিনি এ বইতে তাঁর শক্তির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়েছেন ... এমনভাবে তিনি আমাদেরকে টেনে নিয়ে গেছেন, বইটি শেষ না-করা পর্যন্ত উঠতে পারিনি।' পাঠক, গ্যারান্টি দিচ্ছি, *ব্লাড লাইন* হাতে নেয়ার পর পড়া শেষ না করে আপনিও উঠতে পারবেন না। তবে একটা কথা : *ব্লাড লাইন* কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। কারণ কাহিনীর প্রয়োজনে লেখক তাঁর বইতে প্রচুর যৌনতা আমদানি করেছেন। মূল রস অক্ষুণ্ন রাখতে আমি সেসব যৌনাত্মক বর্ণনার কোথাও কাঁচি চালাইনি। অনুবাদক হিসেবে এটুকুই বলতে পারি : *ব্লাড লাইন* অনুবাদ করে আমি তৃপ্তি পেয়েছি। আশা করি আপনিও উপভোগ করবেন!

অনীশ দাস অপু
২৬৩, জাফরাবাদ
শঙ্কর, ঢাকা-১২০৫

এক

ইস্তাম্বুল
শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর
রাত দশটা

হাজিব কাফিরের ইস্তাম্বুলের অন্ধকার অফিসে একা বসে আছে রিজ উইলিয়ামস। প্রাচীন মিনারগুলোর দিকে আনমনা চোখ। ইস্তাম্বুল ওর প্রিয় শহরগুলোর একটি। এখানে এলে ভালোই লাগে। তবে আজ এ শহরের প্রাচীন মিনারের সৌন্দর্যের প্রতি নজর নেই রিজের। বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মন। প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে ভেতরে। ঘণ্টাখানেক আগে একটা ফোন পেয়েছে সে। ওই খবরটাই ভাঙা টেপরেকর্ডারের মতো টানা বেজে চলছে মনের মধ্যে : ... ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটেছে, মি. উইলিয়ামস। শেষ হয়ে গেছি আমরা। ব্যাপারটা এমন আকস্মিক ছিল যে, আমরা তাকে রক্ষা করার কোনো সুযোগই পাইনি। মি. স্যাম রোফ মারা গেছেন স্যার...

স্যাম রোফ, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ওষুধ কোম্পানির মাল্টিবিলিওনেয়ার কর্ণধার, পাহাড়ে চড়তে গিয়ে পা ফস্কে মারা গেছেন। ভাবতেও অবিশ্বাস্য লাগে। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর সিংহপুরুষটির অপঘাত মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না রিজ। মানুষটির ঘর ছিল আকাশ। সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত অসংখ্য কোম্পানির কাজে তাঁকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হত। নিত্যনতুন ধারণা দিতে জুড়ি ছিল না তাঁর। সব সমস্যার সমাধান করতেন ঠাণ্ডা মাথায়। এমন একজন অসাধারণ মানুষের অপঘাত মৃত্যু...

নাহ্, আর ভাবতে পারছে না রিজ উইলিয়ামস। রিজ জানে স্ত্রী কিংবা কন্যার চেয়েও তাঁর কাছে প্রিয় ছিল ব্যবসা। রোফ অ্যান্ড সন্স ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। প্রাণের চেয়েও প্রিয় তাঁর এই বিশাল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের এখন কী হবে? কে আসবে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে? এই বিশাল সাম্রাজ্য চালাবার ক্ষমতা তিনি কাকে দিয়ে গেছেন? রিজ যতদূর জানে স্যাম রোফ তাঁর ব্যবসার উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কোনো উইল তৈরি করেননি। উইল তৈরি করার কথা তিনি ভাবতেনই না। বয়স ছিল মাত্র বাহান্ন। প্রায়ই বলতেন উত্তরাধিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এখনও আসেনি। তার জন্যে সামনে এখনও অনেক সময় পড়ে আছে। কিন্তু সেই সময় যেন হঠাৎ করেই ফুরিয়ে গেল। মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আশ্চর্য প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর মানুষটিকে।

স্যাম রোফ পাহাড়ে চড়তে গিয়ে পা পিছলে গভীর খাদে পড়ে গিয়েছেন। তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকছে। স্যাম রোফ দুর্দান্ত পর্বতারোহী ছিলেন। ব্যবসার পর এই একটি জিনিসের প্রতিই তার অসীম দুর্বলতা ছিল। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে চড়তেন। মন্ট ব্লঙ্ক পাহাড় বাইতে গিয়েছিলেন স্যাম রোফ। জুরিখ থেকে প্লেনে ওঠার সময় হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'রিজ, দেখো এবার আমি মন্ট ব্লঙ্কের চূড়ায় রোফ অ্যান্ড সন্সের পতাকা পুঁতে দিয়ে আসব।' রোফের আশা পূরণ হয়নি। তাঁর ক্ষতবিক্ষত নিষ্প্রাণ দেহ এখন মন্ট ব্লঙ্কের গভীর কোনো খাদের গহিন অন্ধকারে পড়ে আছে।

হঠাৎ জ্বলে উঠল ঘরের বাতি। ভাবনায় ছেদ পড়ল রিজ উইলিয়ামসের। মুহূর্তের জন্যে কিছুই ঠাহর করতে পারল না।

'মি. উইলিয়ামস! স্যার, আমি দুঃখিত। আমি জানতাম না ভেতরে আপনি আছেন।' মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে এল দোরগোড়া থেকে। দরজার কাছে সোফি দাঁড়িয়ে। কোম্পানির ইস্তাম্বুল শাখার সেক্রেটারি। স্থানীয় মেয়ে। বয়স পঁচিশের কোঠায়। মুখটা সুন্দর। মেদহীন ধারালো শরীর। সংক্ষিপ্ত স্কার্ট, উরুর অনেকাংশ অনাবৃত। হাজিব কাফির অনেকবার রিজকে ইঙ্গিত দিয়েছে ইচ্ছে করলে সে সোফিকে ব্যবহার করতে পারে। সোফিও বহুবার সূক্ষ্মভাবে আভাসে জানিয়েছে, চাইলেই রিজ তাকে পেতে পারে। কিন্তু সাড়া দেয়নি রিজ।

'আমার কয়েকটা চিঠি টাইপ করা বাকি ছিল। আমি যাচ্ছি। অবশ্য আপনার জন্যে কিছু করতে পারলে ধন্য হব।' বলতে বলতে রিজের ডেস্কের দিকে এগিয়ে এল সোফি। সোফির ব্লাউজের উর্ধ্বাংশের ফাঁক দিয়ে অনাবৃত স্তনের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। সেন্টের সুঘ্রাণ পেল রিজ। সোফির এই গন্ধ কোনো কোনো পুরুষকে পাগল করে তোলে। রিজ ভাবলেশহীন মুখে জানতে চাইল, 'কাফির কোথায়?'

সোফি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'জানি না, স্যার। উনি কয়েক দিনের ছুটি নিয়েছেন।' ফর্সা, মসৃণ হাত দিয়ে উরুর কাছের কাপড় সমান করতে করতে কালো ভেজা চোখ মেলে সোফি পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। 'আর কিছু, স্যার?'

'হ্যাঁ, কাফিরকে খুঁজে বের করো। ওকে আমার দরকার।'

সোফি চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ঠিক জানি না ওনাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে।'

'সামনের বার-টারগুলোতে যাও। কারভানসারা কিংবা মারমারা নাইট ক্লাবে খোঁজ নাও।' রিজ জানে ওখানে কাফিরের রক্ষিতা বেলি ড্যান্সার হিসেবে নাচে।

'চেষ্টা করে দেখছি। তবে হয়তো পাওয়া যাবে না।'

'পাবে কি-না জানি না, কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে কাফির এখানে না এলে চাকরিটা সে চিরদিনের জন্যে হারাবে।'

রিজের কণ্ঠে দৃঢ়তা লক্ষ্য করে আর কথা বলার সাহস পেল না সোফি। 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি তাঁকে খুঁজতে।'

'আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেয়ো।'

আবার অন্ধকারে ডুবে গেল রিজ উইলিয়ামস। অন্ধকারের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। এই জগতের সাথে একাত্ম হয়ে ভাবতে ভালো লাগে ওর। কী আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি সব ওলটপালট হতে পারে! এই সেদিনও স্যাম রোফের সঙ্গে রিজের কথা হল। আর এরই মধ্যে এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল?

ভাবছে রিজ। স্মৃতির গভীরে ডুবে যাচ্ছে।

মি. স্যাম রোফের সাথে রিজের পরিচয় বহুদিনের। ন' বছর আগে। রিজের বয়স তখন পঁচিশ। একটা ছোট ওষুধের দোকানে সেলস ম্যানেজারি করে। কোম্পানিটা ছোট হলেও ধীরে ধীরে আয়তনে বৃহৎ হচ্ছিল। সেইসাথে বুদ্ধিমান এবং করিতকর্মা হিসেবে রিজেরও সুনাম বেড়ে চলছিল। রোফ অ্যান্ড সন্সের কাছ থেকে এই সময় চাকরির একটা লোভনীয় প্রস্তাব আসে। কিন্তু রিজ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তাবটা। তার কয়েক দিন পরেই জানতে পারে ওদের কোম্পানিটা কিনে নিয়েছে রোফ অ্যান্ড সন্স। তারপর একদিন স্যাম রোফের খাস কামরায় ডাক পড়ল রিজ উইলিয়ামসের। প্রথম সাক্ষাতের প্রতিটি মুহূর্ত এখনো চোখে ভাসে ওর।

'তুমি এখন রোফ অ্যান্ড সন্সের অধীনে কাজ করছ। বলতে পারো তোমার কারণেই এই কোম্পানিটা কিনে নিয়েছি।'

স্যাম রোফের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন প্রশংসার সুর টের পেয়ে উৎফুল্ল হল রিজ। সেই সাথে একধরনের অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল।

'কিন্তু আমি যদি এখানে কাজ করতে না চাই?'

দরাজ গলায় হেসে উঠলেন স্যাম রোফ। 'তুমি চাইবে, রিজ, কাজ করতে চাইবে। তোমার সাথে একটা দিকে আমার ভীষণ মিল। আমরা দুজনেই প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দুজনেই জগৎটাকে জয় করতে চাই। আর সেই পথটাই আমি তোমাকে বাতলে দেব।' রোফের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুর। প্রথম দিনেই ভালো লেগে গেল বিশালদেহী, বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটাকে। আর মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করে। অভিভূত হল যখন বুঝতে পারল স্যাম রোফ ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন। কী যে হয়ে গেল জানে না রিজ। বাঁধভাঙা বন্যার মতো চেপে থাকা সমস্ত আবেগের বিস্ফোরণ ঘটল। স্যাম রোফকে সে অকপটে খুলে বলল সব কথা। আর তাঁর জীবনকাহিনী শোনার পর স্যাম রোফ মনে-মনে ভাবলেন ঠিক লোকটিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন তার আগামী যুদ্ধের জন্যে। একে দিয়েই হবে।

রিজ উইলিয়ামসের জন্ম গোয়েন্ট এবং কারমাখেনের কাছে এক খনি এলাকায়। লাইমস্টোন আর কয়লার কালো কালো টুকরো উপত্যকার সমস্ত সবুজ ঢেকে রেখেছে। এই কয়লাখনিতে শ্রমিকরা পুরুষানুক্রমিকভাবে কাজ করে আসছে। এদের জীবনে কোনো স্বপ্ন নেই। আসলে এরা স্বপ্ন দেখতেই ভুলে গেছে। কয়লাখনি রিজের পরিবারের অনেককেই গ্রাস করেছে। কেউ যক্ষ্মায় বিনা-চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। ওদের পরিবারের খুব কম লোকই ত্রিশের বেশি বাঁচতে পেরেছে।

রিজ তার বাপ আর চাচাদের স্মৃতি রোমন্থনের কথা শোনে। এই রোমন্থনে সুখের কোনো কথা নেই, শুধুই ভয়াবহ দুঃখকষ্টের গল্প। শুনতে শুনতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে রিজ। এই বদ্ধ জায়গাটা ওর যেন দম বন্ধ করে দেয়। খালি পালাতে ইচ্ছে করে। আর একদিন সত্যি সত্যি রিজ পালাল এখান থেকে।

রিজের বয়স তখন বারো। নোংরা বাড়িঘর ছেড়ে দৌড়াতে দৌড়াতে সে চলে এল সাগরতীরে। জীবনে এই প্রথম ও বাড়ি থেকে এতদূর এসেছে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই শুধু ভালো ভালো পোশাক-পরা হাসিখুশি মানুষদের চোখে পড়ে। ওদের প্রত্যেককে ভীষণ সুখী আর বড়লোক বলে মনে হল রিজের। এখানে এসে খানিকটা স্থির হওয়ার পর ছোট্ট একটা কাজ জুটিয়ে নিল সে। যেসব মহিলা এখানে পিকনিক করতে এসেছিলেন তাদের ভারী পিকনিক-বাস্কেটগুলো বইতে সাহায্য করল ও। বিনিময়ে কয়েক আনা পয়সাও পেল। কিন্তু পয়সা নয়, গোগ্রাসে সে গিলতে লাগল চারিদিকের দৃশ্যপট; দেখে যেন আর আশ মেটে না।

সেদিন কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাড়ির বাইরে ছিল রিজ। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টাই ওর মনে বিরাট এক পরিবর্তন এনে দিল। ও এই প্রথম জানল নোংরা কালিঝুলি-মাখা এই বস্তির বাইরে একটা জগৎ আছে। সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে এখানকার মতো নাকি-কান্না নেই, অশ্লীল খিস্তি নেই, নেই ক্ষুধার তীব্র জ্বালা। সেই জগতের প্রতিটি পুরুষ যেন দেবদূত আর প্রতিটি নারী যেন রাজকন্যা। রিজের মনে হল ওই জগতে বাস করার জন্যেই তার জন্ম; এখানে এই নরকের অন্ধকারে চিরকাল ডুকরে মরার জন্যে নয়।

বয়স যখন চৌদ্দ, রিজ উইলিয়ামস আবার বাড়ি থেকে পালাল। তবে এবার চিরতরে। কিছু পয়সাপাতি জুগিয়েছিল। সেটা নিয়ে চলে এল লন্ডনে। প্রথম তিনটা দিন শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে মহানগরীকেই দেখল। প্রতিটি দৃশ্য দেখল ক্ষুধার্তের মতো, প্রতিটি গন্ধ গিলল বুভুক্ষের মতো আর প্রতিটি শব্দ শুনল দু'কান ভরে।

এক কাপড়-ব্যবসায়ীর দোকানে ডেলিভারি বয় হিসেবে লন্ডনে রিজের প্রথম চাকরি হল। দোকানে সহকর্মী হিসেবে আছে তিনজন। দুজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। সবাই ওর চেয়ে বয়সে বড়। পুরুষদুটো শুরু থেকেই রিজকে পাত্তা দিল

না। ওর সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করল। ওদের কাছে রিজ যেন একটা সঙ। অদ্ভুত পোশাক পরে, ভদ্রতা জানে না, কথা বলে দুর্বোধ্য উচ্চারণে। রিজের নামটাকেও ওরা বিকৃতভাবে বলতে লাগল। কখনো বলে রাইস, কখনো রাই, আবার কখনো রাইজ। রিজ বারবার নিজের নাম সংশোধন করে দেয়। কিন্তু ওরা ইচ্ছে করেই ভুল উচ্চারণ করে।

কিন্তু মেয়েটার মায়া পড়ে গেল রিজের ওপর। ওর নাম গ্ল্যাডিস সিম্পকিনস। আরো তিনটে মেয়ের সাথে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে থাকে। একদিন রিজকে সে নিজেই বাড়ি নিয়ে গেল দাওয়াত দিয়ে। চা খেতে দিল। পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন-স্বপ্ন মনে হল রিজের। কেউ ওকে দাওয়াত করতে পারে এ-ব্যাপারটাই ওর কল্পনার বাইরে। তাও আবার স্বয়ং গ্ল্যাডিসের বাড়িতে যাকে বারবার দেখে তৃষ্ণা মেটে না রিজের। রিজ আমন্ত্রণের গন্ধ পেল। ও এখন প্রায় নিশ্চিত যে, এবারই তার কৌমার্য ভঙ্গ হতে চলেছে। সাহসী হয়ে উঠল সে। গ্লাডিসের বাহুতে হাত রাখল। মেয়েটা একমুহূর্তের জন্যে অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে, তারপর ফেটে পড়ল হাসিতে।

'আমি তোমাকে ওই সুযোগটা দিচ্ছি না।' হাসতে হাসতে বলল গ্ল্যাডিস। 'তবে কিছু উপদেশ দেব, কাজে লাগবে। শোনো, জীবনে যদি কিছু করতে চাও, তাহলে এই জংলি চেহারা ছেড়ে ভদ্র হয়ে যাও। ভালো পোশাক পরো, লেখাপড়া করো, আর সেই সাথে ভদ্র ব্যবহারটাও শেখো।' রোগা চেহারার ছেলেটার সাগরের মতো চোখের দিকে তাকিয়ে কী দেখল গ্ল্যাডিসই জানে, গাঢ় গলায় বলল, 'আমি জানি তুমি যখন বড় হবে তখন অনেক বড় হবে।'

জীবনে যদি কিছু করতে চাও— গ্ল্যাডিসের এই কথাটা যেন নতুন করে জন্ম দিল আরেক রিজকে। আগের রিজ ছিল একটা অশিক্ষিত, গেঁয়ো ছোকরা, যার ছিল না কোনো পারিবারিক অতীত। ছিল না শিক্ষাদীক্ষা কিংবা অন্য কিছু। তবে তার মধ্যে ছিল কল্পনাশক্তি, ছিল বুদ্ধি এবং বড় হওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। আর অনেক বড় হওয়ার জন্য এগুলোই যথেষ্ট। রিজ নিজেকে নতুনরূপে দেখতে চাইল, চাইল বর্তমানের মরচে-ধরা খোলস ত্যাগ করে ঝকঝকে লেবাস গায়ে জড়াতে। এখন সে আয়নার দিকে তাকালে বোকা চেহারার নোংরা-পোশাক-পরা আগের সেই ছেলেটাকে দেখে না, দেখে রীতিমতো পালিশ-করা ঝকঝকে একটা ছেলেকে— যে ভদ্র, কোমল, নরম এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী।

আস্তে আস্তে রিজ আয়নার এই নতুন ইমেজটা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করল নিজের মধ্যে। আর এই ইমেজকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে নেমে পড়ল রণাঙ্গনে। রাতের বেলা সে নৈশ স্কুলে ক্লাস করে। আর ছুটির দিনগুলোতে ঘুরে বেড়াতে থাকে বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে। পাবলিক লাইব্রেরির বইগুলো সে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

নিয়মিত যেতে শুরু করল থিয়েটারে। তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে দামি আসনে বসা দামি-কাপড়-পরা অভিজাত নারী-পুরুষদের। পয়সা বাঁচিয়ে খেতে শুরু করল সে। জমানো টাকাটা নিয়ে মাসে একবার ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢোকে। অভিজাতরা কেমন করে খায়, কেমন করে খাবার টেবিলে আচরণ করে ইত্যাদি জিনিসগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে থাকে রিজ খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে। প্রতিটি জিনিসই সে গেঁথে নেয় মনের মধ্যে। ওর প্রকৃতি যেন স্পঞ্জের মতো। সবকিছু শুষে নেয়।

একবছরের মধ্যেই রিজ উইলিয়ামস বুঝতে পারল তার স্বপ্নকন্যা গ্লাডিস সিম্পকিনস সামান্য এক ককনিগার্ল মাত্র। মেয়েটাকে বিছানায় নিয়ে যাওয়ার পরদিনই ওর প্রতি সকল আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল সে। কাপড়ওয়ালার দোকানের কাজটা ছেড়ে এবার একটা কেমিস্ট শপে চাকরি নিল রিজ। ওর বয়স তখন ষোলো। কিন্তু বয়সের তুলনায় ভারিক্কি দেখায় ওকে। খুব দ্রুত লম্বা হয়ে উঠছে সে এবং সুদর্শন। ওর নীল চোখের সম্মোহনী দৃষ্টির দিকে এখন মেয়েরাই সাগ্রহে তাকায়, আর মিষ্টি, সপ্রতিভ কথা বলার ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়। দোকানে খুব ভালো কাজ দেখাতে লাগল রিজ। রিজ যতক্ষণ দোকানে না আসে মেয়েরা অপেক্ষা করতে থাকে। ওর কাছ থেকে জিনিস কিনতে না পারলে কী যেন অসম্পূর্ণতা থেকে যায় তাদের মধ্যে। রিজ এখন সুন্দরভাবে কাপড় পরতে শিখেছে। কথাও বলে শুদ্ধ উচ্চারণে। ওর মধ্যে আগের সেই জড়তা আর নেই। কিন্তু এখনো যখন সে আয়নার দিকে তাকায়, নিজেকে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারে না। ওর সামনে লম্বা একটা পথ পড়ে আছে। ঐ পথটা তাকে পাড়ি দিতে হবে সাফল্যের সাথে।

দুই বছরের মধ্যে প্রমোশন হল রিজের। দোকানের ম্যানেজার হল সে। এ দোকান একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র। ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার একদিন কথায় কথায় রিজকে বললেন, 'এই সবে শুরু, উইলিয়ামস। ভালো করে খাটো, একদিন তুমি আধডজন স্টোরের সুপারিন্টেডেন্ট হতে পারবে।'

রিজ ম্যানেজারের কথা শুনে হেসে ফেলেছিল আর কি। লোকটার কাণ্ড দ্যাখো! একজন মানুষের সর্বোচ্চ প্রত্যাশা কি-না এই হতে পারে! রিজ একদিকে কাজ করে, অন্যদিকে ক্লাস করে। ও একই সাথে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মার্কেটিং এবং কমার্শিয়াল আইন শিখছিল। কিন্তু ওর প্রত্যাশা আরো বেশি। আয়নায় যে ইমেজটা সে দেখে সেই ইমেজে নিজেকে সে মইয়ের সর্বোচ্চ ধাপে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই ধাপ এখনো কত উঁচুতে! রিজ এখনো মইয়ের তলায় পড়ে আছে। ওকে এই মই বেয়ে অনেক উপরে উঠতে হবে, অনেক উপরে।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই রিজ উইলিয়ামসের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করল। এক ড্রাগ-সেলসম্যান এসেছিল ওর দোকানে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল রিজ

কী চমৎকারভাবে পটিয়ে পটিয়ে কয়েকজন মহিলা খদ্দেরের কাছে অপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস গছিয়ে দিচ্ছে। মহিলারা চলে গেলে লোকটা রিজকে বলল, 'তুমি এখানে অযথাই সময় নষ্ট করছ, হে। তোমার আরো বড় পুকুরে সাঁতার কাটা উচিত।'

'আমাকে সেই সুযোগটা কে দেবে, শুনি?' জানতে চাইল রিজ।

'আমি তোমার কথা আমার বস্কে বলব।' বলে চলে গেল লোকটা।

দুই সপ্তাহ পর ঐ লোকটা রিজকে ছোটখাটো একটা ড্রাগ-ফার্মে সেলসম্যান হিসেবে ঢুকিয়ে দিল। ঐ দোকানে আরো পঞ্চাশজন সেলসম্যান কাজ করত। কিন্তু রিজ বিশ্বাস করত প্রতিযোগিতাটা ওদের সাথে নয়, নিজের সাথে। নিজের সেই কল্পিত ইমেজের সাথে সে যেন আগের চেয়ে একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছে। কল্পনার রিজ যেন আস্তে ধীরে বাস্তব রূপ নিতে শুরু করেছে। এই রিজ জানে সে যা চায় তা এককথায় প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সেইসাথে সে মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করে এই অসম্ভবকে একদিন সম্ভব করে তোলাও সম্ভব হবে।

ফার্মের কাজে রিজকে সারাদেশে ঘুরতে হয়। বিক্রি করে ফার্মের জিনিসপত্র। বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলে, তাদের বক্তব্য আগ্রহ নিয়ে শোনে। ধীরে ধীরে ভারী হয় অভিজ্ঞতার ঝুলি। সেইসাথে চলতে থাকে আরোহণ-পর্ব।

তিন বছর পর রিজকে কোম্পানি তাদের জেনারেল সেলস ম্যানেজার পদে প্রমোশন দিল। ওর দক্ষ গাইডেন্সের কারণে ফুলেফেঁপে উঠতে লাগল কোম্পানি।

এভাবে কেটে গেল চারটি বছর। তারপর একদিন স্যাম রোফের আবির্ভাব ঘটল তার জীবনে। রিজকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন এ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। 'তুমি একদম আমার মতো,' স্যাম রোফ বলেছিলেন, 'আমরা দুনিয়াটা জয় করতে চাই। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব কীভাবে দুনিয়া জয় করতে হয়।'

স্যাম রোফ গড়ে তুললেন চালচুলোহীন অতি দরিদ্র পরিবার থেকে আসা রিজ উইলিয়ামসকে। জহুরি জহর চেনে। স্যাম রোফের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় অচিরেই কোম্পানির জন্য অমূল্য এক সম্পদ হয়ে দাঁড়াল রিজ। যত দিন যায় ততই তার কাঁধে নতুন নতুন দায়িত্ব চেপে বসে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রিজ সেই দায়িত্ব পালন করে। সে প্রায়ই নতুন নতুন আইডিয়া দেয় যার ফলে রোফ অ্যান্ড সন্সের প্রচুর ব্যবসায়িক লাভ হতে থাকে। শেষপর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, রোফ অ্যান্ড সন্সের সেকেন্ডম্যান বলতে সবাই রিজ উইলিয়ামসকেই বোঝে। কোম্পানির প্রেসিডেন্ট পদের জন্য রিজ ছাড়া অন্য কারো কথা চিন্তাই করা যায় না।

কিন্তু রিজ প্রচণ্ড ধাক্কা খেল একদিন। সেদিন সকালে স্যাম রোফ তার নিজস্ব বিলাসবহুল বোয়িঙে কারাকাস থেকে ফিরছেন ওকে নিয়ে। মন তার ভারি খুশি। ভেনেজুয়েলার সরকারের সাথে তাদের একটা লাভজনক চুক্তি হয়েছে।

'এই সাফল্যের জন্যে তোমার একটা মোটা অঙ্কের বোনাস পাওনা হল, রিজ।' হাসি-হাসি মুখ করে বললেন স্যাম রোফ।

রিজ শান্ত গলায় বলল, 'আমি বোনাস চাই না, স্যাম। বরং আপনার কোম্পানির কিছু স্টাফসহ বোর্ডের ডিরেক্টরদের একটা আসন পেলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।'

এটা রিজের পাওনা ছিল। কিন্তু মাথা নাড়লেন স্যাম। 'তা হয় না, রিজ। আমি তোমার জন্যে হলেও নিয়ম ভাঙতে পারব না। রোফ অ্যান্ড সন্স একটি প্রাইভেট কোম্পানি। পারিবারিক সদস্য ছাড়া বাইরের কারও বোর্ড অব ডিরেক্টসের আসনে বসার নিয়ম নেই।'

রিজ জানত একথা। সে এর আগে প্রতিটি বোর্ড মিটিঙে অংশ নিয়েছে। তবে সদস্য হিসেবে নয়। কারণ সে একজন বহিরাগত। রোফদের রক্তের শেষ পুরুষ ছিলেন স্যাম রোফ। পরিবারের আর সবাই মহিলা। এই মহিলারা যাদের বিয়ে করেছেন পারিবারিক নিয়মানুসারে তারা কোম্পানির সদস্য হিসেবে বোর্ডের আসন পেয়েছেন।

রিজ জানত বোর্ডে বসার সমস্ত যোগ্যতা তার আছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল স্যাম রোফের পর একমাত্র সে-ই এই কোম্পানি দক্ষ হাতে চালাতে পারবে। কিন্তু তার একমাত্র ত্রুটি সে রোফ-বংশের কেউ নয়, বহিরাগত। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। স্যাম রোফের সরাসরি প্রত্যাখ্যান প্রচণ্ড একটা ঘুসির মতো লাগলেও রিজ সিদ্ধান্ত নেয় সে এই কোম্পানিতেই থাকবে। ধৈর্য ধরে দেখবে পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত কোন্ দিকে মোড় নেয়। তার কিছুদিন পরেই স্যাম রোফ মারা গেলেন। রিজ উইলিয়ামস ঠিক করেছে সে আরো ধৈর্য ধরবে। খেলার চূড়ান্ত না-দেখে কোথাও নড়বে না।

অফিসের বাতিগুলো আবার জ্বলে উঠল। হাজিব কাফির দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। কাফির রোফ অ্যান্ড সন্সের টার্কিশ সেলস ম্যানেজার। লোকটা খাটো, মোটা পেটটা ফুলে আছে গর্ভবতী মেয়েদের মতো। রিজকে দেখেই সে তড়িঘড়ি কৈফিয়ত দিতে শুরু করল, 'রিজ, আমাকে মাফ করে দিন। আপনি এখনো যে ইস্তাম্বুলে ভাবিইনি আমি। আপনি তো তখন প্লেন ধরতে যাচ্ছিলেন। আর আমারও একটা জরুরি কাজ পড়ে গেল যে—'

'বসো, হাজিব', ওকে থামিয়ে দিল রিজ। 'মন দিয়ে শোনো। আমি তোমাকে দিয়ে কোম্পানি কোডে চারটা ক্যাবল পাঠাতে চাই। বিভিন্ন দেশে ওগুলো যাবে। তোমার নিজস্ব সংবাদদাতা হাতে করে পৌঁছে দেবে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ', কিছু না-বুঝেই বলল কাফির।

রিজ হাতঘড়ির দিকে তাকাল। 'নিউ সিটি পোস্ট অফিস এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে। ক্যাবলগুলো ইয়েনি পোস্টেন ক্যাড থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ওদের যাত্রা শুরু হয়েছে আমি দেখতে চাই।' হাত বাড়াল সে কাফিরের দিকে। ক্যাবলের একটা কপি গুঁজে দিল। 'ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। কেউ যেন এটা নিয়ে আলোচনা না করে। তাহলে তার চাকরি খতম।'

কাফির ক্যাবলের দিকে চোখ বুলিয়েই আঁতকে উঠল। 'ও খোদা! এ আমি কী দেখছি!' ঢোক গিলে সে রিজের গম্ভীর মুখের দিকে চাইল, 'কী— কীভাবে এই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল?'

'একটা দুর্ঘটনায় মারা পড়েছেন স্যাম রোফ।' বলল রিজ। আবার ডুবে গেল চিন্তায়। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হাজিব কাফির।

রিজ উইলিয়ামস এখন এলিজাবেথের কথা ভাবছে। এলিজাবেথ স্যাম রোফের একমাত্র মেয়ে। ওর বয়স চব্বিশের কোঠায়। এলিজাবেথ যখন পঞ্চদশী কিশোরী, তখন তাকে প্রথম দেখে রিজ। খুব লাজুক, মোটা আর অন্তর্মুখী স্বভাবের মেয়ে ছিল এলিজাবেথ। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করেছে রিজ, সময়ের সাথে সাথে কী দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে এলিজাবেথের শরীর আর মনে। যেন সম্পূর্ণ এক নারী হয়ে উঠছিল সে। মায়ের সৌন্দর্য আর বাপের বুদ্ধি এবং শক্তির সম্মেলনে অনন্যা হয়ে উঠছিল এলিজাবেথ রোফ। বাপকে প্রচণ্ড ভালোবাসত সে। রিজ জানে বাপের এই আকস্মিক মৃত্যু কী ভয়ংকর আঘাতই না করবে তাকে। কষ্ট করে হলেও মৃত্যুসংবাদটা রিজ নিজেই এলিজাবেথকে পৌঁছে দেবে।

দুই ঘণ্টা পর রিজ উইলিয়ামসকে নিয়ে কোম্পানি জেট ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা শুরু করল।

দুই

বার্লিন
সোমবার, সেপ্টেম্বর ৭
সকাল ১০টা

অ্যানা রোফ গ্যাসনারের গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বহুকষ্টে সামলে রাখছে নিজেকে। জানে ভালথার ফিরে এসে ওকে কাঁদতে দেখলে খুন করে ফেলবে। নিজের শোবার ঘরের এককোনায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে অ্যানা, কাঁপছে থরথর করে। অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্য। রূপকথার গল্পের মতো যে জীবনের শুরু হয়েছিল তার পরিণতি ঘটতে চলেছে প্রচণ্ড আতঙ্ক আর সীমাহীন ভয়ের মাঝে। সত্যের মুখোমুখি হতে অনেক সময় লেগেছে ওর, যে-লোকটাকে ও বিয়ে করেছে সে একটা খুনী উন্মাদ।

ভালথার গ্যাসনারের সঙ্গে পরিচয়ের আগে অ্যানা রোফ কাউকে ভালোবাসেনি , তার মা-বাবা এমনকি নিজেকেও নয়। অ্যানা অসুস্থ, দুর্বল, ভঙ্গুর একটি মেয়ে। ওর মনে পড়ে না হাসপাতাল, নার্স কিংবা ডাক্তার ছাড়া ওর একটি দিনও কেটেছে। দূরদূরান্তে ওকে নিয়ে যাওয়া হত। কারণ ওর বাবা রোফ অ্যান্ড সন্সের অ্যান্টন রোফ, কাজেই বার্লিনে অ্যানার চিকিৎসার জন্য বিশ্বসেরা বিশেষজ্ঞরা উড়ে আসতেন। কিন্তু নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পরে তারা চলে গেছেন। অ্যানার অসুখটা ধরতে পারেননি।

অন্য বাচ্চাদের মতো স্কুলে যেতে পারেনি অ্যানা। একটা সময় নিজের একটা জগৎ তৈরি করে নেয় সে, স্বপ্ন আর কল্পনার এক রাজ্য। এখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। নিজের জীবনের ছবি নিজেই আঁকে অ্যানা, কারণ বাস্তবের রঙ মেনে নেয়া তার জন্য খুব কঠিন ছিল।

আঠারো বছর বয়সে অ্যানার অদ্ভুত অসুখটা হঠাৎ করেই সেরে যায়। তবে এ অসুখ ওর জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যে বয়সে বেশিরভাগ মেয়ে প্রেমে পড়ে কিংবা বিয়ে করে, সে বয়সে অ্যানা কোনো ছেলেকে চুমু খায়নি পর্যন্ত। তবে নিজের স্বপ্নের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল সে। সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে সে।

পঁচিশ বছর বয়স থেকে তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল। কারণ অ্যানা রোফ বিশ্বের অন্যতম ধনী একটি প্রতিষ্ঠানের একজন উত্তরাধিকারী। অনেকেই তার

সম্পদের অংশীদার হতে চাইল। প্রস্তাব এল সুইডিশ কাউন্ট, ইতালিয়ান কবি এবং ক্ষুদ্র, অভাবী কিছু দেশের রাজকুমারদের কাছ থেকে। অ্যানা সবাইকে প্রত্যাখ্যান করল। কন্যার ত্রিশতম জন্মদিনে অ্যান্টন রোফ আক্ষেপ করে বললেন, 'নাতি-নাতনীর মুখ না-দেখেই আমাকে মরতে হবে।'

ত্রিশতম জন্মদিনে অ্যানা অস্ট্রিয়ার কিৎজুবেলে গেল। ওখানে পরিচয় হল ওর চেয়ে তেরো বছরের ছোট, স্কি ইন্‌স্ট্রাক্টর ভালথার গ্যাসনারের সঙ্গে। ভালথারকে দেখে প্রথম দর্শনেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল অ্যানার, বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছিল ভালথার, অ্যানার মনে হল এমন সুন্দর দৃশ্য জীবনে দেখেনি সে। স্কিরানের নিচে চলে এল ও ভালথারকে ভালো করে দেখার জন্য। যেন তরুণ এক দেবতা, তাকে স্রেফ দেখেই তৃপ্তি পাচ্ছিল অ্যানা। ভালথার লক্ষ করল, অ্যানা তাকে দেখছে। 'আপনি স্কি করছেন না, ফ্রাউলিন?'

শুধু মাথা নাড়তে পারল অ্যানা, গলায় রা ফুটল না। হাসল ভালথার, 'তাহলে চলুন একসঙ্গে লাঞ্চ করি।'

স্কুলের মেয়ের মতো আতঙ্কে ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে এল অ্যানা। তারপর থেকে ভালথার গ্যাসনার তার পিছু লেগে রইল। অ্যানা রোফ বোকা নয়। জানে সে বিদুষী কিংবা রূপবতী কোনোটাই নয়। স্রেফ সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে। নিজের নামটা ছাড়া একজন পুরুষকে দেয়ার মতো কিছুই নেই তার। তবে অ্যানা জানে সাধারণ মেয়েটার মধ্যে বাস করছে একটি সুন্দর মনের আবেগী নারী, যে কবিতা এবং সংগীত ভালোবাসে। অ্যানা সুন্দরী নয় বলেই হয়তো তার মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি পিপাসা প্রবল। সে বড় বড় জাদুঘরে গিয়ে চিত্রকলা আর ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। ভালথার গ্যাসনারকে দেখার পর তার মনে হল সকল দেবতা যেন তার জন্য জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।

অ্যানা দ্বিতীয় দিন টেনারহফ হোটেলে সকালের নাস্তা করছে, তার সঙ্গে যোগ দিল ভালথার গ্যাসনার। তরুণ এক দেবতার মতোই লাগছিল তাকে। শেভ করা ঝকঝকে চেহারা, দাঁতগুলো আশ্চর্য মসৃণ এবং সাদা। সোনালি চুল, চোখের রঙ হালকা ধূসর। স্কির কাপড়ের নিচে তার বাইসেপ এবং উরুর শক্তিশালী পেশির নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছিল অ্যানা। তার ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠল।

'কাল বিকেলে আপনাকে খুঁজতে পাহাড়ে গিয়েছিলাম,' বলল ভালথার। অ্যানা চুপ করে রইল। কথা বলতে পারছে না। 'স্কি করতে না-জানলে আমি আপনাকে শেখাতে পারি।' হাসল সে, তারপর যোগ করল, 'তবে পয়সা লাগবে না।'

ভালথার অ্যানাকে হাউসবার্গে নিয়ে গেল স্কির প্রথম সবক শেখাতে। একটু পরে দুজনেই বুঝে গেল অ্যানাকে দিয়ে স্কি হবে না, বারবার ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে ধপাশ হল অ্যানা তবু শেখার জন্য জেদ ধরে রইল। ওর ভয় হচ্ছিল হাল ছেড়ে দিলে ভালথার ওকে ভর্ৎসনা করবে। দশবারের বার মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ার পর ওকে সিধে হতে সাহায্য করল ভালথার। তারপর নরম গলায় বলল, 'এর চেয়ে ভালো কাজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।'

'কী সেটা?' করুণ গলায় প্রশ্ন করল অ্যানা।

'আজ রাতে ডিনারে বলব।'

সন্ধ্যায় দুজনে ডিনার করল এবং পরদিন সকালে একসঙ্গে নাস্তা খেল। তারপর লাঞ্চ করল। রাতে আবার ডিনার। ভালথার তার শিক্ষার্থীদের শেখানো বাদ দিয়ে অ্যানাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকল। সে অ্যানাকে নিয়ে তার গোল্ডেন গ্রিফের ক্যাসিনোতে গেল, প্লেনে চড়ল, শপিং করল, পাহাড়ে উঠল এবং হোটেলের বারান্দায় বসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা গল্প করল। অ্যানার কাছে মুহূর্তগুলো জাদুর মতো মনে হল।

সাক্ষাৎ হবার পাঁচদিন পরে ভালথার অ্যানার হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'অ্যানা, প্রিয়ে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

অ্যানাকে যেন তার স্বপ্নরাজ্য থেকে নির্মম বাস্তবে ঠেলে ফেলে দেয়া হল। প্রস্তাবটি পছন্দ হল না অ্যানার। চলে যেতে চাইল সে। বাধা দিল ভালথার। 'আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি অ্যানা, তুমি এভাবে চলে যেতে পারো না।'

অ্যানা শুনল ভালথার বলছে, 'আমি এর আগে আর কাউকে ভালোবাসিনি।' ভালথারের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল অ্যানার। ভালথারকে সে নিজের ঘরে নিয়ে এল। নিজের জীবনের গল্প বলল ভালথার। হঠাৎ ভালথারকে বিশ্বাস করতে শুরু করল অ্যানা। অবাক হয়ে ভাবল : এ যেন আমার নিজের জীবনের গল্প।

অ্যানার মতে ভালথারের জীবনেও কেউ ভালোবাসার মতো ছিল না। বেজন্মা হয়ে জন্ম নেয়ার কারণে জগৎ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে তাকে। অসুখ যেমন অ্যানাকে সবার কাছ থেকে গুটিয়ে রাখত। অ্যানার মতো ভালথারও ভালোবাসা চাইত। এতিমখানায় মানুষ সে, তেরো বছর বয়সে দিব্যকান্তি তরুণে রূপান্তর ঘটে তার। এতিমখানার মহিলারা ব্যবহার করত ভালথারকে। নিজেদের সঙ্গে বিছানায় নিয়ে যেত, শেখাত কীভাবে তৃপ্তি দিতে হয়। পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত খাবার এবং বাড়তি মাংসের টুকরো পাতে পড়ত ভালথারের, সেইসঙ্গে চিনিসহ ডেসার্ট। সবই পেয়েছে সে শুধু ভালোবাসা ছাড়া।

বড় হওয়ার পরে এতিমখানা থেকে পালিয়ে আসে ভালথার। কিন্তু বাইরের পৃথিবীটা তার কাছে আলাদা কিছু মনে হয়নি। সুন্দর চেহারার জন্য মহিলারা তাকে ব্যবহার করতে চায়, এর বেশি কিছু নয়। তারা ওকে নানা উপহার এবং টাকা দেয় কিন্তু নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয় না।

অ্যানা বুঝতে পারল ভালথার ওর আত্মা, ওর অবিকল প্রতিমূর্তি। ওরা টাউন হলে চুপিচুপি বিয়েটা সেরে ফেলল।

অ্যানা ভেবেছিল তার বাবা খুশিতে আটখানা হবে। উল্টো তিনি ফেটে পড়লেন রাগে। 'তুমি একটা বোকা,' গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন তিনি। 'একটা অপদার্থ

লোভী লোককে বিয়ে করেছ। ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি আমি। সে বহু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে কিন্তু কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করার মতো বোকামি করেনি।'

'চুপ করো।' কেঁদে উঠল অ্যানা। 'তুমি ওকে চিনতে পারোনি।'

কিন্তু অ্যান্টন রোফ ঠিকই চিনেছেন ভালথার গাসনারকে। তিনি নতুন জামাতাকে তার অফিসে দেখা করতে বললেন।

ভালথার কালো-প্যানেলিং-করা দেয়াল এবং ঝোলানো পুরোনো ছবিগুলো সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মন্তব্য করল, 'ঘরটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'তা তো হবেই। কারণ এতিমখানার চেয়ে এটা ভালো।'

ভালথার কটমট করে তাকাল শ্বশুরের দিকে। হঠাৎ তার চোখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল। 'আই বেগ ইয়োর পারডন।'

অ্যান্টন বললেন, 'ওসব ভদ্রতা রাখো। তুমি একটি ভুল করে ফেলেছ। আমার মেয়ের কোনো টাকা নেই।'

ভালথারের ধূসর চোখ পাথর দেখল। 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'আমি তোমাকে পরিষ্কার ভাষায় বলছি, তুমি অ্যানার কাছ থেকে কিছুই পাবে না। কারণ ওর কাছে কিছু নেই। তুমি ভালো করে খোঁজখবর নিলে জানতে পারতে রোফ অ্যান্ড সন্স ক্লোজ-হেল্ড কর্পোরেশন। এর মানে হল এর কোনো স্টক বিক্রি করা যাবে না। আমরা শুধু আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করি, এই-ই যা। এখান থেকে তোমার কিছু প্রাপ্তির আশা নেই।' পকেট হাতড়ে একটা খাম বের করলেন তিনি। ভালথারের সামনে ডেস্কে ছুড়ে দিলেন। 'এতে তোমার সমস্যার সমাধান হবে। আমি চাই তুমি বার্লিন থেকে কেটে পড়বে। অ্যানার সঙ্গে আর কোনোদিন যোগাযোগ করবে না।'

ভালথার শান্ত গলায় বলল, 'আপনার কি একবারও মনে হয়নি আমি অ্যানাকে বিয়ে করেছি ওকে ভালোবেসেছি বলে?'

'না,' হিমশীতল গলা অ্যান্টনের। 'তোমার কখনও মনে হয়েছে?'

ভালথার একমুহূর্ত তার দিকে তাকাল। 'দেখি তো আমার বাজারদর কত।' খামের মুখ টেনে ছিঁড়ে ফেলল সে। টাকাটা গুনল। আবার চাইল অ্যানটন রোফের দিকে। 'কুড়ি হাজার মার্কের চেয়ে নিজের মূল্য আমি অনেক বেশি মনে করি।'

'যা দিয়েছি তার বেশি একপয়সাও পাবে না। এ নিয়েই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবো।'

'ভাবব,' বলল ভালথার। 'সত্যিকথাটা যদি জানতে চান তো বলি, নিজেকে আমি সত্যি সৌভাগ্যবান ভাবছি।' নিতান্ত অবহেলায় টাকাটা পকেটে রাখল ভালথার, তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন অ্যান্টন রোফ, কৃতকর্মের জন্য নিজেকে সামান্য অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া তার কিছু করারও ছিল না। অ্যানা এ লোককে নিয়ে সুখী হতে পারবে না। দুঃখ পাবে। তবে দুঃখটা পরে পাবার চেয়ে এখন

পাওয়াই ভালো। তিনি অ্যানার বয়সী কোনো পাত্র খুঁজে পাবার চেষ্টা করবেন যে ওকে ভালো না-বাসলেও অন্তত সম্মান করবে। যে অ্যানার ব্যাপারে আগ্রহী থাকবে, তার টাকার প্রতি লোভ থাকবে না। যাকে কুড়ি হাজার মার্কে কেনা যাবে না।

অ্যান্টন বাড়ি এলে অ্যানা দৌড়ে এল বাবার কাছে, চোখে জল। মেয়ের হাত নিজের মুঠিতে পুরে নিয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন পিতা, বললেন, 'অ্যানা শোনো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ওকে—'

অ্যান্টন মেয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালেন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভালথার গ্যাসনার। অ্যানা তার একটা হাত তুলে বাবাকে দেখিয়ে বলল, 'দ্যাখো, ভালথার আমার জন্য কী এনেছে। এত সুন্দর আংটি কখনও দেখেছ? এটার দাম কুড়ি হাজার মার্ক।'

শেষে অ্যানার বাবা-মা বাধ্য হলেন ভালথার গ্যাসনারকে মেনে নিতে। বিয়ের উপহার হিসেবে তারা ওয়ানসিতে একটি চমৎকার জমিদারবাড়ি কিনে দিলেন দামি আসবাবসহ। দোতলায় শোভা পেল ডেনমার্ক এবং সুইডেনের অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পীদের আঁকা দুর্লভ চিত্র।

'এটা খুব বেশি হয়ে গেল,' ভালথার বলল অ্যানাকে, 'আমি তাদের কাছ থেকে কিংবা তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না। আমি এসব জিনিস তোমাকে নিজে কিনে দেয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে চাই।' ছেলেমানুষি একটা হাসি ফোটাল সে মুখে। 'কিন্তু আমার টাকা নেই।'

'অবশ্যই আছে', বলল অ্যানা। 'আমার সবকিছুই তো তোমার।'

তার দিকে মিষ্টি করে হাসল ভালথার। 'তাই?'

ভালথারকে টাকা-পয়সা নিয়ে আলোচনায় অনাগ্রহী দেখালেও অ্যানা জোর করে তাকে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থাটা ব্যাখ্যা করল। অ্যানার নামে একটি ট্রাস্ট ফান্ড আছে যা দিয়ে বেশ আয়েশী জীবনযাপন করা যায়। কিন্তু এ টাকার বেশির ভাগের শেয়ার রোফ অ্যান্ড সন্সের। বোর্ডের পরিচালকদের সর্বসম্মত অনুমোদন ছাড়া এই শেয়ার বিক্রি করা সম্ভব নয়।

অ্যানার কথা শুনে বিশ্বাস হতে চাইল না ভালথারের। অ্যানার কত টাকার শেয়ার আছে জিজ্ঞেস করল সে। অঙ্কটা বলল অ্যানা।

'আর তুমি এ স্টক বিক্রি করতে পারবে না?'

'না, আমার চাচা স্যাম বিক্রি করতে দেবেন না। তিনি শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করেন।'

একদিন...

ভালথার পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করল। অ্যান্টন রোফ ওর বিরোধিতা করলেন।

'একটা স্কি ট্রেনার রোফ অ্যান্ড সন্সে কী অবদান রাখতে পারবে?'

জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কিন্তু মেয়ের কাছে হার মানতে হল তাকে। ভালথারকে কোম্পানির প্রশাসন বিভাগে ঢুকিয়ে দেয়া হল। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে তরতর করে ওপরে উঠতে লাগল সে। দুবছর পরে অ্যানার বাবা মারা গেলেন, ভালথার গ্যাসনারকে বোর্ডের সদস্যপদ দেয়া হল। অ্যানা স্বামীকে নিয়ে খুব গর্বিত। ও প্রেমিক এবং স্বামী হিসেবে অসাধারণ। সবসময় অ্যানার জন্য সে ফুল আর ছোট ছোট উপহার নিয়ে আসে, সন্ধ্যাটা স্ত্রীর সঙ্গে কাটায়। শুধু দুজনে। অ্যানা যেন সুখের সঙ্গে বাস করছে। সে ভালথারের প্রিয় ডিশ খাওয়ানোর জন্য রান্না করা শিখল। ভালথার তার রান্না খেয়ে বলল, 'তুমি পৃথিবীর সেরা রাঁধুনি, প্রিয়ে।' গর্বে রাঙা হল অ্যানা।

বিয়ের তিন বছরের মাথায় গর্ভবতী হল অ্যানা। গর্ভধারণের প্রথম আট মাসের যন্ত্রণা হাসিমুখে সইল সে। কিন্তু একদিন হঠাৎ ওর মনে মৃত্যুচিন্তা ঢুকল। মরতে ভয় পায় না অ্যানা। তবে ভালথারকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনও ভাবতে পারে না। নানা দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল সে। সন্তান হওয়ার হপ্তা-চারেক আগে একদিন দিবাস্বপ্ন দেখার সময় সিঁড়িতে পিছলে গেল অ্যানা। গড়াতে গড়াতে নিচে এসে পড়ল সে।

জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে।

বিছানার পাশে দেখতে পেল ভালথারকে, ওর হাত ধরে আছে। 'তুমি আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছ।'

হঠাৎ আতঙ্ক গ্রাস করল অ্যানাকে। বাচ্চা! পেটে আমার সন্তানের সাড়া পাচ্ছি না। হাত দিয়ে পেট ছুঁল ও। সমতল পেট। 'আমার বাচ্চা কই?'

ভালথার ওকে জড়িয়ে ধরল।

ডাক্তার বললেন, 'আপনার যমজ সন্তান হয়েছে, মিসেস গাসনার।' অ্যানা ফিরল ভালথারের দিকে, তার চোখে জল।

'একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে, সোনা।'

সুখে জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হল অ্যানার। সন্তান কোলে নেয়ার প্রবল আকুতি জাগল মনে। ওদেরকে দেখতে চায় সে, অনুভব করতে চায়, জড়িয়ে ধরতে চায়।

'আপনি আরেকটু সুস্থ হয়ে উঠুন।' বললেন ডাক্তার, 'তারপর ওদেরকে নিয়ে আসব।'

ওরা প্রতিদিনই বলছে সুস্থ হয়ে উঠছে অ্যানা। কিন্তু অ্যানার ভয় লাগছে। কিছু একটা ঘটছে যা ও বুঝতে পারছে না। তবে একদিন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল। অ্যানা হুইলচেয়ারে সওয়ার হয়ে হাসপাতাল ছাড়ল। যদিও হেঁটে যেতে চাইছিল ও। শরীর এখনও যথেষ্ট দুর্বল। কিন্তু অ্যানা এত উত্তেজিত যে সন্তানকে দেখার কাছে সবকিছু ওর কাছে মৌন মনে হচ্ছিল। ভালথার ওকে বাড়ি নিয়ে এল। দোতলায় বেডরুমে নিয়ে যেতে চাইল।

'না, না,' বলল অ্যানা। 'আমাকে নার্সারিতে নিয়ে চলো।'

ভালথার ওকে বিশ্রাম নিতে বলল। শুনল না অ্যানা। ভালথারের বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একছুটে ঢুকে পড়ল নার্সারিতে।

ঘরের পর্দা ফেলা। অন্ধকার। আঁধারে চোখ সইয়ে নিতে একমুহূর্ত সময় লাগল অ্যানার। উত্তেজনায় চোখে ঝাপসা দেখছে, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

ভালথার ওর পেছন পেছন চলে এসেছে। কথা বলছে ওর সঙ্গে, কিছু একটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না অ্যানা।

ওই তো ওরা। দুজনেই ঘুমিয়ে আছে দোলনায়। নরম পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল অ্যানা। তাকাল। এত সুন্দর বাচ্চা জীবনে দেখেনি সে। ছেলেটা ভালথারের মতো সুদর্শন চেহারা পেয়েছে, একমাথা সোনালি চুল। মেয়েটা যেন অপূর্ব সুন্দর একটি পুতুল, স্বর্ণকেশী, ছোট্ট, ত্রিভুজাকৃতির মুখ।

অ্যানা ঘুরল ভালথারের দিকে, আবেগে বুজে এল গলা। 'ওরা এত সুন্দর! আ-আমি খুব সুখী।'

'এসো, অ্যানা,' ফিসফিস করল ভালথার। জড়িয়ে ধরল স্ত্রীকে, তীব্র খিদে জেগে উঠেছে শরীরে। কামনাটা অ্যানাও টের পেল নিজের মধ্যে। দীর্ঘদিন ওরা প্রেম করে না। ভালথার ঠিকই বলেছে, বাচ্চাদেরকে দেয়ার মতো সময় পড়ে আছে প্রচুর।

ছেলেটির নাম রাখা হল পিটার, মেয়েটির ব্রিজিটা। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা নার্সারিতে ওদেরকে নিয়ে খেলা করে সময় কাটিয়ে দিতে লাগল অ্যানা। ওর হুঁশজ্ঞান নেই। ক্লান্ত হয়ে নার্সারিতেই মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে সে। ঘুম ভেঙে দেখে অফিস থেকে ফিরে ভালথার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানতে চাইছে অ্যানা ডিনার রেডি করেছে কি-না। অপরাধবোধে তখন ভোগে অ্যানা। বুঝতে পারে ভালথারের প্রতি তার আরও মনোযোগী হওয়া উচিত। কিন্তু পরদিন একই ঘটনা ঘটে। বাচ্চাদুটো যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে অ্যানাকে। রাতের বেলা বিছানা ছেড়ে সে চুপিচুপি নার্সারিতে ঢোকে, ভোর হওয়া পর্যন্ত দোলনায় ঘুমিয়ে থাকা সন্তানদের দিকে একঠায় তাকিয়ে থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি নিজের বিছানায় চলে আসে ভালথার কিছু টের পাবার আগেই।

একদিন মাঝরাতে ভালথার এসে নার্সারিতে ঢুকল। হাতেনাতে ধরা পড়ল অ্যানা। 'তুমি এখানে এত রাতে কী করছ?

'কিছু না, ডার্লিং, আমি শুধু—'

'বিছানায় যাও।'

অ্যানার সঙ্গে এরকম সুরে আগে কখনও কথা বলেনি সে। সেদিন নাস্তার টেবিলে ভালথার বলল, 'আমাদের ছুটি নেয়া উচিত। চলো, কোথাও থেকে ঘুরে আসি।'

'কিন্তু ভালথার আমার বাচ্চারা এত ছোট যে ভ্রমণের ধকল সইতে পারবে না।'

'আমরা দুজনে শুধু যাওয়ার কথা বলেছি।'

মাথা নাড়ল অ্যানা। 'আমি ওদেরকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

অ্যানার হাত ধরল ভালথার। 'আমি চাই তুমি ওদের কথা ভুলে যাও।'

'বাচ্চাদের কথা ভুলে যাব?' দারুণ মর্মাহত হল অ্যানা। অ্যানার চোখে চোখ রাখল ভালথার। 'অ্যানা, মনে আছে তুমি মা হওয়ার আগে কত সুন্দর সময় কাটিয়েছি আমরা, শুধু দুজনে ছিলাম, আর কেউ আমাদের বিরক্ত করত না।'

ঠিক তখন অ্যানা বুঝতে পারল ভালথার বাচ্চাদুটিকে হিংসা করে।

সপ্তাহ আর মাস চলে যেতে লাগল। ভালথার এখন বাচ্চাদের ধারেকাছেও ঘেঁষে না। ওদের জন্মদিনে অ্যানা উপহার কিনে দেয়। ভালথার ওই সময় ব্যবসার কাজে শহরের বাইরে থাকে ইচ্ছে করেই। অ্যানা বুঝতে পেরেছে বাচ্চাদের ব্যাপারে ভালথারের কোনোই আগ্রহ নেই। দিন দিন কেমন বদলে যাচ্ছে ভালথার। সন্তানদেরকে সে ঘৃণা করে। এখন অ্যানা বুঝতে পারছে ওর বাবা ঠিকই বলেছিলেন ভালথার তাকে টাকার জন্যেই বিয়ে করেছে। সন্তানরা তার কাছে হুমকির মতো। ও তাদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি চায়। বারবার অ্যানাকে সে স্টক বিক্রির কথা বলে। 'আমাদেরকে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার নেই স্যামের। আমরা টাকা নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব। শুধু দুজনে।'

স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় অ্যানা। 'আর বাচ্চারা?'

ভীষণভাবে জ্বলে ওঠে ভালথারের চোখ। 'বাচ্চাদের নিকুচি করি। আমাদের দুজনের স্বার্থেই ওদেরকে ত্যাগ করতে হবে।'

অ্যানা তখন বুঝতে পারল লোকটা একটা উন্মাদ। আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে। ভালথার বাড়ির সমস্ত কাজের লোক দূর করে দিয়েছে। শুধু এক মহিলা সপ্তাহে একদিন এসে ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। অ্যানা এবং তার সন্তানরা একা থাকে, ভালথারের দয়ার ওপর নির্ভর করে।

সেপ্টেম্বরের আজকের এই দিনে অ্যানা তার বেডরুমের মেঝেতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। ভালথার দরজায় তালা মেরে চলে গেছে। অ্যানা জানে কী করতে হবে ভালথার, তার সন্তান এবং নিজের জন্য। সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, পা বাড়াল ফোনের দিকে। একমুহূর্ত ইতস্তত করে ১১০ পুলিশ ইমার্জেন্সি নাম্বারে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে সাড়া পেয়ে কাঁপা-গলায় কথা বলতে শুরু করেছে, এমন সময় বাতাস থেকে যেন একটা হাত বাড়িয়ে এসে ছোঁ মেরে তার কাছ থেকে কেড়ে নিল রিসিভার, ঠকাস করে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।

অ্যানা পিছু হঠল। 'ওহ, প্লিজ' ককিয়ে উঠল সে, 'আমাকে মেরো না।'

ভালথার পা বাড়াল তার দিকে, চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে, গলার স্বর এত নরম, অ্যানা প্রায় শুনতেই পেল না তার কথা। 'প্রিয়ে, আমি তোমাকে মারব না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি সে কথা জানো না?' সে স্পর্শ করল অ্যানাকে, শিউরে উঠল মেয়েটা। 'আমরা চাই না পুলিশ আসুক; চাই কি?' ডানেবামে মাথা নাড়ল অ্যানা, ভয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। 'শুধু বাচ্চাগুলো ঝামেলা সৃষ্টি করছে, অ্যানা। ওদের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই। আমি—'

নিচে, সদর দরজার বেল বেজে উঠল। ভালথার দাঁড়িয়ে পড়ল। ইতস্তত করছে। আবার বাজল বেল।

'এখানেই থাকো' হুকুম করল সে। 'আমি আসছি।' অ্যানা দেখল ও চলে যাচ্ছে। ক্লিক করে শব্দ হল দরজায়। তালা লাগিয়ে দিয়েছে ভালথার।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সে। দরজা খুলল। ডাকপিয়নের ধূসর ইউনিফর্ম গায়ে এক লোক, হাতে মুখবন্ধ খাম।

মিস্টার এবং মিসেস ভালথার গাসনারের জন্য বিশেষ চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'আচ্ছা', বলল ভালথার। 'আমাকে দাও।'

দরজা বন্ধ করল ভালথার। একবার তাকাল হাতের খামটির দিকে। তারপর মুখ ছিঁড়ে বের করে আনল একটি চিরকুট। পড়ল।

> *অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে স্যাম রোফ পাহাড়ে চড়তে গিয়ে মারা গেছেন। অনুগ্রহ করে জুরিখে শুক্রবার উপস্থিত থাকবেন বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের জরুরি মিটিংএর জন্য—রিজ উইলয়াম।*

তিন

রোম
সোমবার, সেপ্টেম্বর ৭
সন্ধ্যা ৬-০০

ইভো পালাজ্জি তার বেডরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, রক্ত গড়াচ্ছে মুখে। 'মামা মিয়া! এ তুমি কী করলে!'

'আমি এখন পর্যন্ত তো কিছুই করিনি, হারামজাদা!' তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডোনাটেলা।

ভায়া মন্টেমিগনাইওর অ্যাপার্টমেন্টের প্রশস্ত শয়নকক্ষে দুজনই নগ্ন। ডোনাটেলার মতো এমন লোভনীয় ও উত্তেজক শরীর দ্বিতীয়টি দেখেনি ইভো। এ মুহূর্তে ডোনাটেলা খামচি দিয়ে মুখের ছাল তুলে নেয়ার কারণে গাল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। তবু মেয়েটির নগ্ন-শরীর ইভোর ভিতরে কামবোধ জাগিয়ে তুলছে। সত্যি অপূর্ব সুন্দরী ডোনাটেলা। ওর চেহারায় এমন নিষ্পাপ একটা ভাব আছে, উন্মাদ করে তোলে ইভোকে। ডোনাটেলার মুখখানা চিতার মতো, উঁচু চোয়াল, আয়ত চোখ, টসটসে একজোড়া অধর। এ অধর ওকে পাগল করে দেয়। ইভো চেয়ারে রাখা সাদা কাপড়টা দিয়ে রক্ত মোছার পর লক্ষ করল এটা ওর জামা। ডোনাটেলা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে। নিজের ওপর করুণা হল ইভোর কেন এই পরিস্থিতির মধ্যে জড়াতে গেল ভেবে। সে সবসময় পৃথিবীর সুখী মানুষ হিসেবে গর্ব করে। ইতালির ডন গিয়োভান্নি সে। অসাধারণ নারীভাগ্য বলে দেশের প্রতিটি পুরুষের ঈর্ষার পাত্র ইভো। সে শুধু একের-পর-এক মেয়ের প্রেমে পড়ে। কারণ অসম্ভব রোমান্টিক ইভোর মন। প্রতিবার সে নতুন করে প্রেম করে পুরোনো প্রেমিকাকে ভুলে যেতে। মেয়েদের পটাতে দারুণ ওস্তাদ ইভো। এক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু কৌশল অবলম্বন করে সে। পাঁচটি ধাপ রয়েছে এতে। প্রথম ধাপে মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হয় ইভো। তাদেরকে প্রতিদিন ফোন করে সে, ফুল এবং যৌনাত্মক কবিতার বই উপহার পাঠায়। দ্বিতীয় ধাপে সে গুচ্চির ছোট ছোট উপহার এবং পেন্সিলের বাক্সে পুরে পারুগিনা চকোলেট পাঠায়। তৃতীয় ধাপে তারা গহনা এবং কাপড় উপহার পায়, তাদেরকে নিয়ে এলটুলা কিংবা টাভেরনা ফ্লাভিয়ায় ডিনারে যায় ইভো। চতুর্থ ধাপে সে মেয়েদেরকে নিয়ে বিছানায় ওঠে এবং প্রমাণ করে খেলুড়ে হিসেবে সে কতটা

চমৎকার। ইভো রাঁধতেও পারে দারুণ। প্রেমিকাকে নিজের হাতের সুস্বাদু সব রান্না খাইয়ে বিছানায় উঠে পড়ে। আর পঞ্চম ধাপে সে অত্যন্ত করুণ গলায় প্রেমিকাদের কাছ থেকে অশ্রুসজল চোখে চিরবিদায় গ্রহণ করে। তবে তার আগে উপহার দিতে ভোলে না।

তবে এ সবই এখন অতীত। ইভো পালাজ্জি এ-মুহূর্তে আয়নায় ভয়ার্ত-চোখে নিজের রক্তাক্ত মুখ দেখল। যেন বুনো একটা জন্তু তাকে হামলা করেছে।

'দ্যাখো তুমি আমার কী করেছ, কারা।' আর্তনাদ করে উঠল ইভো। 'তবে আমি জানি তুমি এটা করতে চাওনি।'

সে ডোনাটেলার দিকে এগিয়ে গেল তাকে আলিঙ্গন করার জন্য। ডোনাটেলাকে জড়িয়ে ধরছে, ডোনাটেলাও তাকে মৃণাল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তারপর পিঠে লম্বা নখ বসিয়ে জন্তুর মতো চিরে দিল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ইভো।

'চিল্লাও!' চেঁচাল ডোনাটেলা। 'আমার কাছে ছুরি থাকলে তোমার ওল কেটে মুখের মধ্যে পুরে দিতাম।'

'প্লিজ!' অনুনয় করল ইভো। 'বাচ্চারা শুনবে তো!'

'শুনুক!' হিসিয়ে উঠল ডোনাটেলা। 'জানুক তাদের বাপ একটা দানব।'

এক কদম তার দিকে এগোল ইভো। 'কারিশমা—'

'খবরদার! ছোঁবে না আমাকে। তুমি আবার আমার কাছে আসার চেষ্টা করলে রাস্তায় সবার আগে যে মাতালটাকে দেখতে পাব তার হাতে নিজেকে তুলে দেব আমি।'

গুটিয়ে গেল ইভো। 'আমার সন্তানের মা হিসেবে তোমার এভাবে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।'

'তোমার মতো শয়তানের সঙ্গে কি মধুর মধুর কথা বলব?' ডোনাটেলার গলা সপ্তমে চড়ল। 'তাহলে আমি যা চাইছি তা দাও।'

ইভো নার্ভাস ভঙ্গিতে দরজার দিকে তাকাল। 'কারিশমা আমি পারব না। আমার কাছে নেই ওটা।'

'তাহলে যেখান থেকে পারো জোগাড় করে নিয়ে এসো।' গলা ফাটাল ডোনাটেলা। 'তুমি আমাকে কথা দিয়েছ।' আবার মৃগী রোগীর মতো আচরণ শুরু করেছে ডোনাটেলা। প্রতিবেশী টের পাবার আগেই এখান থেকে কেটে পড়া সমীচীন মনে করল ইভো।

'এক মিলিয়ন ডলার জোগাড় করতে সময় তো লাগে।' তোষামুদে সুরে বলল সে। 'তবে— তবে যে করেই হোক টাকা জোগাড়ের একটা রাস্তা বের করে ফেলব আমি।'

দ্রুত জাঙ্গিয়া আর প্যান্ট পরে নিল ইভো। মোজা আর জুতা পরল পায়ে। ডোনাটেলা রাগি কদমে পায়চারি করছে ঘরে। উদ্ধত, নিটোল বুকজোড়া হাঁটার তালে ঝাঁকি খাচ্ছে। ইভো ভাবল : ওহ্, কী এক নারী! রক্তমাখা শার্ট গায়ে চড়াল সে। পিঠ এবং বুকে চটচটে একটা স্পর্শ পেল রক্তের। শেষবারের মতো তাকাল আয়নায়। ডোনাটেলা আঙুল বসিয়ে দিয়ে গর্ত করে ফেলেছে গালে। এখনও রক্ত পড়ছে।

'কারিশমা', গুঙিয়ে উঠল ইভো। 'আমি এর কী ব্যাখ্যা দেব আমার স্ত্রীকে?'

ইভো পালাজ্জির স্ত্রী সিমোনেটা রোফ। রোফ-পরিবারের ইতালীয় শাখার একজন উত্তরাধিকারী। সিমোনেটার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ইভো বয়সে তরুণ। তার ফার্ম পোর্টো এরকোলে রোফ ভিলার কিছু পরিবর্তনের জন্য তাকে পাঠিয়েছিল। সিমোনেটার চোখে চোখ পড়া মাত্র ইভোর ব্যাচেলার জীবনের সমাপ্তি ঘটল। প্রথম রাতেই চতুর্থ ধাপে চলে গেল ইভো। অল্প ক'দিন বাদেই বিয়ে করল সিমোনেটাকে। সিমোনেটা যেমন সুন্দরী তেমনি জেদি। সে জানে সে কী চায়! সে ইভো পালাজ্জিকে চেয়েছিল। এভাবে লাগামহীন ব্যাচেলার ইভো সুন্দরী এবং ধনবতী এক নারীর স্বামী হয়ে গেল। সানন্দে স্থাপত্যবিদ্যার চাকরি ছেড়ে রোফ অ্যান্ড সন্সের EUR-এর রোম শাখার সাধারণ দপ্তরে যোগ দিল।

শুরুতেই ফার্মে সাফল্য দেখাতে শুরু করল ইভো। সে বুদ্ধিমান, যে-কোনো কিছু বুঝতে পারার ক্ষমতা রয়েছে তার। সকলের প্রশংসাধন্য হয়ে উঠল ইভো। সে সবসময় হাসিমুখে থাকে। স্ত্রীকে লুকিয়ে সে ঠিকই আগের মতো মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াতে লাগল।

সিমোনেটার বাবা তাদেরকে ওলগিয়াটায় চমৎকার একটি বাড়ি কিনে দিলেন। রোম থেকে পঁচিশ কিলোমিটার উত্তরে। এই প্রাইভেট এস্টেটের গেটে পাহারা দেয় ইউনিফর্ম-পরা গার্ড।

সিমোনেটা স্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত চমৎকার। সে ইভোকে ভালোবাসে। সম্মান করে রাজার মতো। যদিও এ সম্মান পাবার অধিকার রাখে না ইভো। তবে সিমোনেটার একটি খুঁত আছে। সে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলে উন্মাদ হয়ে যায়। একবার সে সন্দেহ করল তার স্বামী ব্রাজিলে এক সুন্দরী ক্রেতাকে নিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ অস্বীকার করল ইভো। কিন্তু দুজনের তর্ক শেষ হওয়ার আগেই গোটা বাড়ি কসাইখানায় রূপান্তরিত হল। ঘরের একটা কাপ-পিরিচ কিংবা আসবাবও আস্ত রইল না। বেশিরভাগ ভাঙল ইভোর মাথায়। কসাইয়ের ছুরি দিয়ে সেবার ইভোকে তাড়া করেছিল সিমোনেটা। ইভোকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করবে বলে শাসিয়েছিল। তার হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিতে শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হয়েছিল ইভোকে। মেঝের উপর রীতিমতো যুদ্ধ করছিল দুজনে। ইভো শেষে

সিমোনেটার কাপড় ছিঁড়ে ফেলে তাকে রতিসুখ দিয়ে শান্ত করে। ওই ঘটনার পর থেকে সাবধান হয়ে যায় ইভো। মহিলা ক্রেতাকে বলে দেয় তাকে নিয়ে কোথাও যেতে পারবে না সে। সিমোনেটার মনে তাকে নিয়ে সন্দেহ জাগতে পারে এমন ভুল সে জীবনেও করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে।

ইভো-সিমোনেটার বিয়ের তিন বছর পরে সিসিলিতে ব্যবসার কাজে গিয়ে ইভোর সঙ্গে পরিচয় হয় ডোনাটেলা স্পোলিনির। এ যেন সাক্ষাৎ নয়, বিস্ফোরণ; দুটি ধূমকেতুর সংঘর্ষ। সিমোনেটা যদি হয় মানযুর গড়া নমনীয়, মিষ্টি শরীরের ভাস্কর্য, তবে ডোনাটেলাকে অনায়াসে তুলনা করা যায় রুবেনের যৌন আবেদনময় ভরাট যৌবনের নারীর সঙ্গে। তার মুখশ্রী নিখুঁত, সবুজ চোখ কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেয় ইভোর শরীরে। পরিচয় হওয়ার এক ঘণ্টার মাথায় ওরা বিছানায় গেল এবং ইভো, যে সবসময় নিজেকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে অহংকার করত, কিন্তু দেখল সে ছাত্র আর ডোনাটেলা তার শিক্ষক। এমন সুখ জীবনে পায়নি ইভো। ডোনাটেলা তার শরীর দিয়ে ইভোকে নিয়ে এমন সব কাণ্ড করল যা সে কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। সুখের অনন্ত সাগর যেন ডোনাটেলা। তৃপ্ত ইভো বিছানায় চোখ বুজে ভাবছিল ডোনাটেলাকে ছেড়ে দিলে সে মস্ত বোকামি করবে।

ডোনাটেলা ইভোর রক্ষিতা হতে রাজি হল একটা শর্তে— স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে না। ইভো আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল এ প্রস্তাবে। এসব আট বছর আগের ঘটনা। ইভো তার স্ত্রী কিংবা রক্ষিতার সঙ্গে কখনোই অবিশ্বাসের কাজ করেনি। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে দুই ক্ষুধার্ত রমণীকে সন্তুষ্ট করা কঠিন হলেও ইভো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সিমোনেটার সঙ্গে প্রেম করার সময় ডোনাটেলার ভরাট শরীরের কথা ভাবে এবং কামনায় উদ্দীপ্ত হয়। আর ডোনাটেলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় সে সিমোনেটার উদ্ধত বক্ষ এবং রসালো অধরের কথা মনে করে বুনো হয়ে ওঠে।

ইভো ডোনাটেলাকে ভিয়া মন্টেমিগনাইওতে ভারি সুন্দর একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিল। যখনই সময় পায় তখনই সে ডোনাটেলার সঙ্গে মিলিত হয়। ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে বিজনেস ট্রিপের ব্যবস্থা করে ইভো। কিন্তু বাণিজ্য-সফরে না গিয়ে সময়টা কাটায় ডোনাটেলার বিছানায়। একবার সে সিমোনেটাকে নিয়ে জাহাজে চড়ে নিউইয়র্কে যাচ্ছিল। এক ডেক নিচে ডোনাটেলার জন্য একটি কেবিন বুক করে সে। ইভোর জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর সময় ছিল ওই পাঁচটি দিন।

এক সন্ধ্যায় সিমোনেটা ঘোষণা করল সে মা হতে যাচ্ছে। ইভো খুশিতে আটখানা হল। এক সপ্তাহ পরে ডোনাটেলা ইভোকে বলল সে গর্ভবতী। ইভোর আনন্দ আর দেখে কে! সে নিজেকে প্রশ্ন করে দেবতারা তার প্রতি এত সদয় কেন?

যথাসময়ে সিমোনেটা একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিল এবং এক সপ্তাহ পর ডোনাটেলা ছেলের মা হল। মানুষ আর কী চায়? তবে ইভোকে দেবতাদের আরো কিছু দেয়ার ছিল। কিছুদিন পরে ডোনাটেলা বলল আবার সে মা হতে চলেছে এবং ওই সপ্তাহে সিমোনেটাও গর্ভবতী হল। নয় মাস পরে ডোনাটেলা ইভোকে একটি পুত্রসন্তান উপহার দিল আর সিমোনেটা মেয়ে। চার মাস পরে দুই নারী আবার গর্ভবতী হল। এবার একই দিনে মা হল দুজনে। দুই হাসপাতালে ছুটাছুটি করে জান কয়লা হয়ে গেল ইভোর। ডোনাটেলা এবারও ছেলের মা হল এবং সিমোনেটা জন্ম দিল মেয়ে।

ছয় ছেলেমেয়ের বাপ হতে পেরে খুশি ইভো। কন্যাসন্তানদের নাম রাখা হল— ইসাবেলা, বেনেদেত্তা এবং কামিলা। আর ছেলে তিনটি— ফ্রান্সেসকো, কার্লো এবং লুকা।

বাচ্চারা বড় হয়ে ওঠার পর ইভোর জীবনটা জটিল হয়ে উঠল। স্ত্রী, রক্ষিতা এবং ছয় ছেলেমেয়ের আটটি জন্মদিন, আটটি সেইন্ট ডে এবং ছুটির দিনগুলোর সঙ্গে তাল মিলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হল তাকে। বাচ্চাদের আলাদা আলাদা স্কুলে ভর্তি করল সে। মেয়েদেরকে পাঠিয়ে দিল ভিয়া কাসিয়ার ফরাসি কনভেন্ট সেইন্ট ডোমিনিকে আর ছেলেরা ভর্তি হল EUR-এর ইহুদি স্কুলে। ইভো দুটি স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ করে, বাচ্চাদের হোমওয়ার্ক করে দেয়। তাদের সঙ্গে খেলা করে, ভাঙা খেলনা জুড়ে দেয়। দুটি পরিবারকে আলাদা রেখে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে নাভিশ্বাস উঠে যায় ইভোর। কিন্তু বাপ এবং স্বামী হিসেবে সে অত্যন্ত চমৎকার। তার বউ এবং রক্ষিতা দুজনেই অপূর্ব সুন্দরী। বাচ্চাগুলো বুদ্ধিমান। তাদের সবাইকে নিয়ে গর্ব করে ইভো। জীবন চমৎকার কেটে যাচ্ছিল তার। কিন্তু এত সুখ বোধকরি দেবতাদের সইল না। তারা থুতু ছিটিয়ে দিলেন ইভোর মুখে।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই ঘটল ঘটনা। ইভো সেদিন সকালে নাস্তা খাওয়ার আগে সিমোনেটার সঙ্গে একপ্রস্থ প্রেম করেছে, তারপর সোজা অফিসে গেল। বেলা একটার সময় সে তার পুরুষ-সেক্রেটারিকে বলল, সিমোনেটা ফোন করলে যেন জানিয়ে দেয় বিকেলটা সে মিটিং-এ ব্যস্ত থাকবে।

সামনে কী সুখ অপেক্ষা করছে ভেবে হাসি দু'কানে ঠেকিয়ে ডোনাটেলার বাড়ি হাজির হয়ে গেল ইভো। কিন্তু দরজা খোলামাত্র তার মনে হল কোথাও মস্ত একটা গড়বড় হয়ে গেছে। ফ্রান্সেসকো, কার্লো এবং লুকা ডোনাটেলাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাচ্ছে। ইভো ডোনাটেলার দিকে পা বাড়াল। ডোনাটেলা এমন ঘৃণার দৃষ্টিতে ইভোর দিকে তাকাল, একমুহূর্তের জন্য তার মনে হল বুঝি ভুল বাড়িতে সে ঢুকে পড়েছে।

'বদমাশ!' ডোনাটেলা তার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল।

হতভম্ব দেখাল ইভোকে। 'কারিশমা— বাচ্চারা— কী হয়েছে? আমি আবার কী করলাম?'

ডোনাটেলা লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। 'এই দ্যাখো তুমি কী করেছ!' সে ওগ্নি পত্রিকার একটা কপি ছুড়ে মারল ইভোর মুখে। 'দ্যাখো!'

হতভম্ব ইভো মেঝে থেকে তুলে নিল পত্রিকাটি। প্রচ্ছদে তার, সিমোনেটা এবং তাদের তিন কন্যার ছবি ছাপা হয়েছে। নিচে লেখা : সুখী পরিবার।

সর্বনাশ! সে তো এ-পত্রিকার কথা ভুলেই গিয়েছিল। মাসকয়েক আগে পত্রিকাটি তার ওপর একটি প্রতিবেদন রচনা করার অনুমতি চেয়েছিল। বোকার মতো রাজি হয়ে গিয়েছিল ইভো। কিন্তু এরা প্রচ্ছদে ছবি ছেপে দেবে কল্পনাও করেনি সে। ফোঁপাতে থাকা বাচ্চা আর রক্ষিতার দিকে তাকাল সে। বলল, 'আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি...'

'ওদের স্কুলের শিক্ষকরা ব্যাপারটা আগেই ব্যাখ্যা করেছে।' মৃগী রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠল ডোনাটেলা। 'আমার বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরেছে। কারণ স্কুলের সবাই তাদেরকে বেজন্মা বলেছে।'

'কারা, আমি—

'আমার বাড়ির মালিক এবং প্রতিবেশীরা আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন আমরা কুষ্ঠরোগী। আমাদের মাথা তুলে আর কথা বলার সুযোগ রইল না। আমি ওদেরকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব।'

ইভো বোকা হয়ে গেল। 'কী বলছ তুমি!'

'আমি রোম ছাড়ছি। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'ওরা আমারও ছেলে,' চেঁচাল ইভো। 'তুমি এটা করতে পারো না।'

'আমাকে বাধা দিয়েই দ্যাখো না। স্রেফ খুন করে ফেলব।'

ওটা দুঃস্বপ্নের মতো একটি ব্যাপার ছিল। ইভো ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে তার তিন সন্তান এবং ক্রোধে উন্মত্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল : আমার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না।

ডোনাটেলার কথা তখনও শেষ হয়নি। যাওয়ার আগে ঘোষণা দিল সে, 'আমার এক মিলিয়ন ডলার চাই। নগদ।'

কথাটা এমন হাস্যকর শোনাল যে, হাসার চেষ্টা করল ইভো। 'এক মিলিয়ন....'

'টাকা দাও নয়তো তোমার বউকে আমি ফোন করব।'

এ ঘটনা ছয় মাস আগের। ডোনাটেলা এরপর আর তাকে হুমকি দেয়নি বটে তবে ইভো জানে সে এ-কাজ করবে। প্রতি সপ্তাহে চাপ দিয়ে চলেছে ডোনাটেলা।

অফিসে ফোন করে বলে, 'আমি জানতে চাই না কোত্থেকে তুমি টাকা জোগাড় করবে। তবে টাকা আমার চাই-ই।'

এত টাকা জোগাড় করার একটাই উপায় আছে— রোফ অ্যান্ড সন্সের স্টক বিক্রি করে দেয়া। কিন্তু স্যাম রোফের কারণে তা সম্ভব নয়। স্যাম রোফ তার বিয়ে এবং ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিয়েছে। ওকে যে করেই হোক থামাতে হবে।

ইভোকে সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে তার প্রিয়তম রক্ষিতার শরীর স্পর্শ করার সুযোগ আর সে পাচ্ছে না। সন্তানদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করার অনুমতি পেলেও বেডরুমের দরজা ইভোর জন্য বন্ধ।

'আগে টাকা দাও', বলেছে ডোনাটেলা, 'তারপর আমার সঙ্গে প্রেম করতে দেব।'

এক বিকেলে বেপরোয়া হয়েই ডোনাটেলাকে ফোন করল ইভো। 'আমি আসছি এখনি। টাকা জোগাড় হয়ে গেছে।'

আগে ডোনাটেলার সঙ্গে প্রেম করবে সে, পরে তাকে শান্ত করা যাবে। ডোনাটেলাকে নগ্ন করল ইভো। তারপর সত্যিকথাটা ফাঁস করে দিল। 'আমি এখনও টাকা জোগাড় করতে পারিনি, কারা.. তবে শীঘ্রি...' এরপর সে ইভোকে বুনো জন্তুর মতো হামলা চালিয়ে বসে।

ডোনাটেলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ি চালাতে চালাতে এসব কথাই ভাবছিল ইভো। রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকাল, রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, তবে খামচির দাগগুলো দগদগ করছে। শার্ট রক্তমাখা। মুখ আর পিঠের দাগের কী ব্যাখ্যা দেবে সে সিমোনেটাকে? একবার ভাবল সত্যিকথাটা সে বলে দেবে স্ত্রীকে। বলবে একমুহূর্তের জন্য নৈতিক স্খলন ঘটেছিল তার। মেয়েটার সঙ্গে সে মিলিত হয় এবং মেয়েটা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। হয়তো এ ব্যাখ্যা করে গায়ের চামড়া বাঁচাতে পারবে ইভো। কিন্তু তিন সন্তান? তিন বছরে তিন ছেলের জন্মদান? এদের ব্যাপারে কী ব্যাখ্যা দেবে সে? নাহ্, সিমোনেটা তাকে খুনই করে ফেলবে। ইভোর জীবনের দাম তখন তার কাছে পাঁচ পয়সাও থাকবে না। ফাঁদে পড়েছে ইভো। ওর দাম্পত্যজীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি। একমাত্র ঈশ্বরই ওকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন। বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে ইভো, এমন সময় ব্রেক কষল। ঘুরিয়ে নিল গাড়ি।

ত্রিশ মিনিট পর ওলগিয়াটার গেট দিয়ে বাড়ির রাস্তায় ঢুকে পড়ল ইভো। গার্ডরা তার বিধ্বস্ত মুখ এবং রক্তাক্ত শার্টের দিকে তাকিয়ে আছে, লক্ষ্য করেও না-দেখার ভান করল। ইভোর জন্য ডিনার সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল সিমোনেটা। স্বামীর এমন অবস্থা দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। 'ইভো, কী হয়েছে?'

ইভো ব্যথা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। ভীরু গলায় বলল, 'আমি বোকার মতো একটা কাজ করে ফেলেছি, কারা—'

সিমোনেটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লক্ষ্য করছে মুখে খামচির দাগ। তার চোখ সরু হতে লাগল। যখন কথা বলল, হিমায়িত শোনাল কণ্ঠ। 'কে তোমার মুখে খামচি দিয়েছে?'

'টিবিরো', বলল ইভো। পেছন থেকে বড়, কুৎসিত একটা বেড়াল বের করে আনল সে। বেড়ালটা ইভোর হাত থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ল। দৌড়ে পালাল। 'ইসাবেলার জন্য কিনেছিলাম। কিন্তু ব্যাগে ঢোকানোর সময় হারামজাদাটা আমাকে খামচে দেয়।'

'ইস্স রে!' সিমোনেটা চলে এল ইভোর পাশে। 'শিগগির উপরে চলো। শুয়ে থাকো। আমি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি। আয়োডিন লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি—'

'না! না! কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক আছি।' হাসিমুখে বলল ইভো। সিমোনেটা ওকে জড়িয়ে ধরতে কাতরে উঠল। 'আমার পিঠেও খামচে দিয়েছে হারামিটা।'

'ইস্, কত্ত ব্যথা পেয়েছ, না?'

'তেমন লাগেনি। এখন ভালোই আছি।' মনের কথাটাই বলল ইভো।

এমন সময় বেজে উঠল সদর-দরজার কলিং বেল।

'আমি যাচ্ছি', বলল সিমোনেটা।

'না, আমি যাব।' দ্রুত বলল ইভো, 'আ—আমার অফিস থেকে জরুরি কিছু কাগজপত্র পাঠানোর কথা।' প্রায় ছুটে গিয়ে দরজা খুলল সে।

'সিনর পালাজ্জি?'

'হ্যাঁ।'

এক বার্তাবাহক, পরনে ধূসর ইউনিফর্ম, ইভোর হাতে একটি খাম ধরিয়ে দিল। ভিতরে রিজ উইলিয়ামসের সই-করা চিঠি। দ্রুত চিঠিটি পড়ে ফেলল ইভো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়।

তারপর গভীর একটা দম নিল সে। পা বাড়াল দোতলার সিঁড়ির অভিমুখে।

চার

বুয়েনস আয়ারস
সোমবার, সেপ্টেম্বর ৭
বিকেল তিনটা

বুয়েনস আয়ারসের বিখ্যাত রিজ হোটেলের বিলাসবহুল দামি ফ্ল্যাটে শুয়ে আছে হেলেন রোফ এবং তার স্বামী চার্লস। নগ্ন। মাত্র দুঘণ্টা আগে হেলেন বিশ্ববিখ্যাত গ্রাঁ পি কার রেস-এ জিতে এসেছে। সেই আনন্দে তার মুখ জ্বলজ্বলে। তবে এই মুহূর্তে সে তার স্বামীকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করে আরো বেশি আনন্দ পাচ্ছে। চার্লসের শরীরের উপরে উঠে আছে হেলেন। চাপ দিচ্ছে চার্লসের অণ্ডকোষে। যন্ত্রণায় কেঁপে উঠছে চার্লস। ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্য উল্লাস অনুভব করল হেলেন। আমাকে শুধু শুধু ও কষ্ট দিচ্ছে : ভাবল চার্লস। তবে সে যে-অপরাধ করেছে এটা হেলেন কখনও জানতে পারলে ওর কপালে কী ভয়ংকর শাস্তি আছে ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

চার্লস মার্টেল হেলেন রোফকে বিয়ে করেছিল নাম এবং টাকার কারণে। কিন্তু বিয়ের পর ভুল ভেঙে যায় ওর। দেখে টাকাপয়সার ব্যাপারে হেলেন ভয়ানক কৃপণ। ফালতু একটা পয়সাও খরচ করতে রাজি নয়।

চার্লস মার্টেল প্যারিসের এক বিখ্যাত আইনজীবী সংস্থার জুনিয়র অ্যাটর্নি ছিল। ঐ সময় তার সাথে হেলেনের সাক্ষাৎ। কনফারেন্স রুমে, এক মিটিঙে কিছু ডকুমেন্ট নিয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ পায় সে। রুমে ঐ সংস্থার চারজন সিনিয়র পার্টনার ছিলেন। আর ছিল হেলেন। চার্লস অনেক আগেই ওর কথা শুনেছে। ইউরোপে সবাই হেলেন নামটার সাথে পরিচিত। রোফ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির একজন উত্তরাধিকারী সে। তবে হেলেনকে টপে উঠিয়েছে জাতীয় মাধ্যমগুলো। বিভিন্ন সংবাদপত্র বড় বড় হেডিঙে হেলেনের দুঃসাহসিক সব কীর্তির কথা ফলাও করে প্রচার করে। হেলেন একজন চ্যাম্পিয়ন স্কি-খেলোয়াড়; নিজের লিয়ার জেট নিজেই চালায়। নেপালে পর্বতারোহণ অভিযানে দারুণ নাম করেছে, একজন দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার, অত্যন্ত দক্ষ ড্রাইভার এবং পোশাক পাল্টানোর মতোই পুরুষ বদলায়। প্যারিসের বিখ্যাত সব পত্রিকায় প্রায়ই তার হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি ছাপা হয়। এই মুহূর্তে হেলেনের আইন অফিসে থাকার কারণ সে তার ডিভোর্সের ব্যাপারে কথা

বলতে এসেছে। চার কিংবা পাঁচ নম্বর ডিভোর্স হবে হয়তো : ভাবল চার্লস। কিন্তু তেমন উৎসাহ অনুভব করল না। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের কী দরকার?

চার্লস তার সুপিরিয়রের কাছে কাগজপত্র হস্তান্তর করল। ওকে নার্ভাস লাগছে। হেলেনের জন্য নয়, কারণ তার সাথে মাত্র বারদুয়েক চোখাচোখি হয়েছে। চারজন সিনিয়র পার্টনারের উপস্থিতিই ওকে নার্ভাস করে তুলেছে। কারণ এরাই অথরিটিকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন। আর অথরিটিকে চার্লস যথেষ্ট সমীহ করে চলে।

চার্লস মার্টেল অসাধারণ কোনো অ্যাটর্নি নয়। তবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো। নিজের ওপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস তার আছে। চার্লসের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। দেখতেও খারাপ নয়। ওর ব্যক্তিত্ব অনেককেই টানে।

হেলেন রোফের সাথে দেখা হওয়ার পরের দিনের ঘটনা। চার্লসকে নির্দেশ দেয়া হল সিনিয়র পার্টনার মাইকেল সাশার্ডের সঙ্গে দেখা করার জন্য। বসের অফিসে ঢুকল চার্লস। মাইকেল বললেন, 'হেলেন রোফ চাইছেন তুমি তার ডিভোর্স কেসটা হ্যান্ডলিং করো। ওটার দায়িত্ব তুমি এখনই বুঝে নাও।'

চার্লসকে বিমূঢ় দেখাল। 'আমাকে কেন, স্যার?'

মাইকেল ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা আমি জানি না, তবে আশা করব তুমি ভালো কাজ দেখাবে।'

হেলেনের ডিভোর্স কেস নিয়ে ডিল করতে প্রায়ই ওর সাথে দেখা হতে লাগল চার্লসের। তবে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই যেন দেখা-সাক্ষাৎ হল। হেলেন ওকে ফোনে তার বাড়িতে ডিনারের আমন্ত্রণ করে জানায় বাড়িতে বসে সে কেসটা নিয়ে আরো কিছু ব্যাপারে কথা বলতে চায়। এমনকি সে চার্লসকে নিয়ে নাটক দেখতেও ঢোকে 'কেস' নিয়ে কথা বলতে। চার্লস ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চায় এটা সাধারণ একটা কেস, কারণ কোনো সমস্যাই হবে না ডিভোর্স পেতে। এজন্যে বাড়িতে আসার দরকার পড়ে না। কিন্তু হেলেন যেহেতু তার ক্লায়েন্ট এবং সবচেয়ে বড় কথা সে বসেরও বস্, সুতরাং তাকে সব কথা শুনতেই হবে।

সপ্তাহ না-যেতেই চার্লসের মনে হতে লাগল হেলেন রোফ যেন তার দিকে একটু বেশিই ঝুঁকে পড়েছে। এমনকি একদিন সে ডিনার খাওয়ার সময় চার্লসকে বলে ফেলে তাকে 'আপনি' সম্বোধন করার দরকার নেই, 'হেলেন' বলে নাম ধরে ডাকলেই বরং ভালো লাগবে। ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য লাগে চার্লসের কাছে। সে স্রেফ একটা উকিলের কেরানি। আর হেলেন আমেরিকার এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা। সেই মেয়ে তার প্রতি কীভাবে দুর্বলতা পোষণ করে? কিন্তু হেলেন চার্লসের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে একদিন ঘোষণা করল, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, চার্লস।'

চার্লস অবাক হল খুব। বিয়েশাদির কথা তার কল্পনাতেও আসেনি কোনোদিন। এমনিতেও কোনোকালেই মেয়েদের সাথে সে সহজভাবে মিশতে পারেনি। তাছাড়া

সে তো হেলেনকে ভালোবাসে না। চার্লসের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না হেলেন ওর মধ্যে এমন কী দেখেছে যে বিয়ে করতে চাইছে। কিন্তু ওর জানা নেই অসংখ্য পুরুষ চরিয়ে খাওয়া এই বহুগামিনী নারী তাকে স্রেফ একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। হেলেনের কাছে চার্লস নিতান্তই মাটির একটি ঢেলা। এই ঢেলাকে মনের মতো আকৃতি দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, এই বৈপ্লবিক চিন্তাই হেলেনকে উদ্বুদ্ধ করেছে চার্লসকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে। আর হেলেন রোফ একবার যা চায়, তাই পেতে সে অভ্যস্ত। সুতরাং চার্লসের কোনো কথা বলারই সুযোগ রইল না।

নিউলিতে বিয়ে হল ওদের। আর হানিমুন করতে গেল মন্টিকার্লোতে। এখানেই চার্লস তার কৌমার্য হারাল। হানিমুন শেষ হওয়ার পরপরই সে ফিরতে চাইল তার ল ফার্মে।

'বোকার মতো কথা বোলো না।' ভর্ৎসনা করল নববধূ। 'তোমার কি ধারণা আমি সামান্য একটা কেরানির বউ হয়ে সারাজীবন কাটাব। তোমাকে আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকতে হবে। একদিন তুমিই এটা চালাবে। আমরা দুজনে মিলে কর্তৃত্ব ফলাব।'

রোফ অ্যান্ড সন্সের প্যারিস শাখায় হেলেনের তদবিরে চাকরি হয়ে গেল চার্লস মার্টেলের। নিজের কাজের রিপোর্ট করে সে হেলেনের কাছে। ওকে কীভাবে কী করতে হবে সে-ব্যাপারে পরামর্শ দেয় হেলেন। চার্লসের বেশ দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। শিগগিরই সে বোর্ড অব ডিরেক্টর সভার একজন সদস্য হয়ে ফ্রান্স-শাখার দায়িত্ব পেল।

হেলেন রোফ ওকে সামান্য কেরানি থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কোম্পানির এক্সিকিউটিভ বানিয়েছে। এতে চার্লসের আনন্দিত হবার কথা। উল্টো সে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কারণ বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছে নিজস্বতা বলতে তার কিছুই নেই। প্রতি ক্ষেত্রে বৌয়ের কথামতো তাকে চলতে হচ্ছে। বৌ-ই ওকে চালাচ্ছে। হেলেনই ঠিক করে দেয় তার টেইলর, মুচি কিংবা দর্জিকে। হেলেন তাকে সাথে করে নিয়ে যায় বিখ্যাত সব ক্লাবে। চার্লস যেন হেলেনের হাতের পুতুল। এমনকি বেতনটা পর্যন্ত সে নিজহাতে তুলতে পারে না। ওটা সরাসরি চলে যায় হেলেনের কাছে। হাতখরচের জন্য হেলেন খুব সামান্য কিছু টাকা ওকে দেয়। কখনও অতিরিক্ত কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়লে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে হাত পাততে হয় বৌয়ের কাছে।

হেলেন তার স্বামীকে ভেড়া বানানোর মজাটা উপভোগ করে তারিয়ে তারিয়ে। যখন-তখন সে অফিসে ফোন করে চার্লসকে ম্যাসেজক্রিম কিংবা এ-ধরনের আলতুফালতু জিনিস কিনে আনার হুকুম করে। পড়িমরি করে দৌড়াতে হয় চার্লসকে। বাড়িতে ঢুকে দেখে বৌ তার বিছানায় ন্যাংটো অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। হেলেনের যৌনকামনার কোনো শেষ নেই। চার্লসের জীবনে হেলেনের

আগে অন্য কোনো নারী আসেনি। কারণ তার জীবনের বত্রিশটা বছর কেটে গেছে ক্যান্সারে আক্রান্ত বুড়ি মাকে সেবা করতেই। ডেটিং দূরের কথা, কোনো মেয়ের সাথে কথা বলার সুযোগও মেলেনি কোনোদিন। মা মারা যাওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচার পরিবর্তে ভীষণ বিষণ্ন বোধ করতে থাকে চার্লস। নারীসঙ্গ কিংবা সেক্সের প্রতি কোনো আকর্ষণই ছিল না ওর। তাই ফুলশয্যার রাতে সে ভয়ানক নার্ভাস গলায় বৌকে বলেছিল, 'আ-আমার ওটা মনে হয় খুব একটা শক্তিশালী নয়।'

হেলেন হেসেছিল। 'বেচারা চার্লস। ওসব নিয়ে ভেবো না তো। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কীভাবে কী করতে হয়। দেখো, তুমি মজাই পাবে।'

কিন্তু চার্লস মজা পায়নি। হেলেন নিজের সুখটাই ষোলোআনা চরিতার্থ করে নেয়। এমন সব কাণ্ডকারখানা করে যে, রীতিমতো অসুস্থ বোধ করে চার্লস। কিন্তু হেলেনের 'সেক্স' নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার আগ্রহে কোনো কমতি নেই। একবার চার্লসের বীর্যপাত হচ্ছে, তখন হেলেন বরফের একটা টুকরো দিয়ে ওর অণ্ডকোষে আঘাত করছিল। আরেকবার সে তার মলদ্বারে একটা বৈদ্যুতিক লাঠি ঢুকিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় চেঁচায় চার্লস। আর হেলেন সেই যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখে আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যেন ধর্ষণ করছে সে কাউকে।

বিছানার সময়টুকু ছাড়া হেলেন শুধু কোম্পানি নিয়ে কথা বলে। এতে তার কোনোরকম ক্লান্তি নেই। আর কোম্পানির ব্যাপারটা সে বোঝেও ভালো। অবশ্য চার্লসের চেয়ে সে সবকিছুই বেশি জানে, বোঝেও ভালো। স্বামীকে সে মন্ত্রণা দেয়, 'ঐ বিশাল ক্ষমতার কথা একবার ভাবো, চার্লস। সারা বিশ্বের অর্ধেকের বেশি দেশের ওপর রোফ অ্যান্ড সন্সের কী বিরাট প্রতিপত্তি। এই কোম্পানির সর্বময় কর্তৃত্ব আমি চাই। আমার প্রপিতামহ এটা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই কোম্পানি আমারই একটা অংশ।'

দিনের-পর-দিন হেলেনের কর্তৃত্ব আর যৌন অত্যাচার সইতে সইতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে চার্লসের। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। পালাতে মন চাইছে। কিন্তু পালাতে হলে টাকা চাই। প্রচুর টাকা।

তারপর একদিন, ওর এক বন্ধু, রেনে ডাচাম্বস ওর সাথে লাঞ্চ করার পর, সেধে চার্লসকে এমন একটা প্রস্তাব করল যাতে রাজি হয়ে গেলে চার্লসের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা চলে আসবে কয়েক মাসের মধ্যে।

'আমার এক চাচা মারা গেছেন কিছুদিন আগে।' বলল রেনে। 'বার্গান্ডিতে তাঁর বিশাল এক আঙ্গুরের ক্ষেত আছে। দশ হাজার একরের এই ক্ষেত শিগগিরই বিক্রি হবে বলে খবর পেয়েছি আমি। একা আমার পক্ষে এই ক্ষেত কিনে চাষাবাদ করা সম্ভব নয়। তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিলে একবছরের মধ্যে আমরা লাভের অঙ্ক ঘরে তুলতে পারব। কেনো বা না-কেনো, অন্তত একবার দেখে আসবে, চলো।'

রেনের জানা ছিল না তার বন্ধুর পকেটে ফুটো পয়সাও নেই। কিন্তু সে-কথা বলতে আত্মসম্মানে বাধল চার্লসের। বরং উৎসাহ দেখিয়ে চলল বন্ধুর সাথে আঙ্গুরক্ষেত দেখতে। আর দেখার পর মুগ্ধ হল।

'আমাদের প্রত্যেককে দুই মিলিয়ন ফ্রাঁ ব্যয় করতে হবে এই প্রজেক্টের পেছনে। এক বছরের মাথায় ওটা থেকেই প্রত্যেকে চার মিলিয়ন করে পাব।' উৎসাহভরে বলল রেনে।

চার মিলিয়ন ফ্রাঁ! এত টাকা হাতে পেলেই তো চার্লস শেকল কেটে ডানা মেলতে পারবে আকাশে। এত দূর চলে যাবে যে, হেলেন রোফ কোনোদিন ওর খোঁজ পাবে না।

'ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখব।' বন্ধুকে আশ্বস্ত করল চার্লস।

তারপর থেকে দিনরাত চার্লসের মাথায় শুধু টাকা-সংগ্রহের চিন্তাই ঘুরতে লাগল ভনভন করে। এত টাকা সে কোত্থেকে জোগাড় করবে? হেলেনকে না-জানিয়ে এই বিরাট অঙ্কের টাকা জোগাড়ের কোনো সম্ভাবনাই সে দেখতে পেল না। স্থাবর-অস্থাবর যা-কিছু আছে সবই হেলেনের নামে। বাড়ি, গাড়ি, দুষ্প্রাপ্য চিত্রকলা, গহনা। গহনা.... সুন্দর আর বহু মূল্যবান গহনাগুলোর কথা মনে পড়তেই বিদ্যুৎচমকের মতো চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল চার্লসের। বেডরুমের লকারে রাখা দামি গহনাগুলো সে কোনোভাবে হাতাতে পারলেই আর টাকার সমস্যা থাকে না। কিন্তু কীভাবে? কেন–অল্প অল্প করে গহনা চুরি করবে সে! আর প্রতিদিন সেখানে চুরি করা গহনার পরিবর্তে নকল গহনা রেখে দিলেই চলবে। আর ঐ গহনা বন্ধক দিয়েই তো সে টাকা জোগাড় করতে পারবে। পরে যখন আঙ্গুরক্ষেত থেকে তার চার মিলিয়ন ফ্রাঁ উঠে আসবে তখন বন্ধকি গহনাগুলো ছাড়িয়ে এনে চুপিসারে লকারে রেখে দিলেই ঝামেলা মিটে গেল। হেলেন কিছুতেই টের পাবে না। তারপর সে উড়াল দেবে। চলে যাবে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

চার্লস ফোন করল রেনেকে। উত্তেজনায় ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। 'আমি তোমার সঙ্গে ব্যবসা করতে রাজি আছি।' বলল সে।

প্ল্যানের প্রথম অংশটা সফল করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাকে ঐ সেফ খুলতে হবে। তারপর চুরি করতে হবে অলংকার। ব্যাপারটা ভাবতেই ভয়ে বুক শুকিয়ে যায় চার্লসের। ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়ল। এত নার্ভাস হয়ে গেল যে দিন-দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগল। ব্যাপারটা চোখে পড়ল হেলেনের। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল সে চার্লসকে। কিন্তু ডাক্তার কোনো সমস্যাই দেখলেন না ওর মধ্যে। 'উনি বোধহয় একটু বেশি টেনশন ফিল করছেন', বললেন তিনি। 'দু-একদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা উলঙ্গ স্বামীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল হেলেন। ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল মুখে। বলল, 'ধন্যবাদ ডাক্তার। আপনি এখন যেতে পারেন।'

ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই পোশাক খুলতে শুরু করল সে। হেলেনকে ন্যাংটো হতে দেখে আঁতকে উঠল চার্লস। 'আ-আমার এখন ঠিক ইচ্ছে করছে না।' ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল সে।

'আমার করছে।' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল হেলেন ওর ওপর।

দিনকয়েক পর সুযোগ মিলে গেল চার্লসের। হেলেন ওর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গারমিশখ পারটেনকারচেনে যাচ্ছে স্কি করতে। চার্লসকে নেবে না। চার্লস প্যারিসেই থাকছে।

'আমি প্রতি রাতে তোমাকে বাড়িতে চাই', আদেশের সুরে বলল হেলেন। 'তোমাকে রাতে ফোন করব আমি।'

হেলেনের লালরঙের জেনসেন গাড়িটা গেটের বাইরে মিলিয়ে যেতেই হুড়মুড়িয়ে সেফের দিকে এগোল চার্লস। হেলেনকে সে এটা বহুবার খুলতে দেখেছে। তাই কম্বিনেশান জানাই আছে ওর। পুরো একঘণ্টা লাগল সেফ খুলতে। মখমলের বাক্সে তারার মতো ঝিকিয়ে উঠল চার্লসের মুক্তি। ঝকমক করছে গহনাগুলো। পিয়ের রিচার্ড নামে এক জুয়েলারের সাথে সে ইতিমধ্যে কথা বলে রেখেছে। গহনা নকল করতে জুড়ি নেই এই লোকের। কেন নকল গহনা তৈরি করতে চায় তার কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিতে অনেক সময় লেগেছে চার্লসের। অবশ্য অত কথা না-বললেও চলত। কারণ বুড়ো খোলাখুলিভাবে বলেছে, 'মশিউ, আমাকে এখন সবার জন্যেই গহনা নকল করতে হয়। আজকাল রাস্তায় কেউই আসল গহনা পরে বের হয় না।'

চার্লস ওর কাজ শুরু করল। প্রথমে একটা গহনা দিল সে বুড়োকে। নকল তৈরি হয়ে গেলে ওটা আসলের জায়গায় রেখে আসলটা এক বন্ধকির দোকানে জমা দিয়ে টাকা সংগ্রহ শুরু করল। এভাবে একটা একটা গহনা নকল করাতে প্রচুর সময় লাগল। হেলেন যখন বাড়িতে থাকে না শুধু তখনই সে সেফ থেকে গহনা সরায়। ওর ঘাম ছুটে গেল সব গহনা নকল করে টাকা জোগাড় করতে। তারপর একদিন রেনেকে বলল, 'আমি আগামীকাল পুরো টাকাটা নিয়ে আসছি।'

আগে ছিল টাকার চিন্তা। ব্যবসায় টাকা খাটানোর পর থেকে ওর মাথায় শুধু আঙ্গুরক্ষেত ঘুরতে লাগল। রেনে ওকে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে চলেছে। 'আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো ফল পেতে যাচ্ছি। মদের দাম ইদানীং আকাশ ছুঁতে শুরু করেছে। প্রথম চালানেই আমরা তিনশ হাজার ফ্রাঁ লাভ করব বলে আশা করছি।'

বন্ধুর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে উঠল চার্লস। মুক্তি নামের পাখিটা বুকের খাঁচায় আরো বেশি করে ডানা ঝাপটায়। মনকে প্রবোধ দেয় সে। এই তো আর ক'টা দিন। তারপরই উড়াল দেবে। এমন এক জায়গায় চলে যাবে, যেখানে হেলেনের লম্বা হাত পৌঁছুবে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্বাধীনতার স্বাদ নেবে নতুন করে।

ইদানীং চার্লস হেলেনের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে অদ্ভুত আনন্দ পায়। 'দাঁড়া মাগী, তোর টাকায় আমি বড়লোক হয়ে যাব। কিন্তু যখন আসল ঘটনা জানবি তখন আমার একটা লোমও ছিঁড়তে পারবি না।' মনে-মনে ভাবে সে। হেলেন যখন বিছানায় তাকে উত্তেজিত হয়ে 'আরো জোরে', 'থেমো না' ইত্যাদি বলে তাল মিলিয়ে যেতে বলে, তখন সুবোধ বালকের মতো কাজ করে যায় চার্লস।

আর মনে-মনে হাসে।

আঙ্গুরলতাগুলো তড়তড়িয়ে বেড়ে উঠছে। চার্লস এখন জানে ওদের জন্যে সবচেয়ে টেনশনে থাকতে হয় বসন্ত আর গ্রীষ্মে। সূর্যের আলো আর বৃষ্টির পরশ দুটোই সমানভাবে না-পেলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সাধের আঙ্গুরক্ষেত। খুব বেশি সূর্যের আলো ওদের ফ্লেভার যেমন নষ্ট করে দিতে পারে, তেমনি অতিরিক্ত বৃষ্টিও সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

জুন মাসের শুরুটা হল ভালোভাবেই। প্রতিদিনই চার্লস দুবার করে বার্গান্ডিতে আবহাওয়ার খোঁজখবর নেয়। যত দিন যাচ্ছে ততই অধৈর্য হয়ে উঠছে সে। ঠিক করেছে মন্টেগোতে চলে যাবে। জ্যামাইকাতে রোফ অ্যান্ড সন্সের কোনো শাখা নেই। লোকজনের ভিড়ে ওখানে হারিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। পাহাড়ে ছোট্ট একটা বাড়ি কিনবে সে। আর ঐ দ্বীপে জিনিসপত্রও বেশ সস্তা। খেয়েপরে ভালোই কেটে যাবে দিন।

জুন মাসের আবহাওয়া দিনদিন যত ভালো যেতে লাগল, চার্লসের হৃদয় আনন্দে ততই ভরে উঠল। এই মাসটাতে না আছে বেশি সূর্যতাপ, না বৃষ্টি। ছোট্ট আঙ্গুরশিশুদের ভালোভাবে বেড়ে ওঠার দারুণ সময়। আর আঙ্গুরগুলো যত বাড়তে থাকে, চার্লসের ভবিষ্যৎ স্বপ্নও তত কাছিয়ে আসে।

জুন মাসের পনেরো তারিখ। বার্গান্ডিতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। তারপর দ্রুত বেড়ে চলল বৃষ্টি। এখন প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। আর এত প্রচণ্ড বৃষ্টি যে বাড়ি থেকে বেরুবারও জো নেই।

রেনে চার্লসকে ফোন করে জানাল, 'জুলাইয়ের মাঝামাঝিতেও বৃষ্টি থেমে গেলেও আমরা গাছগুলোকে বাঁচাতে পারব।'

কিন্তু জুলাই মাসে প্রচুর বৃষ্টি হল। জুলাই মাসকে 'স্মরণকালের ভয়াবহতম বৃষ্টির মাস' বলে অভিহিত করলেন ফরাসি আবহাওয়াবিদরা। আগস্ট মাসের শুরুতে, চার্লস মার্টেল তার চুরি-করা টাকার পাই পয়সা পর্যন্ত হারাল। প্রচণ্ড ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। ধ্বংস হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। বুকের ভিতর মুক্তির পাখিটা শেষবারের মতো ডানা ঝাপটে চুপ হয়ে গেল।

এখানে, এই বুয়েন্স আয়ারসে কার রেসিং-এ যেদিন অংশগ্রহণ করতে আসে হেলেন, ঈশ্বরের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করেছে চার্লস : ঈশ্বর ও যেন গাড়ি

অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। কিন্তু ঈশ্বর অভাগাদের কোনো কথাই কানে তোলেন না। হেলেন রোফ বিজয়িনীর বেশে ফিরে এসেছে রিজ হোটেলে। এতই উত্তেজিত ছিল সে, চার্লসকে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে জন্তুর মতো চড়াও হয়েছে। স্বামীর অণ্ডকোষ ধরে চাপ দিয়ে সে যখন শিহরণ অনুভব করছে আর বেচারি চার্লসের ব্যথায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা, ঠিক তখন নক হল দরজায়।

'ধুস শালা' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হেলেন। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠল না। এদিকে দরজায় নকের শব্দ বেড়েই চলেছে। একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'সিনোর মার্টেল?'

'তুমি থাকো। আমি যাচ্ছি।' বলল হেলেন। উঠে দাঁড়াল। বড় একটা সিল্ক রোবে সুঠাম দেহটাকে ঢেকে এগোল দরজার দিকে। খুলল দরজা। ধূসর-রঙা ইউনিফর্ম-পরা এক ম্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। হাতে একটা সিল-করা ম্যানিলা খাম।

'সিনোর এবং সিনোরা মার্টেলের জন্য আমি একটা বিশেষ খবর নিয়ে এসেছি।' বলল সে।

হেলেন মাথা ঝাঁকাল। হাত বাড়িয়ে খামটা নিল। বন্ধ করল দরজা। খামের মুখ ছিঁড়ল। পড়তে শুরু করল খবরটা।

'কী আছে ওতে?' জানতে চাইল চার্লস।

'স্যাম রোফ মারা গেছেন', বলল হেলেন। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ।

পাঁচ

লন্ডন
সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর
বিকেল, ২টা

পিকাডিলির কাছে সেন্ট জেমস স্ট্রিটের মাথায় হোয়াইটস ক্লাবের অবস্থান। জুয়ার ক্লাব হিসেবে অষ্টাদশ শতকে গড়ে ওঠে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বিলাসবহুল এই ক্লাব ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরোনো ক্লাবগুলোর অন্যতম। হোয়াইটস ক্লাবের সদস্যরা জন্মের পরপরই তাদের পুত্রদের নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তারপরও ত্রিশ বছরের ওয়েটিং লিস্টে থাকে তাদের নাম।

স্যার অ্যালেক নিকলস, পার্লামেন্ট সদস্য। তার অতিথি জন সুইনটনের সঙ্গে ক্লাবের এককোনায় ছোট টেবিলগুলোর একটাতে বসে লাঞ্চ করছেন। স্যার অ্যালেকরা বংশানুক্রমিকভাবে হোয়াইটস ক্লাবের সদস্য। স্যার অ্যালেক দেখতে রোগা-শুকনো। বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায়। তবে তিনি সজীব এবং সপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাসতে জানেন। আর তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অনেককেই আকর্ষণ করে। স্যার অ্যালেক কিছুক্ষণ আগে তার গ্রামের বাড়ি থেকে এখানে এসেছেন নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে। জামা-কাপড় ছাড়ার সময় পাননি বলে এই মুহূর্তে তার পরনে টুইড স্পোর্টস জ্যাকেট আর স্ল্যাকস। তার অতিথির গায়ে পিন-স্ট্রাইপ স্যুট, ঢোলা চেক শার্ট আর লাল টাই। এই অভিজাত পরিবেশে দুজনকেই কেমন বেমানান লাগছে।

ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জন সুইনটন সরু-চোখে তাকাল অ্যালেক নিকলসের দিকে। 'এখন, স্যার অ্যালেক, বাজে কথা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসুন।'

অ্যালেক নিকলস নরম গলায় বললেন, 'আমি তো আপনাকে দুই হপ্তা আগেই জানিয়েছি, মি. সুইনটন। আমার ইদানীং খুব সমস্যা যাচ্ছে। আমার আরো কিছু সময় দরকার।'

একজন ওয়েটার এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। কাঠের সিগার-বক্সগুলো রাখল টেবিলের উপর।

'আশা করি কিছু মনে করবেন না', বলল জন সুইনটন। বক্সের গায়ে লেবেল দেখে শিস দিয়ে উঠল সে। অনেকগুলো সিগার বের করে ব্রেস্টপকেটে রেখে দিল। তারপর একটা ধরাল। এহেন ছোটলোকামিতে স্যার অ্যালেক কিংবা ওয়েটার কেউই কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না। নড় করল ওয়েটার। সিগার-বক্সগুলো নিয়ে অন্য টেবিলে চলে গেল।

'আমার বস্ আপনার প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন, স্যার অ্যালেক। কিন্তু এখন তিনি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছেন।' জ্বলন্ত কাঠিটা সামনে বাড়াল সে। ফেলে দিল স্যার অ্যালেকের মদের গ্লাসে। ছ্যাঁত করে নিভে গেল ওটা। 'আপনি নিশ্চয়ই চান না তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাক। আর তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার অর্থটা আশা করি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

'বিশ্বাস করুন আমার কাছে একদম টাকা নেই।'

প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠল জন সুইনটন। 'দূর মশাই, আজাইরা প্যাঁচাল বাদ দেন তো। আপনার মা একজন রোফ ছিলেন, ঠিক? আপনার হাজার একরের ফার্ম আছে। নাইটসব্রিজে রয়েছে বিলাসবহুল বাড়ি, দামি রোলস রয়েস এবং একটা বেন্টলি গাড়িও। সুতরাং আপনি একেবারে ফকিরনীর পোলা না, কি বলেন?'

স্যার অ্যালেক চারিদিকে দ্রুত একবার তাকালেন। তার চেহারা বিষণ্ন হয়ে গেছে। আস্তে বললেন, 'ওগুলোর কোনোটাই হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ নয়। আমার পক্ষে ওগুলো বিক্রি করাও সম্ভব না।'

চোখ পিটপিট করল সুইনটন, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনার ছোট্ট, সুন্দর বউটা, ভিভিয়ান, একটা হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ।'

'অ্যাঁ!'

স্যার অ্যালেকের মুখ লাল হয়ে উঠল। এই লোকটার মুখে ভিভিয়ানের নাম অত্যন্ত অশ্লীল শোনাচ্ছে। গ্রিকদেবীর মতো সুন্দরী ভিভিয়ানের অনিন্দ্য মুখখানা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। এইতো আজ সকালে ভিভিয়ানের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছেন তিনি অনেকক্ষণ। ওদের বেডরুম যদিও আলাদা, কিন্তু ভিভিয়ানের রুমে অ্যালেকের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। ঘুম থেকে মাঝে মাঝে জেগে ওঠেন স্যার অ্যালেক। চুপিসারে গিয়ে ঢোকেন ভিভিয়ানের বেডরুমে। পলকহীন চোখে তাকে দেখতে থাকেন। এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখেননি তিনি। নগ্ন হয়ে ঘুমায় ভিভিয়ান। ওর শরীর রেশমের মতো নরম আর উষ্ণ। গায়ের রঙ যেন ক্রিম, দুই নীলচোখে সাগরের গভীরতা। একমাথা ঝলমলে আগুনরঙা চুল। সব মিলে যেন একটি প্রতিমা।

স্যার অ্যালেকের সঙ্গে এক চ্যারিটি অনুষ্ঠানে ভিভিয়ানের যখন পরিচয় হয় তখন সে অখ্যাত এক অভিনেত্রী। ওর চোখ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্যার অ্যালেক। আর মোহিত করে তুলেছিল ভিভিয়ানের সহজ এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। বয়সে বিশ বছরের ছোট এই অখ্যাত অভিনেত্রী প্রথম দর্শনেই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল স্যার অ্যালেকের।

সারাক্ষণ ওর কথাই মনে পড়ত তার। কিন্তু স্বভাবলাজুক স্যার অ্যালেকের পুরো দুই সপ্তাহ লেগেছিল আড়ষ্টতা কাটিয়ে ভিভিয়ানকে ফোন করতে। ভিভিয়ান তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল। খুশি আর বিস্ময়ে স্যার অ্যালেক তখন আটখানা। ওকে নিয়ে সেদিনই গিয়েছিলেন বিখ্যাত 'ওল্ড ভিক'-এ অপেরা দেখতে। তারপর ডিনার সেরেছেন মিয়াবেলে। ভিভিয়ান নটিংহিলে একটা ছোট্ট বেজমেন্ট ফ্ল্যাটে থাকত। অ্যালেক যখন ওকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন, ভিভিয়ান জানতে চাইল, 'ভেতরে এসে একটু বিশ্রাম নেবে তুমি?' বিশ্রাম নিয়েছিলেন স্যার অ্যালেক। পুরো রাতটাই কাটিয়ে দিয়েছিলেন ওখানে। আর ঐ রাত তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। চরম তৃপ্তি কী জিনিস সেই প্রথম জানলেন তিনি। ভিভিয়ান তাকে যে স্বর্গসুখ দিল তার সাথে কোনোকিছুর তুলনা হয় না। সুখে জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা হয়েছিল তার। তারপর থেকে ভিভিয়ানের কথা ভাবলেই শরীর গরম হয়ে উঠত স্যার অ্যালেকের।

শুধু যৌনতৃপ্তি নয়, ভিভিয়ান আরো অনেক কিছু দিয়েছিল তাকে। জীবনটাকে প্রকৃত অর্থে মধুময় করে তুলেছিল সে। স্যার অ্যালেকের নিরানন্দ জীবনকে হাসি-ঠাট্টা আর নির্মল আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। তিনি ভিভিয়ানকে নিয়ে যে পার্টিতেই যেতেন, আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠত সে। অ্যালেক এতে গর্ববোধই করতেন। কিন্তু ওকে ঘিরে থাকা যুবাবয়সের ছেলেদের ভিড় তিনি কিছুতেই মানতে পারতেন না। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতেন ভিভিয়ান আসলে কতজনের সঙ্গে বিছানায় গেছে?

কোনো কোনো রাতে অন্য কারো সাথে এনগেজমেন্টের কারণে ভিভিয়ান আসতে পারত না। অ্যালেক তখন ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরতেন। তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে ওর ফ্ল্যাটে যেতেন। লুকিয়ে অপেক্ষা করতেন। কখন ভিভিয়ান বাড়ি ফেরে, তার সঙ্গের নাগরটা কে দেখাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। অ্যালেক বুঝতেন কাজটা বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও নিজেকে সামলাতে পারতেন না।

স্যার অ্যালেক খুব ভালো করেই জানতেন ভিভিয়ানের সঙ্গে তার সম্পর্ক সমাজ কখনও মেনে নেবে না, আর তাকে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি একজন ব্যারনেট, পার্লামেন্টের সম্মানিত সদস্য। তার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তিনি রোফ সাম্রাজ্যের একজন, কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টদের একটি পদ অলংকৃত করে আছেন। কিন্তু সেদিক থেকে তুলনা করলে ভিভিয়ান কী? কিছুই না। ওর না আছে শিক্ষাদীক্ষা, না আছে পারিবারিক ঐতিহ্য। ওর একটাই গুণ— ও সুন্দরী এবং বিছানায় তুলনাহীন। ওর মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধিও কম। তারপরও অ্যালেক ভিভিয়ানের কথা ভুলতে পারছিলেন না। ওর সঙ্গে দেখা না-করার অনেক চেষ্টা করেছেন, মনকে বহুবার প্রবোধ দিয়েছেন, কিন্তু কাজ হয়নি। ভিভিয়ানের সঙ্গে যতক্ষণ থাকতেন, মনে হত স্বর্গে আছি। আর ভিভিয়ান চলে গেলেই আন্ধার হয়ে আসত দুনিয়া। নিজেকে ভীষণ দুঃখী আর বিষণ্ন মনে হত। স্যার অ্যালেক বুঝতে পারছিলেন আসলে ভিভিয়ানকে

ছাড়া তিনি বাঁচতে পারবেন না। সম্পর্ক যখন তুঙ্গে, সেই সময় দুরুদুরু বুকে প্রস্তাবটা দিলেন স্যার অ্যালেক।

ভিভিয়ান সম্মতি জানাতে তার আর খুশির সীমা রইল না।

ভিভিয়ানকে বৌ করে এনে স্যার অ্যালেক চলে গেলেন তাঁর গ্রামের বাড়ি গ্লুকেসটারশায়ারে। নিজের প্রাসাদোপম বাড়িতে উঠলেন। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে দেড় মাস পর ভিভিয়ান বলল, 'অ্যালেক, এই বাড়ি থেকে অন্য কোথাও যাই চলো।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন স্যার অ্যালেক, 'তুমি কি কিছুদিনের জন্য লন্ডনে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলছ, নাকি—'

তার আশঙ্কা সত্য প্রমাণ করে দিয়ে ভিভিয়ান বলল, 'আমি লন্ডনে থেকে যাওয়ার কথা বলছি।'

অ্যালেক জানালার বাইরে তাকালেন। সবুজ তৃণভূমি, বিশালাকার সিকামোর আর ওকগাছগুলো দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এখানে ঐ সবুজ মাঠে খেলতে খেলতে তাঁর শৈশব কেটেছে। একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন, 'ভিভিয়ান জায়গাটা শান্ত, সুন্দর, আমি—'

'আমি জানি, ডার্লিং। এমন শান্ত পরিবেশে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।' বলল ভিভিয়ান।

আর সে-সপ্তাহেই বৌকে নিয়ে স্যার অ্যালেক চলে এলেন লন্ডনে।

নাইটসব্রিজের কাছে উইলটন ক্রিসেন্টে স্যার অ্যালেকের চারতলা একটি বাড়ি আছে। এই বিশাল অভিজাত বাড়িতে কী নেই? ড্রইং, স্টাডি, ডাইনিং রুম, বাইরের বাগানে পাথরের ভাস্কর্য, ছোট ঝরনা, দোতলায় চারটে ছোট বেডরুমসহ একটি অদ্ভুত সুন্দর মাস্টার স্যুট— সব মিলে ছোটখাটো একটি প্রাসাদের মতো বাড়িটি।

এই বাড়ির মাস্টার স্যুটে ওদের দুই সপ্তাহ কাটল। তারপর একদিন সকালে ভিভিয়ান বলল, 'অ্যালেক, ডার্লিং, তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু রাতে তুমি এমন নাক ডাকো আমার ঘুমুতে খুব অসুবিধে হয়। আমি যদি এখন থেকে একা ঘুমাই তুমি কি মাইন্ড করবে?'

ভয়ানক মাইন্ড করলেন অ্যালেক। ভিভিয়ানের রেশমি কোমল শরীরের স্পর্শ তাকে উষ্ণ করে তোলে ঠিকই, কিন্তু তিনি জানতেন ওকে অন্য পুরুষরা যেভাবে উত্তেজিত করতে পারে, তিনি সেভাবে পারেন না। আর স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ তৃপ্তি পায় না বলেই ভিভিয়ান একা থাকতে চাইছে। তিনি শুকনোমুখে বললেন, 'ঠিক আছে ডার্লিং, তুমি যা বলছ তাই হবে।'

অ্যালেকের জেদের কারণে ভিভিয়ান মাস্টার স্যুটে ঘুমাতে শুরু করল। আর অ্যালেক চলে গেলেন গেস্টদের জন্য রক্ষিত ছোট একটি বেডরুমে।

শুরুতে ভিভিয়ান 'হাউস অব কমন্স'সভায় যেত, ভিজিটরস গ্যালারিতে বসে থাকত। স্বামীর বক্তৃতা শুনত। বক্তৃতা করতে করতে অ্যালেক ওর দিকে তাকাতেন। গর্বে বুক ভরে উঠত। উপস্থিত রমণীদের মধ্যে ভিভিয়ান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। কিন্তু একদিন গ্যালারিতে তাকিয়ে বিরাট এক ধাক্কা খেলেন। শূন্য আসন। ভিভিয়ান নেই!

অ্যালেক নিজেকেই দোষারোপ করলেন। আলোচনাসভায় স্বামীর বয়সী বন্ধুদের সান্নিধ্য যে ভিভিয়ানের ভালো লাগে না এটা কখনও খেয়াল করেননি তিনি। তিনি নিজেই ভিভিয়ানকে এরপর থেকে তার তরুণবন্ধুদের বাড়িতে দাওয়াত করার উৎসাহ দিতে লাগলেন। কিন্তু ফল হল মারাত্মক।

অ্যালেক নিজের মনকে প্রবোধ দিতেন এই বলে যে ভিভিয়ানের একটা বাচ্চা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু একদিন জানতে পারলেন ভ্যাজাইনাল একটা ইনফেকশনের কারণে মা হবার ক্ষমতা হারিয়েছে সে। খবরটা প্রচণ্ড আঘাত করল স্যার অ্যালেককে। সন্তানের বাপ হওয়ার বড় সাধ ছিল তার। কিন্তু ভিভিয়ানকে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হল না।

'এ নিয়ে এত মন খারাপ করছ কেন, ডার্লিং?' হাসতে হাসতে বলল সে। 'সবাই তো আর মা হতে পারে না। এজন্য ঘুম নষ্ট করার কোনো দরকার নেই, কি বলো?'

স্যার অ্যালেক ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

ভিভিয়ান কেনাকাটা করতে খুব পছন্দ করে। জলের মতো টাকা খরচ করে সে অলংকার এবং গাড়ি কিনতে লাগল। কিন্তু ওকে নিষেধ করার সাহস হল না স্যার অ্যালেকের। ভাবলেন দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা ভিভিয়ানের দামি জিনিসপত্রের প্রতি আকর্ষণ থাকতেই পারে। তার ইচ্ছে করে বৌকে অনেককিছু কিনে দিতে। কিন্তু সম্ভব হয় না। কারণ তার বেতন নিয়ন্ত্রণ করে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। রোফ অ্যান্ড সন্সে তার যে বিরাট স্টক আছে ওটা বিক্রি করতে পারলে টাকার কোনো সমস্যাই হত না। কিন্তু তা সম্ভব না। কারণ রোফ অ্যান্ড সন্সের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রক স্যাম রোফ। আর তিনি এই কোম্পানির কোনো স্টক বিক্রি করতে বিন্দুমাত্র রাজি নন। ব্যাপারটা ভিভিয়ানকে বোঝাতে চেয়েছেন অ্যালেক। কিন্তু সে এ-ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। তার আনন্দ শুধুই কেনাকাটাতে। স্যার অ্যালেক আর কী করেন, মুখ বুজে সব সয়ে গেছেন।

ভিভিয়ান জুয়া খেলে। এই খবরটা তিনি পেলেন সোহোর টড ক্লাবের মালিক টড মাইকেলের কাছে।

'আপনার স্ত্রী খেলতে এসে এক হাজার পাউন্ড হেরেছেন, স্যার অ্যালেক। কিন্তু টাকাটা তিনি এখনো পরিশোধ করেননি।' বলল টড মাইকেল।

শুনে দারুণ মর্মাহত হলেন স্যার অ্যালেক। টাকাটা শোধ করে দিলেন তিনি। সন্ধ্যায় খোলাখুলিভাবে স্ত্রীকে বললেন, 'আমাদের পক্ষে এভাবে চলা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আমি যা আয় করি তার চেয়ে তুমি বেশি ব্যয় করে চলেছ।'

ভিভিয়ানকে খুব অনুতপ্ত মনে হল। বলল, 'দুঃখিত ডার্লিং, আর খেলব না।' সে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। শরীরে শরীর মেশাল। স্যার অ্যালেকের রাগ নিমিষে উবে গেল। স্ত্রীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করতে করতে ভাবলেন ভিভিয়ান যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আর কখনও জুয়া খেলবে না।

দুই সপ্তাহ পর টড মাইকেল আবারও স্যার অ্যালেকের সঙ্গে দেখা করতে এলো। এবার ভিভিয়ান পাঁচ হাজার পাউন্ড দেনা রেখে এসেছে, জানাল সে। অ্যালেক ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন।

'আপনি ওকে বাকিতে খেলতে দেন কেন?'

'উনি আপনার স্ত্রী, স্যার অ্যালেক,' নম্রকণ্ঠে বলল মাইকেল। 'ওঁকে প্রত্যাখ্যান করলে ব্যাপারটা কেমন দেখাবে?'

'আ-আমাকে টাকাটা জোগাড় করতে হবে', বললেন অ্যালেক। 'এই মুহূর্তে অত টাকা আমার কাছে নেই।'

'তাহলে স্যার এটা লোন হিসেবেই ধরুন। যখন পারবেন শোধ করে দেবেন।'

অ্যালেক বিরাট স্বস্তি অনুভব করলেন। বললেন, 'সে আপনার অশেষ দয়া, মি. মাইকেল।'

এক মাস পর স্যার অ্যালেক জানতে পারলেন ভিভিয়ান জুয়াতে হেরে গিয়ে আরো পঁচিশ হাজার পাউন্ডের দেনার বোঝা চাপিয়েছে তার কাঁধে। আর টাকাটা প্রতি সপ্তাহে দশ পার্সেন্ট হারে সুদ বেড়ে চলেছে। ভয় পেলেন অ্যালেক। কারণ অত টাকা নগদ শোধ করার ক্ষমতা তার নেই। এই বাড়ি, গাড়ি, অ্যান্টিকস সবই রোফ অ্যান্ড সন্সের সম্পত্তি। বিক্রি করার কোনো উপায় নেই। ভিভিয়ানের ওপর প্রচণ্ড রাগ হল তার। কারণ সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আর জুয়া খেলবে না। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অ্যালেক নিজেকে আবিষ্কার করলেন দেনার হাঙরদের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া অবস্থায়। একসঙ্গে এত টাকা শোধ করার ক্ষমতা তার নেই। এদিকে দশ পার্সেন্ট হারে এই টাকা দিনদিন বেড়েই চলবে। ঋণের সাগরে শেষপর্যন্ত হয়তো তাকে দমবন্ধ হয়ে মারাই যেতে হবে।

টড মাইকেলের পোষা কুত্তা এসে স্যার অ্যালেককে প্রথম যখন টাকার জন্য চাপ দিল, তিনি ভয় দেখালেন পুলিশ কমিশনারের কাছে যাবেন। 'উঁচুমহলের সাথে আমার ভালো জানাশোনা আছে।' হুমকি দিলেন তিনি।

লোকটা দাঁত বের করে হাসল। 'আর আমাদের আছে নিচুমহলের সঙ্গে।'

এর কয়েক দিন পরেই স্যার অ্যালেকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে জন সুইনটন নামের এই ভয়ংকর লোকটা।

'যে টাকা ধার হয়েছিল তার চেয়ে বেশি টাকাই তো আমি শোধ করে দিয়েছি। কিন্তু তবুও কেন ওরা—'

সুইনটন বাধা দিয়ে বলল, 'ওটা তো আপনি শুধু সুদের টাকা শোধ করেছেন, স্যার অ্যালেক। আসল এখনো রয়েই গেছে।'

'এ স্রেফ গা-জোরালী।' বললেন অ্যালেক।

সুইনটনের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। 'বস্‌কে আমি এই ম্যাসেজটা দেব।' উঠতে শুরু করল সে। অ্যালেক দ্রুত বলে উঠলেন, 'না না। উঠবেন না, বসুন প্লিজ।'

সুইনটন আস্তে করে বসল আবার। 'এরকম আপত্তিকর কথা কখনও বলবেন না।' সতর্ক করে দিল সে। 'শেষ যে লোকটা এই ধরনের কথা বলেছিল তার দুটো হাঁটুই ভেঙে দেয়া হয়েছে।'

অ্যালেক খবরটা জানেন। পত্রিকায় পড়েছেন। অন্ধকার জগতের এসব লোকের প্রকৃতি খুব নিষ্ঠুর হয়। রীতিমতো নার্ভাস লাগল নিজেকে লোকটার সামনে। গলা শুকিয়ে এলো।

'আমি আসলে ওভাবে কথাটা বলতে চাইনি', বললেন তিনি। 'মানে আ-আমার কাছে আর নগদ টাকা নেই যে।'

সিগারের ছাই ঝাড়ল সুইনটন অ্যালেকের মদের গ্লাসে।

'রোফ অ্যান্ড সন্সে আপনার বড়সড় একটা স্টক আছে। আছে না?'

'হ্যাঁ', বললেন অ্যালেক। 'কিন্তু এটা বিক্রির যোগ্য কিংবা হস্তান্তরযোগ্য কোনোটাই নয়। রোফ অ্যান্ড সন্স স্টকের শেয়ার পাবলিকের কাছে বিক্রি না-করা পর্যন্ত এ থেকে কেউই লাভবান হতে পারছে না।'

সিগারে জোরে টান দিল সুইনটন। 'এটা কি বিক্রি হবে?'

'সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে স্যাম রোফের ওপর। আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করছি।'

'আরো বেশি করে চেষ্টা করুন।'

'মি. মাইকেলকে বলবেন তিনি তার টাকা পাবেন। কিন্তু এভাবে যেন আমাকে তাড়িয়ে না বেড়ান।'

সুইনটন যেন ভয়ানক বিস্মিত হয়েছেন সেইভাবে তাকাল।

'আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন মি. মাইকেল? আরে মিয়া ভোদাই আমরা যখন আপনাকে তাড়া করব তখন বুঝবেন কত ধানে কত চাল। আপনার আস্তাবল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এমনকি আপনার স্ত্রীর কপালেও একই ঘটনা ঘটতে পারে।' হাসছে সে। হাসতে হাসতে বলল, 'বেগুনপোড়া যোনি খেয়েছেন কখনও?'

অ্যালেকের মুখ ছাই হয়ে গেল। 'ঈশ্বরের দোহাই—'

সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল সুইনটন। 'আরে, আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। টড মাইকেল আপনার বন্ধু। আর বন্ধুরা বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য করেই থাকে, তাই না? আজ সকালের মিটিঙে বস্‌ আপনার কথাই

বলছিলেন। বলছিলেন স্যার অ্যালেক লোক ভালো। উনি যদি টাকা দিতে না পারেন তাহলে নিশ্চয়ই বিকল্প কোনো উপায় ভেবে রেখেছেন।'

অ্যালেক ভ্রূ কোঁচকালেন। 'বিকল্প উপায়টা কী?'

'আপনি বড় একটা ড্রাগ-ফার্ম চালান, ঠিক? ওখানে কোকেন জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়। ধরুন অল্পকিছু মাল আমি আর আপনি ছাড়া অন্য কারো জানার কোনো সুযোগই নেই, এদিক সেদিক হয়ে গেল, ক্ষতি কী?'

অ্যালেক বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। 'আপনি লোকটা মোটেই সুবিধের নন দেখছি। আ-আমি ওসব দুই নম্বরি কাজ করতে পারব না।'

অমায়িক ভঙ্গিতে হাসল সুইনটন। 'কিছু লোক আছে যারা যা পারবে না ভাবে, প্যাঁচে পড়লে ওটাই চমৎকার পারে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'হয় আপনি আমাদের টাকা শোধ করবেন, নয়তো যে জিনিস ডেলিভারি দিতে বললাম সেটা করে দেবেন।' হাতের সিগারটা সে ছুড়ে ফেলল অ্যালেকের খাবার প্লেটে। 'ভিভিয়ানকে আমার ভালোবাসা জানাবেন, স্যার অ্যালেক। টা টা।' বলে চলে গেল সে।

স্যার অ্যালেক চুপচাপ বসে রইলেন ওখানেই। প্লেটের ওপর নিভন্ত সিগারটা ভয়ানক কুৎসিত লাগছে দেখতে। অবাক হয়ে ভাবছেন শেষপর্যন্ত নিম্নশ্রেণীর একটা গুণ্ডা তাকে ভয় দেখিয়ে গেল। অথচ তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। দেনার দায়ে ফেলে ওরা এখন জোর করে ওকে দিয়ে অসৎ উপায়ে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। স্যার অ্যালেক এখন গুণ্ডাদের হাতে জিম্মি। এটা প্রতিপক্ষ জানতে পারলে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না। এটাকে পুঁজি করেই ওরা তার বিরুদ্ধে নেমে পড়বে। তার নিজের দলই হয়তো তাকে পদত্যাগ করতে বলবে। শেষপর্যন্ত অবস্থা হয়তো এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে যে স্যার অ্যালেকের পক্ষে পার্লামেন্টে থাকাই সম্ভব হবে না। সুতরাং ওদের চাহিদামাফিক টাকাটা দিয়ে দিতেই হবে। প্রয়োজনে তিনি স্যাম রোফের সঙ্গে আবারও কথা বলবেন। অনুরোধ করবেন প্রাইভেট স্টক পাবলিক স্টকে পরিণত করার জন্য।

'ঐ চিন্তা মাথাতেই এনো না', স্যাম তাকে বলেছিলেন। 'যে মুহূর্তে আমরা বহিরাগতদের এই ব্যবসায় ঢোকাব, সাথে সাথে দেখবে বাইরের অসংখ্য লোক এসে আমাদের উপদেশ দিচ্ছে ব্যবসা কীভাবে চলাতে হয় সেই ব্যাপারে। তুমি টের পাবার আগেই ওরা বোর্ডের কর্তৃত্ব নিয়ে নেবে। তারপর কোম্পানি দখল করবে। কিন্তু তোমার সমস্যাটা কী অ্যালেক? তুমি তো বেশ বড় অঙ্কের একটা বেতন পাচ্ছ। খরচের জন্যও কোম্পানি প্রচুর টাকা দিচ্ছে। তারপরও তোমার এত টাকার দরকার কেন?'

অ্যালেকের ইচ্ছে করছিল আসল কথাটা খুলে বলবেন স্যাম রোফকে। কিন্তু মুখ খোলাটা তার জন্যে মঙ্গল বয়ে আনবে না ভেবে চুপ থেকেছেন। স্যাম রোফ ভয়ানক কঠোর প্রকৃতির মানুষ। উনি যদি কখনও জানতে পারেন রোফ অ্যান্ড সন্সকে নিয়ে কমপ্রোমাইজ করার চেষ্টা করছে অ্যালেক তখন একমুহূর্তও দেরি না করে

তিনি তার প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে বের করে দেবেন। নাহ্, পাহাড় টলানো গেলেও স্যাম রোফকে টলানো সম্ভব নয়। স্যার অ্যালেকের ধ্বংস অনিবার্য। বাঁচার কোনোই উপায় নেই।

হোয়াইটস ক্লাবের রিসেপশন পোর্টার এগিয়ে এল স্যার অ্যালেকের টেবিলের দিকে। সঙ্গে একজন লোক। পরনে ম্যাসেঞ্জার ইউনিফর্ম। হাতে একটা সিল-করা ম্যানিলা খাম।

'মাফ করবেন, স্যার অ্যালেক', ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল পোর্টার। 'এই লোকটি বলছে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে একটা জিনিস দেবে।'

'ধন্যবাদ', স্যার অ্যালেক বললেন। লোকটা ম্যানিলা খামটা তুলে দিল তার হাতে। ঘুরে দাঁড়াল, পোর্টার তাকে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

অ্যালেক অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন। খুললেন। ভেতরের ম্যাসেজটা পরপর তিনবার পড়লেন। আস্তে করে হাতের মুঠোতে ভাঁজ করে ফেললেন কাগজটা। অশ্রুতে তার চোখ ভরে উঠল।

ছয়

নিউইয়র্ক
সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর
সকাল এগারোটা

প্রাইভেট বোয়িং ৭০৭-৩২০ কেনেডি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। লম্বা ক্লান্তিকর ভ্রমণে রিজ উইলিয়ামস খুব ক্লান্ত। বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে। রাতে এক সেকেন্ডের জন্যেও ঘুমাতে পারেনি সে। এই উড়োজাহাজে স্যাম রোফের সঙ্গে আগেও কতবার চড়েছে সে। মনে হচ্ছে এখনও যেন স্যামের ছোঁয়া লেগে আছে এর গায়ে।

এলিজাবেথ রোফ অপেক্ষা করছে রিজের জন্য। রিজ ইস্তাম্বুল থেকে তার পাঠিয়ে বলেছে বিশেষ কারণে আজ সে আসছে তার সাথে দেখা করতে। ফোনে খবরটা বলা যেত। কিন্তু এলিজাবেথকে মুখোমুখি জানাতে চায় রিজ।

বোয়িং মাটি স্পর্শ করল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে টার্মিনালের দিকে ছুটল। রিজ সঙ্গে তেমন কোনো লাগেজ আনেনি। তাই কাস্টমসের ঝামেলা থেকে সহজেই রেহাই পেয়ে গেল। একটা লিমুজিন অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। এটা ওকে স্যাম রোফের লাভ আইল্যান্ড স্টেটে নিয়ে যাবে। এলিজাবেথ ওখানেই থাকবে।

এলিজাবেথকে কী বলবে মনে-মনে কথাগুলো বারবার ঝালিয়ে নিল রিজ। কিন্তু বাড়ি পৌঁছার পর এলিজাবেথের সহাস্য অভ্যর্থনায় সব কথা তালগোল পাকিয়ে গেল। এলিজাবেথকে এ-পর্যন্ত যতবার দেখেছে মুগ্ধ হয়েছে ও। মেয়েটা অবিকল তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। সেইরকম চাউনি, তেমনি চেহারা। ওর ত্বক দুধের মতো সাদা। মসৃণ চুলগুলো রেশমের মতো উজ্জ্বল। সুগঠিত মেদহীন শরীর। এই মুহূর্তে এলিজাবেথ কাঁধখোলা ক্রিম রঙের সিল্কের ব্লাউস আর নিভাঁজ গ্রে ফ্লানেল শার্ট পরে আছে। নয় বছর আগের সেই ছোট্ট, লাজুক মেয়েটির সঙ্গে এই ঝলমলে, পূর্ণ যুবতীর চেহারার কোনো মিলই নেই। হাসছে এলিজাবেথ। রিজকে দেখে খুশি হয়েছে সে। হাত ধরে বলল, 'এসো রিজ।' ওকে নিয়ে চলল বিশাল ওক-প্যানেলের লাইব্রেরির দিকে। জানতে চাইল, 'বাবা আসেননি তোমার সঙ্গে?'

গভীর শ্বাস টানল রিজ। বলল, 'স্যাম অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন, লিজ।' লক্ষ্য করল এলিজাবেথের মুখটা দ্রুত রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। চুপ করে আছে। রিজ কথা শেষ করল, 'মারা গেছেন তিনি।'

পাথর হয়ে গেল এলিজাবেথ। কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা জোগাল না মুখে। যখন মুখ খুলল, রিজ প্রায় শুনতেই পেল না ওর কথা।

'কী— কীভাবে?'

'আমরা বিস্তারিত এখনও কিছু জানতে পারিনি। স্যাম মন্ট ব্লঙ্ক পাহাড়ে চড়ছিলেন। রশিটা হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। একটা গহিন খাদে পড়ে যান স্যাম।'

'ওকে কি ওরা খুঁজে—' চোখ বন্ধ করল এলিজাবেথ শিউরে ওঠে। তারপর চোখ খুলল।

'না। পাওয়া যায়নি। আর পাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না।'

সাদা হয়ে গেছে এলিজাবেথের মুখ। ভয় পেল রিজ।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

হাসল এলিজাবেথ। 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। তুমি কিছু খাবে? চা অথবা অন্য কিছু?'

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল রিজ। কিছু বলতে যাবে, এই সময় ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। ভয়ানক আঘাত পেয়েছে এলিজাবেথ। তাই কী বলছে নিজেই বুঝতে পারছে না। ওর চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, হাসি আড়ষ্ট।

'বাবা খুব ভালো এ্যাথলেট ছিলেন।' এলিজাবেথ বলে চলল, 'তুমি তো ওনার পুরস্কারগুলো দেখেছ। সব সময়ই তিনি জিততেন, তাই না? তুমি কি জানো বাবা এর আগেও একবার মন্ট ব্লঙ্কে উঠেছিলেন?'

'লিজ—'

'তুমি নিশ্চয়ই জানো। তুমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলে, তাই না?'

রিজ চুপ করে রইল। কথা বলুক এলিজাবেথ। যত পারে কথা বলুক। সাংঘাতিক আঘাতটাকে সামাল দিতে ওর প্রচুর কথা বলা দরকার। দরকার বুক খালি করা কান্না। যে ছোট্ট মেয়েটি শক্ত কোনো কথা সইতে পারত না, সে বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনেও কাঁদছে না, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকছে রিজের কাছে। মনে-মনে আশঙ্কা বোধ করল সে এলিজাবেথের জন্য।

'আমি ডাক্তারকে খবর দিই।' বলল সে। 'সে তোমাকে কিছু—'

'ওহ্, নো। আমি একদম ঠিক আছি। তুমি যদি কিছু মনে না করো আমি কিছুক্ষণের জন্য একটু শোব। শরীরটা কেন জানি খুব খারাপ লাগছে।'

'আমি কি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকব?'

'ধন্যবাদ। তার প্রয়োজন হবে না।'

দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল এলিজাবেথ রিজকে। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, এলিজাবেথ ডাকল, 'রিজ।'

ঘুরে দাঁড়াল রিজ।

'এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ।' ম্লান হেসে বলল এলিজাবেথ। রিজ কিছু বলল না। অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ির মধ্যে।

রিজ চলে যাবার পর অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকল এলিজাবেথ। সিলিঙের দিকে একঠায় তাকিয়ে রইল শূন্যদৃষ্টিতে। তারপর একসময় ব্যথাটা এল। বুকের গভীর থেকে। ইচ্ছে করেই এলিজাবেথ কোনো ওষুধ খায়নি। মনেপ্রাণে চেয়েছে ব্যথাটা আসুক। এই ব্যথা তাকে সইতেই হবে। সে যে স্যাম রোফের মেয়ে। সারাদিন সারারাত সে ওখানেই শুয়ে রইল। স্মৃতিরা একের-পর-এক ভিড় করে এল। কখনো এলিজাবেথ কেঁদে ভাসিয়ে দিল বালিশ, কখনো হাসল পাগলের মতো। যেন হিস্টিরিয়ায় পেয়েছে। ওর হাসি বা কান্না কেউ শুনতে পেল না। সাউন্ডপ্রুফ এই রুমের কোনো শব্দ বাইরে যায় না। গভীর রাতে হঠাৎ করেই খিদে লাগল তার। রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুলে একটা বড়সড় স্যান্ডউইচ বের করল। কামড় বসাল। বমি বমি করে উঠল গা। ফেলে দিল ওটা। কোনোকিছুই ভালো লাগছে না। বুকের এই ভয়ংকর বেদনা কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছে না। বারবার মন চলে যাচ্ছে সুদূর অতীতে।

তারপর একসময় ভোর হল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে এলিজাবেথ দেখল সূর্যের উত্থানপর্ব। খানিক্ষণ পর ওর এক চাকর এসে দরজায় নক করল। ভাগিয়ে দিল তাকে। হঠাৎ একবার ফোন বেজে উঠল। ধক্ করে উঠল বুক। মনে হল বাবা ফোন করেছেন। হাত বাড়াল সে ফোনের দিকে। পরক্ষণে মনে পড়ল বাবা তো নেই। গুটিয়ে আনল হাত।

বাবা আর কখনো তাকে ফোন করবেন না। তার কণ্ঠ সে আর কোনো দিন শুনতে পাবে না। এই পৃথিবীর একমাত্র প্রিয় মানুষটিকে আর দেখতে পাবে না।

বাবা হারিয়ে গেছেন।

অতল এক খাদের মধ্যে।

অতল এক খাদ!

এলিজাবেথ রোফ শুয়েই রইল। চোখ সিলিঙের দিকে। চোখের কোণে শুকিয়ে আসা জলের দাগ। স্মৃতিচারণ করছে অতীত। এক এক করে মনে পড়ে যাচ্ছে সব।

সাত

এলিজাবেথ রোফের জন্ম দুটো ট্রাজেডির জন্ম দেয়। সাধারণ ট্রাজেডি হল ওকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় ওর মা। আর আসল ট্রাজেডি হল এলিজাবেথ মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

নয় মাস ধরে, এলিজাবেথ যখন মায়ের জরায়ুর মধ্যে একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছে, তখন সে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত শিশু যে রোফ অ্যান্ড সন্সের বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে যাচ্ছে।

স্যাম রোফের স্ত্রী, প্যাট্রিসিয়া, অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। ধন-সম্পদ আর যশের কারণে অনেক মহিলাই স্যাম রোফকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। তবে প্যাট্রিসিয়া তাকে বিয়ে করেছিলেন প্রেমে পড়েছিলেন বলে। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীকে একমুহূর্তের জন্যেও কাছে পেলেন না প্যাট্রিসিয়া। কারণ স্যাম রোফের কাছে তখন আকর্ষণ বলতে ছিল একমাত্র তার কোম্পানি। মনপ্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তিনি কোম্পানির স্বার্থে। প্যাট্রিসিয়া যখন বুঝলেন কেমন লোককে বিয়ে করেছেন তিনি, তখন অবশ্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। স্যাম তাকে একটা ভূমিকা দিলেন। প্যাট্রিসিয়া সেই ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে গেলেন। স্বামীর কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার আশা দুরাশা জেনে স্বামী যা যা করতে বললেন প্যাট্রিসিয়া যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো তাই করলেন। খুশি হলেন স্যাম রোফ। স্ত্রী হয়ে উঠলেন তার যোগ্য সেক্রেটারি। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হত। ডাক এলেই যে-কোনো সময় স্বামীর সঙ্গে তাকে উড়াল দিতে হত এক দেশ থেকে অন্য দেশে। মাত্র একদিনের নোটিশে চারশো লোকের ডিনার পার্টির ব্যবস্থা করতে হত।

আর এত কাজের চাপের মধ্যেও তাকে শরীরের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হত। কারণ স্যাম রোফের বৌকে তো আর ফুটবল হলে চলবে না। তাতে লোকে হাসবে। ক্ষুণ্ন হবে স্বামীর সম্মান। নিয়মিত ডায়েট কন্ট্রোল আর অনুশীলন তরবারির মতো ঝকঝকে করে রেখেছিল প্যাট্রিসিয়ার শরীর। তার পোশাকের ডিজাইন করতেন পৃথিবী বিখ্যাত ডিজাইনাররা। অলংকার তৈরি করতেন বিশ্বখ্যাত জিন শ্লামবারগার এবং বালসারি। রুটিন-করা এই জীবন বড় যান্ত্রিক মনে হত প্যাট্রিসিয়ার। কিন্তু যেদিন তিনি গর্ভবতী হলেন, বদলে গেল সবকিছু।

রোফ ডাইন্যাস্টির সর্বশেষ পুরুষ-উত্তরাধিকার স্যাম রোফ। প্যাট্রিসিয়া জানতেন তার স্বামী কী ব্যাকুল হয়ে আছেন একটি পুত্রসন্তানের কামনায়। আর সেজন্য স্ত্রীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে রয়েছেন। আর সেই স্বপ্নই সফল করতে যাচ্ছেন

প্যাট্রিসিয়া। তার গর্ভে বড় হয়ে উঠছে ভবিষ্যৎ রাজকুমার, যে একদিন এই বিশাল রাজ্যের রাজা হবে। যেদিন ওরা প্যাট্রিসিয়াকে ডেলিভারি-রুমে নিয়ে যাচ্ছে, স্যাম স্ত্রীর হাত চেপে ধরে গভীর আবেগ নিয়ে বললেন, 'আমার স্বপ্ন পূরণ করতে যাচ্ছ। তোমাকে ধন্যবাদ।'

রক্ত জমাট বাঁধার কারণে সন্তান জন্মাবার ত্রিশ মিনিট পর মারা গেলেন প্যাট্রিসিয়া। তবে ভাগ্য ভালো অজ্ঞান ছিলেন বলে জানতে পারেননি স্বামীর সব আশা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছেন তিনি।

স্যাম রোফ স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করার পর নজর দিলেন নবজাতক কন্যার দিকে।

এলিজাবেথ ভূমিষ্ঠ হবার এক সপ্তাহ পর ওকে বাড়ি নিয়ে আসা হল। ওর দায়িত্ব দেওয়া হল একজন ন্যানিকে। বলা উচিত এখান থেকেই এলিজাবেথের ন্যানি-পর্বের শুরু। একের-পর-এক ন্যানির হাতবদল হতে শুরু করল সে। আর এভাবেই অনাথার মতো মানুষ হতে লাগল বিশাল ধনকুবেরের একমাত্র সন্তান। প্রথম পাঁচবছর বাবার সাথে খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হল এলিজাবেথের। বাবাকে মনে হত আগন্তুকের মতো। বাড়িতে আসছেন আর চলে যাচ্ছেন। আর ওর জীবন কাটতে লাগল ওদের বিভিন্ন বাড়িতে। কখনও লং আইল্যান্ডে, কখনও বিয়ারিজে, কখনও বা সার্ডিনিয়ায়। প্রতিটি বাড়িই বিশাল আর জাঁকজমকপূর্ণ। কিন্তু নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয় এলিজাবেথের। ওর জন্মদিন আসে। বিরাট পার্টি দেয়া হয়। কিন্তু বাবাকে খুঁজে পায় না সে অপরিচিত লোকজনের ভিড়ে। রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে সে।

যত বয়স বাড়ছে, এলিজাবেথ বুঝতে পারছে স্যাম রোফের কন্যা হওয়ার অর্থ কী। বাবা ওর প্রতি উদাসীন, লক্ষ্য করে এলিজাবেথ। প্যাট্রিসিয়া স্বামীর এই ঔদাসীন্য মুখ বুজে সহ্য করলেও একটি বাচ্চামেয়ের পক্ষে ভালোবাসার এই অভাব, এই নিদারুণ নিঃসঙ্গতা সহ্য করা ভয়াবহ কষ্টের। এলিজাবেথকে হতাশা ক্রমে গ্রাস করল। বুঝতে পারল না কীভাবে এই হতাশা থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। শেষপর্যন্ত নিজের ওপর দোষ চাপাতে লাগল ও। ভাবল আসলে ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতাই ওর নেই। কিন্তু মন কি সহজে মানে?

বাবাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাল এলিজাবেথ। একটু বড় হওয়ার পর যখন স্কুলে ভর্তি হল, বাপের জন্য খেলনা বানাল সে, ছবি আঁকল। ছবিগুলো আগলে রাখল মহামূল্যবান সম্পদের মতো। তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষায় থাকল কবে বাবা বাড়ি ফিরবেন। কল্পনায় দেখল বাবা বাড়ি ফিরেছেন। সে তার অমূল্য রত্নগুলো তাঁকে উপহার দিয়েছে। বাবা খুব অবাক হয়ে বলছেন, 'খুব সুন্দর হয়েছে তো ছবিগুলো। খেলনাগুলোও কত চমৎকার। এলিজাবেথ, সোনা, তুমি ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে তো!'

যখন স্যাম বাড়ি ফিরলেন, অনেক আগ্রহ নিয়ে এলিজাবেথ তার ভালোবাসার নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরল বাবার চোখের সামনে। স্যাম অন্যমনস্কের মতো ছবিগুলো দেখলেন। মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই চিত্রশিল্পী হবে না, কি বলো?' এলিজাবেথের মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল। বিষণ্ন হয়ে গেল চেহারা। স্যাম কন্যার বিষণ্নতাটুকু খেয়ালই করলেন না। তিনি ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অফিসিয়াল কাগজপত্র নিয়ে।

মাঝরাতে মাঝে মাঝে এলিজাবেথের ঘুম ভেঙে যায়। ওদের বিকমেন পেন্থ হাউসের সিঁড়ি ভেঙে দীর্ঘ হলওয়ে পার হয়ে ঢুকে পড়ে বাবার স্টাডি রুমে। খালি ঘরটায় ঢোকার সময় মনে হয় যেন কোনো পবিত্র জায়গায় ঢুকছে। এটা তার বাবার ঘর! বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় এলিজাবেথ। এখানে বসে বাবা কাজ করেন, কাগজপত্র সই করেন, গোটা পৃথিবী পরিচালনা করেন। বাবার ডেস্কের দিকে ভীরু পায়ে এগোয় সে। চামড়ার গদিঅলা চেয়ারে বসলে মনে হয় যেন বাবার ছোঁয়া পাচ্ছে সে শরীরে। যেন তিনি ওর সঙ্গে বসে আছেন, ওর একটা অংশ হয়ে গেছেন। মনে-মনে বাবার সঙ্গে কথা বলে এলিজাবেথ। তার সব কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে বাবা শোনেন। আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এমনি এক রাতে এলিজাবেথ অন্ধকারে তার চেয়ারে বসে আছে, হঠাৎ জ্বলে উঠল ঘরের বাতি। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন স্যাম রোফ। পাতলা নাইট গাউন গায়ে কন্যার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি। 'একা একা অন্ধকারে বসে কী করছ, এলিজাবেথ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

লজ্জায় এবং ধরাপড়ার ভয়ে মুখে কোনো কথা জোগাল না এলিজাবেথের। স্যাম রোফ মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন। ওপরে উঠে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সেদিন সারারাত জেগে রইল এলিজাবেথ। ঘুম এল না কিছুতেই। বাবা ওকে কোলে করে হাঁটছেন, বারবার এই দৃশ্যটাই ভেসে উঠল চোখের সামনে।

তারপর থেকে সে প্রতি রাতে নিচে যেতে শুরু করল। বসে রইল অফিসে। ব্যাকুল হয়ে রইল বাবার প্রতীক্ষায়। বাবা আসবেন। ওকে আবার কোলে তুলে নিয়ে যাবেন উপরে। কিন্তু ওর প্রতীক্ষার প্রহর আর শেষ হল না। সেই মধুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল না আর কোনোদিন।

এলিজাবেথের মাকে নিয়ে কেউ কখনও ওর সঙ্গে কথা বলেনি। তবে রিসেপশন হলে প্যাট্রিসিয়া রোফের পূর্ণদৈর্ঘ্য চমৎকার একটি পোর্ট্রেট ঝোলানো রয়েছে। ওটার দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এলিজাবেথ। তারপর আয়নায় দেখে নিজেকে। কুৎসিত! ওরা এলিজাবেথের দাঁতে ক্যাপ পরিয়ে দিয়েছে। দেখতে ডাইনির মতো লাগে। আমার বাবা যে আমার মতো কুৎসিত মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাবেন না সেটাই স্বাভাবিক : ভাবে সে।

তারপর থেকে স্বভাব পাল্টে গেল এলিজাবেথের। আগে খেতেই চাইত না। হঠাৎ করেই প্রচুর খেতে শুরু করল। গোগ্রাসে গিলতে লাগল সবকিছু। এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ও। মোটা হবার সঙ্গে সঙ্গে ওজনও বাড়াতে হবে। মায়ের মতো সুন্দরী না হলে কেউ ওকে ভালোবাসবে না, ধারণা হয়েছে তার।

বারো বছর বয়সে এলিজাবেথকে ম্যানহাটানের ইস্ট সাইডের অত্যন্ত দামি একটি স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হল। সে স্কুলে যায় শোফার-চালিত রোলস রয়েসে, হেঁটে ক্লাসে ঢোকে এবং চুপচাপ বসে থাকে। কেউ ওর সঙ্গে কথা বলে না, পাত্তাও দেয় না। শিক্ষক কোনো প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারে না এলিজাবেথ। সে নিজে থেকে কোনো প্রশ্নের জবাবও দিতে যায় না। শিক্ষকরাও ওকে অবহেলা করতে শুরু করলেন। এলিজাবেথকে নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয় এবং সবাই একমত হন বখে-যাওয়া এলিজাবেথ রোফের মতো এরকম গাধা এবং অহংকারী মেয়ে তারা দ্বিতীয়টি দেখেননি। বছর শেষে হেডমিস্ট্রেসের কাছে এলিজাবেথের শিক্ষক তার রিপোর্ট লিখলেন :

এলিজাবেথের কোনো উন্নতি আমরা করতে পারিনি। সে তার ক্লাসমেটদের সাথে মেশে না। দলবদ্ধ কোনো কর্মকাণ্ডে কখনোই তাকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। স্কুলে তার কোনো বন্ধু নেই। তার পরীক্ষার ফলাফলও সন্তোষজনক নয়। তবে এটা বলা মুশকিল যে রেজাল্ট ভালো করার জন্য তার চেষ্টা নেই, নাকি অ্যাসাইনমেন্ট করার ক্ষমতাই তার নেই। সে দুর্বিনীত এবং কল্পনাপ্রবণ। তার বাবা এ স্কুলের অন্যতম পরিচালক না হলে আমি এলিজাবেথকে বহিষ্কার করার জন্য জোর সুপারিশ করতাম।

তবে বাস্তবের সঙ্গে এ রিপোর্টের আকাশ-পাতাল ফারাক। এলিজাবেথের কোনো বন্ধু নেই, কারণ সে বন্ধুত্ব করতে ভয় পায়। তার ধারণা ওরা জেনে যাবে এলিজাবেথ মূল্যহীন একটা মেয়ে যাকে কেউ ভালোবাসে না। সে একটা অপদার্থ। সে দুর্বিনীত নয়, অসম্ভব রকমের লাজুক। বাবার পৃথিবীতে বাস করার যোগ্যতা তার নেই, অনুভব করে এলিজাবেথ। তার মনে হয় কোথাও থাকার যোগ্যতা সে রাখে না। তাকে রোলস রয়েসে করে স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ভেতরে ভেতরে লজ্জায় মরে যায় এলিজাবেথ। তার মনে হয় এসব প্রাচুর্য ভোগ করার অধিকার তার নেই। ক্লাসে শিক্ষকরা যেসব প্রশ্ন করেন, সমস্ত প্রশ্নের জবাব জানা আছে এলিজাবেথের। কিন্তু জবাব দিতে ভয় পায়। সে বই পড়তে ভালোবাসে। রাত জেগে বই পড়ে এলিজাবেথ। বুভুক্ষের মতো গেলে।

এলিজাবেথ দিবাস্বপ্ন দেখে। ফ্যান্টাসির রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। কল্পনা করে বাবার সঙ্গে প্যারিসে গেছে সে, ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বসে যাচ্ছে দুজনে। বাবা তাকে তার অফিসে নিয়ে গেছেন। সেইন্ট প্যাট্রিকের ক্যাথেড্রালের মতো প্রকাণ্ড অফিসকক্ষ। লোকজন বাবার কাছে আসছে তাঁকে দিয়ে বিভিন্ন কাগজে দস্তখত করাতে। বাবা তখন বলছেন, 'তোমরা দেখতে পাচ্ছ না আমি এখন ব্যস্ত আছি? আমি আমার মেয়ে এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলছি।'

এলিজাবেথের কল্পনার ডানা মেলে যায় সুইজারল্যান্ডে। স্কি করছে বাবার সঙ্গে, পাশাপাশি একটা খাড়া ঢাল বেয়ে নামছে, কানের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে হিম বাতাস। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন বাবা। মচকে গেছে পা। এলিজাবেথ বলল, 'ভয় নেই,

বাবা! আমি তোমাকে দেখছি।' সে স্কি করে হাসপাতালে গিয়ে বলল, 'জলদি, আমার বাবা ব্যথা পেয়েছেন। সাথে সাথে কয়েকজন সাদা-জ্যাকেট-পরা লোক ঝকঝকে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলিজাবেথের বাবাকে তুলে আনতে গেল। এলিজাবেথ হাসপাতালে তার বাবার বিছানার পাশে বসেছে, তাঁর মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে । সম্ভবত পায়ে নয়, হাতে ব্যথা পেয়েছেন তিনি। এমন সময় তার মা কীভাবে যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাবা বললেন, 'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, প্যাট্রিসিয়া। আমি আর এলিজাবেথ এখন কথা বলছি।'

অথবা তারা সার্ডিনিয়ার চমৎকার ভিলায় যাবে। চাকরবাকরদের সবাইকে ছুটি দিয়ে দেয়া হবে। এলিজাবেথ তার বাবার জন্য রান্না করবে। বাবা খেতে বসে প্রতিদিন বলবেন, তুমি তোমার মায়ের চেয়েও ভালো রান্না করো, এলিজাবেথ।'

স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটে সবসময় একইভাবে। ডোর-বেল বেজে ওঠে, বাবার চেয়েও লম্বা এক লোক ঘরে ঢুকে এলিজাবেথকে কাতর আর্জি জানায় তাকে বিয়ে করার জন্য। বাবা তখন এলিজাবেথকে মিনতি করে বলেন, 'প্লিজ এলিজাবেথ, আমাকে ছেড়ে যাস নে। তোকে আমার বড় দরকার মা।'

এলিজাবেথ বাবাকে ছেড়ে যায় না।

বাবার মুখে হাসি ফোটে। আর সেই হাসি দেখে এলিজাবেথের বুকের ভেতরটা কী যে টলমল করে! কী যে টলমল করে!

এলিজাবেথ এ-পর্যন্ত যতগুলো বাড়িতে তার শৈশব কাটিয়েছে এর মধ্যে সার্ডিনিয়ার বাড়িটি ওর সবচেয়ে প্রিয়। শুধু বড় বলেই নয়, বাড়িটিকে আসলে ওর বন্ধুর মতোই মনে হয়। সার্ডিনিয়া দ্বীপটাও ভারি সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা। নিচে সমুদ্র। চারপাশে জলপাইয়ের বাগান। পাহাড় থেকে কোনো রহস্যময় কারণে ভেসে আসে অপার্থিব সংগীত। মুগ্ধ হয়ে দু'কান ভরে পাহাড়ের সেই গান শোনে এলিজাবেথ।

সার্ডিনিয়ার পাথরের তৈরি বিশাল বাড়িটার অনেকগুলো ঘর। তবে এলিজাবেথের সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে টাওয়ার-রুম। স্যাম রোফ এটাকে তার স্টাডি–রুম হিসেবে ব্যবহার করেন। টাওয়ার-রুমের চারদিকে বিশাল সব শোকেস ভর্তি কেবল বই আর বই। আর সারাবিশ্বের মানচিত্র টাঙানো দেয়ালে। এই বইগুলো এলিজাবেথকে মোটেও আকর্ষণ করে না। যত রাজ্যের ওষুধপত্রের ওপর ঢাউস ঢাউস বই। আর আছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এবং আন্তর্জাতিক আইনের ওপর দুর্বোধ্য যতসব পুস্তিকা। সবগুলোই বিরক্তিকর। এগুলোর মধ্যে যে বইগুলো অত্যন্ত দামি এবং দুষ্প্রাপ্য সেগুলো গ্লাস-ঘেরা শোকেসে রাখা। এগুলোর কিছু আবার ল্যাটিন ভাষায় লেখা। এলিজাবেথ ল্যাটিন শেখে।

একদিন স্রেফ কৌতূহলের বশে ও একটা বই টেনে নিল। বইটা বের করতেই আরেকটা ভল্যুম চোখে পড়ল। এই বইটার আড়ালে ছিল। এলিজাবেথ ওটা বের

করল। মোটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো। কোনো শিরোনাম নেই। কৌতূহল হল এলিজাবেথের। বইটা খুলল। আর তারপরই সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীর দ্বার খুলে গেল ওর সামনে।

বইটা এলিজাবেথের প্রপিতামহ স্যামুয়েল রোফের। বইয়ের কোথাও সাল-তারিখ উল্লেখ নেই। কিন্তু বইয়ের চেহারা দেখে এলিজাবেথের মনে হল এটার বয়স কম করে হলেও একশো বছর হবে। বেশিরভাগ কাগজ জীর্ণ হয়ে গেছে। অনেকগুলোর রঙ হলদে। এই হলদে কাগজের মধ্যে কী বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তা জানা ছিল না এলিজাবেথের। তার প্রপিতামহ স্যামুয়েল রোফ এবং পিতামহী টেরেনিয়ার ছবি সে বহুবার দেখেছে নিচতলার হলওয়েতে টাঙানো বিশাল পেইন্টিং-এ। স্যামুয়েল রোফ দেখতে সুন্দর নন, কিন্তু মুখ দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে শক্তির প্রাচুর্য। প্রপিতামহের চুল সুন্দর, চোয়াল স্লাভিকদের মতো, উজ্জ্বল নীল চোখ। আর প্রপিতামহী টেরেনিয়া অসাধারণ সুন্দরী এক মহিলা। ঘন কালো চুল, আশ্চর্য সুন্দর গায়ের রঙ, চোখ যেন দু-টুকরো কয়লা। এই দুজনের ছবি এতদিন কোনো আবেদন সৃষ্টি করেনি এলিজাবেথের মনে। এমনকি সে তেমন কোনো কৌতূহলও অনুভব করেনি ওঁদের সম্পর্কে।

কিন্তু এখন, এই টাওয়ার রুমে, বইটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু আমূল বদলে যেতে লাগল। পেইন্টিং-এর নিষ্প্রাণ ছবিদুটো জ্যান্ত হয়ে উঠল। এলিজাবেথের মনে হল সে যেন ফিরে গেছে ১৮৫৩ সালের সেই ক্রাকোভ শহরের বন্দিশালায় স্যামুয়েল আর টেরেনিয়ার সাথে। বইয়ের যত গভীরে ও যেতে লাগল ততই স্যামুয়েল রোফের গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর জীবনের সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল এলিজাবেথের। এলিজাবেথ জানতে পারল তার প্রপিতামহ ছিলেন দুর্দান্ত দুঃসাহসী এক মানুষ—প্রেমিক পুরুষ এবং একজন খুনি।

আট

স্যামুয়েল রোফের ছেলেবেলা।

আঠারোশো পঞ্চাশ সাল। পোল্যান্ডের ক্রাকোভ শহর। সারাদেশে চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ক্যাম্পগুলোতে আটক রাখা হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের।

ক্রাকোভ শহরের শেষপ্রান্তে একটি ক্যাম্পের মাটির নিচে ছোট্ট একটা কাঠের ভাঁড়ারঘরে লুকিয়ে আছে পাঁচবছরের স্যামুয়েল। ক্যাম্পের চারদিক পাঁচিল-ঘেরা। মানুষের হিংস্র চিৎকার। তীব্র আর্তনাদ। মরণ-কান্না ভেসে আসছে বাইরে থেকে। স্যামুয়েল কাঁপছে থরথর করে। অনেকক্ষণ ধরে চলল দাঙ্গা। পুলিশ আসার পর পালিয়ে গেল দাঙ্গাবাজরা। একসময় নিথর হয়ে গেল ক্যাম্প। এখন শুধু হতভাগ্যদের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

স্যামুয়েল লুকানো জায়গা থেকে চোরের মতো বেরিয়ে এল। নেমে পড়ল রাস্তায়। ব্যাকুল চোখে মাকে খুঁজছে। চারিদিকে দাউদাউ আগুন জ্বলছে। স্যামুয়েলের মনে হল সারা পৃথিবী বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। পুরো আকাশ টকটকে লাল। ঘন কালো ধোঁয়া সাপের মতো মোচড় খেতে-খেতে উপরে উঠছে সবখান থেকে। মানুষ পাগলের মতো খুঁজছে তাদের আত্মীয়স্বজনকে। বাঁচাতে চাইছে বাড়িঘর, দোকানপাট। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিচ্ছে সবকিছু।

ঊনবিংশ শতাব্দির সেই মধ্যভাগেও ক্রাকোভ শহরে দমকল বাহিনী ছিল। কিন্তু এই দমকল বাহিনী এদের, এই ইহুদিদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পাঁচিল-ঘেরা এই বন্দিনিবাসে যে যেভাবে পারছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। স্যামুয়েল ভীতচোখে চারিদিকে চাইল। সবখানে মৃত্যু। লাশ। জখম হওয়া মানুষের বিকৃত শরীর। নগ্ন ধর্ষিতা মহিলারা এখানে-সেখানে পড়ে আছে। বাচ্চারা কাঁদছে। ওদের ক্ষত থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। সাহায্যের জন্য গুঙিয়ে চলেছে।

স্যামুয়েল দেখতে পেল ওর মাকে। রাস্তার একধারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। এখনো জ্ঞান হারায়নি। মুখ রক্তে মাখামাখি। ছুটে গেল স্যামুয়েল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মায়ের পাশে। বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছে দমাদম। মা! মাগো! আকুল গলায় ডাকল স্যামুয়েল।

চোখ মেলে চাইল মা। দেখল সন্তানকে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। কী যেন বলতে চাইছে। স্যামুয়েল ছোট হলেও বুঝতে পারছে মারা যাচ্ছে ওর মা। ওর অবুঝ শিশুমন তবুও বাঁচাতে চাইছে মাকে। কিন্তু কেমন করে বাঁচাবে জানে না স্যামুয়েল। হাউমাউ করে কাঁদছে। মায়ের মুখ থেকে রক্তটুকু মুছে দিল সন্তান। কিছুক্ষণ পরে স্যামুয়েলকে এতিম করে চলে গেল মা।

মাকে কবর দেয়া হল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল স্যামুয়েল। চোখ ফেটে আবারও কান্না এল ওর। কাঁদতে কাঁদতেই চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল ও। মাকে বাঁচাতে পারেনি সে সুচিকিৎসার অভাবে। তাই ডাক্তার হতে হবে ওকে। যে-কোনোভাবেই হোক ডাক্তার ও হবেই। তারপর কাউকে এভাবে বিনা-চিকিৎসায় মরতে দেবে না।

তিন ঘরের ছোট্ট একটা কাঠের বাড়িতে আর দুটি পরিবারের সঙ্গে থাকে রোফরা। বাবা আর খালা র‍্যাচেলের সঙ্গে স্যামুয়েল ছোট্ট একটা ঘরে থাকে। জন্ম হবার পর থেকে স্যামুয়েল কখনো একা থাকেনি। নির্জনতা, নীরবতা, একাকিত্ব কী জিনিস স্যামুয়েল তা জানেই না। সবসময়ই তাকে একটা হৈ-হল্লার পরিবেশের মাঝে কাটাতে হয়।

ক্যাম্পের চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঢোকা আর বের হবার একটাই পথ। সূর্য ওঠার সময় খোলা হয় গেট, আর সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় কপাট। বিশাল এক লোহার তালা ঝুলিয়ে দিয়ে দুইজন সেন্ট্রি পালা করে পাহারা দেয়।

ক্যাম্পের বাসিন্দারা শুধু ব্যবসাবাণিজ্যের কারণে শহরের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু সূর্য ডোববার আগে, যত কাজই থাকুক, তাকে ফিরে আসতে হবেই। দেরি করে কেউ ফিরলে তার কপালে জোটে কঠোর শাস্তি, কখনো মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। ক্যাম্পের ইহুদিদের সরকারি চাকরি করার নিয়ম নেই। কঠোর বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ তাদের জীবন।

স্যামুয়েলের বয়স যখন বারো, ওর সৌভাগ্য হল বাইরের জগৎটাকে দেখার। বাবা ওকে নিয়ে গেলেন শহর দেখাতে। নিষিদ্ধ এবং ভয়-ধরানো এই গেট পেরিয়ে নতুন একটা পৃথিবী দেখবে সেই আনন্দে ধড়াস ধড়াস লাফাতে লাগল হৃৎপিণ্ড।

ঠিক ভোর ছ'টায় খুলে গেল গেট। স্যামুয়েলকে নিয়ে ওর বাবা বেরিয়ে এলেন বাইরে। শহরে ঢুকতেই অচেনা এক পুলকে বারবার শিহরিত হয়ে উঠল মন। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, মানুষের চেহারা যে এত সুন্দর হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি স্যামুয়েল। বাবার হাত ধরে এগোতে এগোতে বিস্ময়ে ভরে উঠল অন্তর। স্বাধীনতার স্বাদ কী জিনিস জানা ছিল না স্যামুয়েলের। বিস্তীর্ণ আকাশ কখনো এভাবে দেখার সৌভাগ্য হয়নি ওর এর আগে। প্রতিটি বাড়ির সামনে যে এতখানি ফাঁকা জায়গা থাকতে পারে, তার সামনে আবার ছোট্ট বাগানও থাকতে পারে— কল্পনাতেও আসেনি কখনো ওর। এখানকার মানুষরা সবাই নিশ্চই খুব বড়লোক : ভাবল স্যামুয়েল।

দোকানে দোকানে ঘুরে ফেরির মালপত্র কিনে ঠেলাগাড়ি ভর্তি হতেই শহর ছেড়ে আবার নিজেদের ঘিঞ্জি ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করল বাপ-বেটা। কিন্তু এখনই ঐ নোংরা জায়গাটায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না স্যামুয়েলের।

'আরেকটু থাকি, বাবা?' কাতর গলায় অনুরোধ করল সে।

'না না। তা সম্ভব না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমাদের এক্ষুনি ফিরতে হবে।'

সেই রাতে কুঠুরির মেঝেতে শুয়ে সারারাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারল না স্যামুয়েল। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্রাকোভ শহর। ছবির মতো বাড়ি। ফুল। সবুজ বাগান। বারবার আফসোস হল কেন ও মরতে এখানে জন্মাল? কেন ঐ সুন্দর মানুষগুলোর কোনো পরিবারে জন্ম নিল না? এই নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার তীব্র সাধ জাগল বুকের ভেতরে। খুব ইচ্ছে করল মনের কথাগুলো কাউকে খুলে বলে। কিন্তু সারা ক্যাম্পে এমন কেউ ছিল না যে এই কিশোরের মুক্তির চেতনাকে বুঝতে পারবে, অনুভব করতে পারবে তার কষ্ট।

বইটা বন্ধ করল এলিজাবেথ। রেখে দিল টেবিলের ওপর। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করল স্যামুয়েলকে, অনুভব করতে চাইল তার একাকিত্ব, উত্তেজনা এবং হতাশাকে। আর ঠিক তখনই এলিজাবেথের মনে হল ও যেন স্যামুয়েলকে বুঝতে পারছে, মনে হচ্ছে ও যেন ওর প্রপিতামহেরই একটি অংশ, স্যামুয়েল যেন তারই সত্তাকে ধারণ করে আছে। তার রক্ত ওর শরীরের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। ভাবতেই অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করল এলিজাবেথ।

এই সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেল এলিজাবেথ। বাবা আসছেন এদিকে। তাড়াতাড়ি বইটা সে ঢুকিয়ে রাখল যথাস্থানে। বাবা সেবার কয়েক দিন থাকলেন সার্ডিনিয়ার বাড়িতে। ঐ কয়দিন বইটা ধরার কোনো সুযোগই পেল না এলিজাবেথ। কিন্তু ও যখন নিউইয়র্ক ফিরে গেল, তখন যদি ওর স্যুটকেস কেউ সার্চ করত, দেখত জামা-কাপড়ের তলায় দিব্যি ভালোমানুষের মতো চুপচাপ শুয়ে আছে স্যামুয়েল রোফের আত্মজীবনী।

নয়

সার্ডিনিয়ার চমৎকার সূর্যালোকিত শীতের সকাল ছেড়ে নিউইয়র্কের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় এয়ারপোর্টে পা রেখে এলিজাবেথের মনে হল যেন সাইবেরিয়ায় এসেছে। রাস্তাঘাট বরফের চাদরে মুড়ি দেয়া। ইস্ট রিভার থেকে বয়ে আসা হিম বাতাস শরীরে ধারালো ছুরির পোঁচ বসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এলিজাবেথকে এই বৈরী আবহাওয়া স্পর্শই করল না প্রায়। ওর মন তখন পড়ে আছে পোল্যান্ডে, তার প্রপিতামহের সঙ্গে। প্রতিদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর এলিজাবেথ বাড়ি ফিরেই সোজা তার রুমে গিয়ে ঢোকে। দরজা বন্ধ করে বের করে তার অমূল্য সম্পদ। নাওয়া-খাওয়া ভুলে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে এলিজাবেথের খুব ইচ্ছে হয় বইটাকে নিয়ে ওর বাবার সঙ্গে একটু গল্প করে। কিন্তু সাহস পায় না। যদি বাবা জানতে পেরে বইটা কেড়ে নেন!

স্যামুয়েল রোফকে এলিজাবেথের বড় আপন মনে হয়। স্যামুয়েলও বড় একা ছিল। কথা বলার কোনো সাথী ছিল না। একদম আমার মতো : ভাবে এলিজাবেথ স্যামুয়েল। এলিজাবেথের সময়বয়সী ছিল বলে ও যেন শতবর্ষ আগের সেই কিশোরের সঙ্গে আরো নিবিড় হতে পারে।

স্যামুয়েল ডাক্তার হতে চেয়েছিল।

সারা ক্যাম্পের হাজার হাজার ইহুদির চিকিৎসার জন্য মাত্র তিনজন চিকিৎসক ছিলেন। আর এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে নামডাক ছিল ডা. জেনো ওয়ালের। ডা. ওয়ালের সুসজ্জিত, ঝকমকে তিনতলা বাড়িটি হতচ্ছাড়া দরিদ্র ইহুদিদের কাছে রাজপ্রাসাদের মতোই মনে হত। স্যামুয়েল কল্পনার চোখে ডাক্তারকে দেখত। ডাক্তার তার রোগীদের চিকিৎসা করছেন, সেবাযত্ন করছেন। খুব ইচ্ছে করত ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত হতে, কথা বলতে। কিন্তু ক্যাম্পের নিষিদ্ধ ঐ গেট পেরিয়ে প্রাসাদের ভেতর যাওয়ার কল্পনা আকাশ-কুসুম মাত্র।

ডা. জেনো ওয়ালকে স্যামুয়েল প্রায়ই রাস্তায় দেখে। কোনো সহকর্মীর সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। একদিন স্যামুয়েল ডা. ওয়ালের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, এই সময় সদরদরজা খুলে গেল। ডা. ওয়াল বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে তার মেয়ে। স্যামুয়েলেরই বয়সী। মেয়েটিকে দেখে স্যামুয়েলের যেন দমবন্ধ হয়ে এল। মনে হল এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখেনি সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর কেন জানি

মনে হল এই মেয়েটিকে তার বধূ হিসেবে চাই-ই চাই। এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা কীভাবে ঘটবে জানে না স্যামুয়েল, কিন্তু এটুকু জানে যেভাবেই হোক এই অসম্ভবকে সম্ভব করবে সে।

মাথায় বাজ পড়ল স্যামুয়েলের। তারপর থেকে কোনো-না-কোনো ছুতোয় ওকে ডা. ওয়ালের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। আশা— এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও ঐ অসামান্যাকে একটু দেখে তৃষিত অন্তর শান্ত করবে।

একদিন বিকেলে, স্যামুয়েল ডা. ওয়ালের বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এই সময় কানে ভেসে এল পিয়ানোর সুর। কী মিষ্টি! স্যামুয়েলের কোনো সন্দেহই নেই পিয়ানোটা বাজাচ্ছে ঐ মেয়ে। ওকে একনজর দেখার প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করল সে। এদিক-ওদিক তাকাল একবার। কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না। সুরটা ভেসে আসছে দোতলা থেকে, ঠিক ওর মাথার ওপরে। স্যামুয়েল কয়েক পা পিছু হটল। দেয়ালটা পরখ করে দেখছে। দেয়াল বেয়ে উপরে ওঠার জন্যে প্রচুর পাইপ দেখতে পেল ও। একমুহূর্ত দ্বিধা না করে পাইপ বেয়ে সোজা দেয়াল বাইতে লাগল। যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক উঁচুতে দোতলা। জানালার কাছে যখন পৌঁছল তখন মাটি থেকে ওর দূরত্ব দশ ফুটেরও বেশি। নিচের দিকে তাকিয়ে ভোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। পিয়ানোর সুর এখন আরো স্পষ্ট। স্যামুয়েলের মনে হল ওর স্বপ্নকন্যা বুঝি ওর জন্যেই এই মায়াময় সুর তুলেছে। আর-একটা পাইপ ধরে জানালার নিচে চৌকাঠে দাঁড়াল স্যামুয়েল। আস্তে করে মাথা তুলল। সুসজ্জিত একটা রুম নজরে এল ওর। ওর স্বপ্নকন্যা সাদা আর সোনালি রঙ্ করা একটা পিয়ানোর সামনে বসে আছে; বাজাচ্ছে। ওর পেছনে একটা আর্ম-চেয়ারে বসে ডা. ওয়াল বই পড়ছেন। স্যামুয়েল দ্বিতীয়বার ডা. ওয়ালের দিকে ফিরেও তাকাল না। অনিমেষ দৃষ্টিতে ও শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যটি দেখল। এত কাছে থেকে সে কখনো তার প্রেয়সীকে এভাবে দেখেনি। রক্তে বান ডাকল স্যামুয়েলের। এই রাজকন্যার মন পেতে হলে ওকে এমন দুঃসাহসিক কোনো কাজ করতে হবে যাতে সে স্যামুয়েলের প্রেমে পড়েই। দিবাস্বপ্নে এমন বিভোর ছিল স্যামুয়েল যে হঠাৎই হাত ফস্কে গেল ওর, ধপাস করে পড়ে গেল নিচে। মুঠো যখন খুলে যাচ্ছে, চিৎকার করে উঠল স্যামুয়েল, পতনের পূর্বমুহূর্তে দেখল দুটি বিস্মিত মুখ ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ডাক্তার ওয়ালের অফিসের অপারেটিং টেবিলে জ্ঞান ফিরল স্যামুয়েলের। চারদিকে কেবিনেট, তাকগুলো অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। ডা. ওয়াল ওর নাকের নিচে একটুকরো তুলো ধরে আছেন। বিশ্রী গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে স্যামুয়েলের। ছটফট করতে করতে উঠে বসল ও।

'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে তোমার অ্যাঁ?' বললেন ডা. ওয়াল। 'আমি ভাবছিলাম তোমার ঘিলু বের করব। কিন্তু তোমার মাথায় ঘিলু বলে আদৌ কোনো পদার্থ আছে কি না রীতিমতো সন্দেহ হচ্ছে আমার। এখন বলো তো দেখি কী মতলবে তুমি আমার বাড়িতে ঢুকেছিলে?'

'কিছু না।' উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিল স্যামুয়েল।

'নাম কী তোমার?'

'স্যামুয়েল রোফ।'

ডা. ওয়াল এবার স্যামুয়েলের ডান কব্জি চেপে ধরলেন। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল স্যামুয়েল।

'হুম্‌ম্ যা ভেবেছি, তাই। শোনো হে, স্যামুয়েল, তোমার ডান কব্জিটা ভেঙে গেছে। এটা মেরামত করার ভার পুলিশের হাতে দিলে কেমন হয়?'

আঁতকে উঠল স্যামুয়েল। পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ভাবতেই গা ঠাণ্ডা হয়ে এল। লজ্জায়, শোকে একেবারে ভেঙে পড়বেন খালা। আর বাবা হয়তো ওকে মেরেই ফেলবেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে আর কেমন করে ডা. ওয়ালের মেয়ের মন জয় করার আশা করবে? একজন দাগি আসামিকে নিশ্চয়ই সে কোনোদিন ভালোবাসবে না।

হঠাৎ কব্জিতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল স্যামুয়েল। সেইসাথে আকস্মিক ঝাঁকুনির যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে গেল ওর। বিস্মিত চোখে তাকাল ডা. ওয়ালের দিকে।

'হ্যাঁ, ঠিক হয়ে গেছে,' ডা. ওয়াল বললেন, 'তোমার কব্জি জোড়া লেগেছে।' কব্জিতে একটুকরো কাঠ বসিয়ে ব্যান্ডেজ করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কাছেপিঠেই থাকো, স্যামুয়েল রোফ?'

'না, স্যার।'

'কিন্তু আমি যে তোমাকে আমার বাড়ির পাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছি?'

'জি, স্যার।'

'কেন?'

কেন? কী বলবে স্যামুয়েল? সত্যি জবাবটা দেবে? ডাক্তার যদি ওকে পাগল ভেবে হাসেন? হাসলে হাসুন, সত্যি কথাই বলবে স্যামুয়েল।

'আমি ডাক্তার হতে চাই, স্যার', ভেতর থেকে কথাটা বেরিয়ে এল ওর।

ভয়ানক বিস্মিত হলেন ডা. ওয়াল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্যামুয়েলের দিকে তাকালেন। 'এজন্যেই তুমি চোরের মতো দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠেছ?'

'জি।' কিন্তু শুধু জবাব দিয়ে চুপ থাকল না স্যামুয়েল, বাঁধ ভেঙে গেছে ওর আবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছে। গলগল করে সব কথা খুলে বলল ও। বলল রাস্তায় ওর মায়ের মৃত্যুর কথা। বাবার কথা। শোনাল ক্রাকোভ শহরে যেদিন প্রথম এসেছিল সেই অনুভূতির কথা, জানাল রাতে ক্যাম্পের পাঁচিলের মধ্যে তালাবদ্ধ অবস্থায় কী মানবেতর জীবন কাটাতে হয় ওদের। বলল ওর স্বপ্নকন্যার কথা। সব, সব কথা খুলে বলল সে অকপটে। কিছুই বাদ দিল না। নীরবে শুনে গেলেন ডা. ওয়াল। এমনকি স্যামুয়েলের নিজের কানেই তার বলা কথাগুলো হাস্যকর মনে হচ্ছিল। গল্প শেষ করে ও ফিসফিস করে বলল, 'স্যার, আমি... আমি দুঃখিত।'

ডা. ওয়াল অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন স্যামুয়েলের দিকে। তারপর বললেন, 'স্যামুয়েল, আমিও দুঃখিত। তোমার জন্যে, আমার জন্যে, আমাদের সবার জন্যে। আসলে প্রতিটি মানুষই বন্দি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল একজন মানুষের হাতে আরেকজন মানুষের বন্দিত্ব।'

কঠিন ঠেকল কথাটা স্যামুয়েলের কাছে। বলল, 'আমি স্যার আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারিনি!'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। 'একদিন বুঝতে পারবে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি চেয়ার ছেড়ে, এগিয়ে গেলেন ডেস্কের দিকে। একটা পাইপ তুলে নিলেন হাতে, সযত্নে তামাক ভরতে ভরতে বললেন : 'স্যামুয়েল রোফ, আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আজকের দিনটা তোমার জন্যে অশুভ।'

তামাকে আগুন জ্বাললেন ডা. ওয়াল। লম্বা একটা টান দিলেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফিরলেন স্যামুয়েলের দিকে। 'দিনটা অশুভ এজন্যে নয় যে তোমার হাত ভেঙেছে। ওটা এমন কোনো ব্যাপার না। ভালো হয়ে যাবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই। কিন্তু আমি এমন কিছু কথা এখন বলব যা তোমার মনের মধ্যে এমন ক্ষত সৃষ্টি করবে যা শুকোতে অনেক সময় লাগবে, আবার নাও শুকোতে পারে।'

স্যামুয়েল তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। ডা. ওয়াল ওর পাশে চলে এলেন। খুব নরম সুরে বললেন, 'পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কোনো স্বপ্ন থাকে না। কিন্তু তোমার দু-দুটো স্বপ্ন আছে। আমি তোমার দুটো স্বপ্নকেই ভেঙে দিতে যাচ্ছি, স্যামুয়েল রোফ।'

'আমি ঠিক—'

'আমার কথা মন দিয়ে শোনো, স্যামুয়েল। সব বুঝতে পারবে। আমাদের সমাজে কখনই তুমি ডাক্তার হতে পারবে না। এই বন্দিশালায় মাত্র তিনজন ডাক্তারকে প্র্যাকটিস করার অনুমতি দেয়া হয়। আমার জানা মতে এখনো জনা বারো দক্ষ ডাক্তার রয়েছেন এখানে। ওরা অপেক্ষা করছেন কবে আমরা মারা যাব কিংবা অবসর নেব। সুতরাং তোমার ডাক্তার হবার কোনো সুযোগই নেই। কখনোই এই সুযোগ তুমি পাবে না। কারণ তুমি ভুল সময়ে ভুল জায়গায় জন্ম নিয়েছ। আমার কথা বুঝতে পারছ, স্যামুয়েল?'

ঢোক গিলল স্যামুয়েল। 'জি, স্যার।'

আবার কথা শুরু করতে গিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন ডা. ওয়াল, তারপর বললেন, 'আর তোমার দ্বিতীয় স্বপ্ন সম্পর্কেও আমাকে একই কথা বলতে হচ্ছে। আমার মেয়ে টেরেনিয়াকে বিয়ে করার কোনো সম্ভাবনাই তোমার নেই।'

'কেন, স্যার?' জানতে চাইল স্যামুয়েল।

'কেন? একই কারণে; যে কারণে তুমি ডাক্তার হতে পারবে না। পৃথিবীতে মানুষকে অনেক সামাজিক নিয়মকানুন, মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে বাস করতে হয়। আমার মেয়ের আমি বিয়ে দেব ওর সমকক্ষ কারো সঙ্গে, যার পক্ষে সম্ভব হবে ওর

সমস্ত সাধ-আহ্লাদ পূরণ করার। হতে পারে সে একজন ডাক্তার, আইনজীবী বা সমাজের উচ্চপদস্থ কেউ। সুতরাং তুমি ওর কথা ভুলে যাও।'

'কিন্তু—'

স্যামুয়েলকে ঘর ছেড়ে চলে যাবার ইঙ্গিত করে ডাক্তার বললেন, 'অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কব্জিটা কাউকে দেখাবে। আর ব্যান্ডেজটা পরিষ্কার রেখো।'

'ঠিক আছে, স্যার।' বলল স্যামুয়েল। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ডা. ওয়াল।'

ডা. ওয়াল বললেন, 'গুডবাই, স্যামুয়েল রোফ।'

স্যামুয়েল আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ও চলে যাওয়ার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডা. ওয়াল। কাজে মন দিলেন।

পরদিন বিকেলেই আবার স্যামুয়েলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ডা. ওয়ালের বাসার সামনে। দরজার বেল টিপল সে। জানালা দিয়ে স্যামুয়েলকে দেখতে পেলেন ডা. ওয়াল। একবার ভাবলেন তাড়িয়ে দেবেন, পরে আবার কী ভেবে কাজের মেয়েকে বললেন, 'যাও, ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

ঘরের ভেতর ঢুকতে-না-ঢুকতেই প্রশ্নের মুখোমুখি হল স্যামুয়েল। 'কী চাই?'

জবাব দেয়ার সময় গলা একটুও কাঁপল না স্যামুয়েলের। 'ডা. ওয়াল, আপনার সঙ্গে কোনো বিতর্ক করতে আমি আসিনি। আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই। ডাক্তার হতে না পারলেও আমাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করতেই হবে।'

ডাক্তার ওর দৃঢ়তায় আশ্চর্য হলেন না। সোনালি চুলের বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটিকে সেদিনই তিনি চিনেছেন। বুঝেছেন সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র সে নয়। কোনো কথা না বলে তিনি মাথা দোলালেন।

সেই শুরু।

তারপর থেকে সপ্তাহে দুই-তিন দিন করে ডাক্তারের বাড়িতে আসতে লাগল স্যামুয়েল। ফাইফরমায়েশ খাটে। অসুস্থ মানুষের বাড়িতে যায়, অসুখের খবরাখবর নেয়। বিনিময়ে ডাক্তার ওয়াল ওকে রোগীর চিকিৎসা করার সময় পাশে থাকতে দেন, ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেন, স্যামুয়েল ডাক্তার কীভাবে ওষুধ তৈরি করছেন তা গভীর মনোযোগে দেখে। যে-কোনো জিনিস একবার দেখেই সহজে শিখে ফেলা এবং মনে রাখার অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে স্যামুয়েলের। সহজাত একটা প্রতিভা। ওর মেধার পরিচয় পেয়ে ডাক্তার ওকে লেখাপড়ার সুযোগও করে দিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে একধরনের পাপবোধে ভোগেন তিনি। তিনি ওকে উৎসাহ জোগাচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন এমন কিছু হবার জন্য যা সে কখনই হতে পারবে না, অথচ ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিতেও সায় দিচ্ছে না মন।

দুর্ঘটনা নাকি দৈবচক্র কে জানে, স্যামুয়েলের সঙ্গে টেরেনিয়ার প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতে লাগল। হয়তো কখনও সে ল্যাবরেটরির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কখনও

বাইরে বেরুচ্ছে, এই সময় চোখাচোখি হয় স্যামুয়েলের সঙ্গে। হার্টবিট বেড়ে যায় স্যামুয়েলের। মনে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। একদিন রান্নাঘরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে টেরেনিয়ার ওপর পড়তে যাচ্ছিল স্যামুয়েল। নিজেকে কোনোমতে সামলাল। টেরেনিয়া চোখ তুলে তাকাল, গভীর শান্ত চোখদুটো স্থাপন করল স্যামুয়েলের চোখে। স্যামুয়েলের মনে হল ওর চোখে কী যেন খুঁজছে টেরেনিয়া। তারপর হালকাভাবে মাথা নাড়িয়ে চলে গেল।

স্যামুয়েল ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। টেরেনিয়া তার দিকে তাকিয়েছে! অবশেষে সে তার দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে! এই তো শুরু। এরপরের ঘটনাগুলো নিজে থেকেই ঘটতে শুরু করবে : ভাবল স্যামুয়েল। টেরেনিয়া যে ওর প্রেমে পড়বে এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই স্যামুয়েলের। ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল স্যামুয়েল। আগে শুধু নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত ও। এখন টেরেনিয়াকে ছাড়া কোনোকিছুই ভাবতে পারছে না। যেভাবে হোক ওকে এই বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেতে হবে। যে-কোনো মূল্যে হোক ওকে সাফল্য অর্জন করতেই হবে। মানুষের মতো মানুষ হতে হবে তাকে। টেরেনিয়ার উপযুক্ত হতে হবে।

কিন্তু এই সাফল্য অর্জন তখন পর্যন্ত স্যামুয়েলের কাছে আকাশ-কুসুম কল্পনাই ছিল।

বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে এলিজাবেথ। সকালে ঘুম ভাঙার পর সে সযত্নে বইটা লুকিয়ে রাখে। তারপর প্রস্তুত হয় স্কুলে যাওয়ার জন্য। স্যামুয়েল সারাক্ষণ ওর মন জুড়ে থাকে। কীভাবে ও টেরেনিয়াকে বিয়ে করল? ও কি বন্দিশালা থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল? ওর স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছিল? বইটা ওকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে যে স্যামুয়েল ছাড়া সে যেন অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। মন সবসময় পড়ে থাকে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

এলিজাবেথ ব্যালে নাচ শেখে। ওর ফিগার ভালো হলেও শরীরে প্রচুর মেদ। হতাশ হয় এলিজাবেথ। শরীরে এত মেদ নিয়ে কি কেউ কখনও ব্যালে শিল্পী হতে পারে?

এলিজাবেথ তার চতুর্দশ জন্মবার্ষিকী পালন করার কয়েক দিন পর ওদের ব্যালে-শিক্ষক মাদাম নেটরোভা ঘোষণা করলেন আর দুই সপ্তাহ পর তার ক্লাসের সকল ছাত্রীকে বার্ষিক নৃত্য-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ছাত্রীদের তাদের বাবামাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার অনুমতিও দেয়া হল।

এলিজাবেথের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। শত শত লোকের সামনে, অডিটরিয়ামে নাচার কথা ভাবতেই বুক শুকিয়ে এল। ইশ! প্রতিযোগিতার আগে যদি ও অ্যাক্সিডেন্ট করে পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে থাকত তাহলে কী মজাই না হত! কল্পনায় দেখল একটি বাচ্চা রাস্তা পার হচ্ছে। একটা গাড়ি ছুটে আসছে তার দিকে।

এলিজাবেথ দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটিকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিল, বাঁচিয়ে দিল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। কিন্তু নিজে রক্ষা পেল না। অ্যাক্সিডেন্ট করল ও। সেদিন সন্ধ্যায় ঘরভর্তি দর্শকের সামনে মাদাম নেটরোভা দুঃখিত গলায় বললেন : ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ এলিজাবেথ রোফ হঠাৎ করে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়েছে। ফলে আজকের সন্ধ্যার নৃত্য-অনুষ্ঠানে সে হাজির থাকতে পারছে না বলে আমরা দুঃখিত।

আবার যদি এমন হত— সিঁড়িতে ভুলে ওদের কোনো কাজের মেয়ে একটুকরো সাবান রেখে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় অসাবধানে পা পড়ল গিয়ে ঐ পিচ্ছিল সাবানের টুকরোর ওপরে। সাথে সাথে ধপাস। নিতম্বের হাড় ভেঙে গেছে এলিজাবেথের। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন : ভয়ের কিছু নেই, সেরে যাবে এটা। তবে হপ্তা তিনেক সময় লাগবে।

কিন্তু কোনো কল্পনাই বাস্তবে রূপ নিল না। প্রতিযোগিতার দিন দিব্যি সুস্থ রইল এলিজাবেথ। ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওর এই বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল স্যামুয়েল রোফ। এলিজাবেথের মনে পড়ল স্যামুয়েল কী প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল কিন্তু তারপরও সাহস করে ডা. ওয়ালের বাড়িতে সে গিয়েছে। না, সে এমন কিছু করবে না, যাতে স্যামুয়েলের সম্মানহানি হয়। অগ্নিপরীক্ষায় তাকে অংশগ্রহণ করতেই হবে।

প্রতিযোগিতার কথা এলিজাবেথ বলেনি ওর বাবাকে। আগে এলিজাবেথ স্কুলের বিভিন্ন মিটিং এবং পার্টির কথা বাবাকে জানিয়েছে, বারবার বলেছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে বাবা একবারও তাদের স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে যাননি।

সন্ধ্যাবেলা এলিজাবেথ ঘর থেকে বেরুচ্ছে, এই সময় দেখা হয়ে গেল স্যাম রোফের সঙ্গে। বেশ কিছুদিন তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। এইমাত্র ফিরেছেন বাড়িতে। এলিজাবেথকে দেখে বললেন, 'গুড ইভনিং এলিজাবেথ। তুমি দেখছি এই কয়দিনে বেশ মোটা হয়ে গিয়েছ।'

এলিজাবেথ লজ্জা পেল, ফ্যাকাশে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, বাবা।' স্যাম রোফ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, পরে মন পরিবর্তন করে বললেন, 'তোমার পড়াশোনা চলছে কেমন?'

'ভালোই বাবা।'

'কোনো সমস্যা নেই তো?'

'না, বাবা।'

'বেশ বেশ।'

এইরকম গতানুগতিক সংলাপ বাবা আর মেয়ে বহুবার উচ্চারণ করেছে। যেন এ ছাড়া মেয়েকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই স্যামের আর এলিজাবেথও যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে একঘেয়ে জবাব দিতে দিতে।

কিন্তু আজ কেন জানি স্যাম রোফ মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেন জানি তার মনে হচ্ছে মেয়ের বোধহয় কোনো সমস্যা হয়েছে, কিন্তু সমস্যার কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারছে না। সমস্যাটি কী ধরতে পারছেন না স্যাম রোফ। মেয়েকে তো তিনি না-চাইতেই সব দেন, তারপরও ওর কী সমস্যা থাকতে পারে?

এলিজাবেথ কিছু বলছে না দেখে স্যাম নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, এলিজাবেথ এই সময় বলে উঠল—

'আমার— আমার ব্যালে নাচের প্রতিযোগিতা আছে আজ। আমাকে আজকে নাচতে হবে। তুমি বোধহয় এই অনুষ্ঠানে যাবে না বাবা, যাবে?'

বলেই হতভম্ব হয়ে গেল এলিজাবেথ। মুখ ফস্কে এ কী কথা বেরিয়ে গেল? বাবা ওর ব্যর্থতা দেখুক এটা সে মনেপ্রাণে চায় না। তারপরও সে কেন আগবাড়িয়ে জানতে গেল বাবা তার নাচ দেখতে যাবেন কি না। আর ও তো জানেই বাবাকে দাওয়াত দিলেও তিনি যাবেন না। তারপরও কেন বলতে গেল? নিজের ওপর খুব রাগ হল ওর, ঘুরে দাঁড়াল ও, পেছন থেকে ভেসে এল স্যাম রোফের কণ্ঠ, 'আমি যাব, এলিজাবেথ।'

ছাত্রীদের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের ভিড়ে বোঝাই হয়ে গেছে অডিটরিয়াম। স্টেজের দুইপাশে বিরাট দুটি পিয়ানো রাখা। মাদাম নেটরোভা একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এক এক করে ছাত্রীদের নাম ধরে ডাকছেন স্টেজে আসার জন্য। নাচের জন্য নির্ধারিত সময় দুই মিনিট।

সবাই ভালো নাচছে। প্রচুর করতালি পড়ছে। এদিকে স্টেজের পেছনে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে এলিজাবেথ। বাবাকে দেখতে পাচ্ছে সে এখান থেকে। দ্বিতীয় সারির মাঝখানে বসে আছেন তিনি। বাবাকে কেন দাওয়াত করতে গেল ভেবে আবার অনুতাপ হল এলিজাবেথের। ওর নিশ্চিত ধারণা ও স্টেজে উঠলেই সবাই হাসবে। ইশ! বাবা কীভাবে ওর এই অপমান সহ্য করবেন! এলিজাবেথের সান্ত্বনা একটাই, ওকে মাত্র এক মিনিট নাচতে হবে। আর দেখতে দেখতে নিশ্চয় খুব দ্রুত সময় শেষ হয়ে যাবে। হয়তো এত সংক্ষিপ্ত সময়ে ভালো করে ওর দিকে লক্ষ্যই করতে পারবে না।

এলিজাবেথ পর্দার ফাঁক দিয়ে ওর বান্ধবীদের নাচ দেখছে। মারকোভা, ম্যাক্সিমোভা, ফন্টেন একের-পর-এক ওরা স্টেজে যাচ্ছে। চমৎকার নেচে চলে আসছে। হাততালিও পাচ্ছে খুব। হঠাৎ নগ্নবাহুতে ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠল এলিজাবেথ। মাদাম নেটরোভা ফিসফিস করে বললেন, 'এর পরেই তোমার পালা, এলিজাবেথ। প্রস্তুত হও।'

এলিজাবেথ বলতে চাইল, 'জি , ম্যাডাম', কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। শুনতে পেল পিয়ানোবাদকরা পিয়ানোতে সংগীতের মূর্ছনা তুলছে। এই বাজনার

তালেই ওকে নাচতে হবে। এলিজাবেথ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। নড়তে পারছে না। মাদাম নেটরোভা কানের কাছে হিসহিস করে উঠলেন, 'যাও এলিজাবেথ, যাও।' তারপরই পিঠে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল ও। ধাক্কার চোটে খোলা স্টেজে চলে এল ও। অর্ধনগ্ন অবস্থায়, হাজার হাজার দর্শকের সামনে।

বাবার দিকে তাকাবার সাহস হল না এলিজাবেথের। ওর মন এখন শুধু চাইছে কোনোমতে নাচ শেষ করে স্টেজ ছেড়ে পালাতে। পা ফেলতে শুরু করল ও বাজনার তালে। কেউ আমাকে দেখছে না, আমি শুধু একা নাচছি : নাচতে নাচতে ভাবতে চাইল এলিজাবেথ। যখন নাচ শেষ হল, অডিয়েন্স থেকে হাততালির শব্দ ভেসে এল, এলিজাবেথ স্টেজে ঢোকার পর এই প্রথম পূর্ণদৃষ্টিতে দর্শকের দিকে চোখ মেলে চাইল। বাবাকে চোখে পড়ল ওর। হাসছেন তিনি। গর্ব আর প্রশংসা মেশানো হাসি— প্রশংসা করছেন তিনি ওকে।

হঠাৎ কী যে হয়ে গেল এলিজাবেথের মধ্যে জানে না সে, আবার নাচতে শুরু করল ও। মিউজিক থেমে গিয়েছিল ওর নাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এলিজাবেথ আবার নাচতে শুরু করবে ভাবেনি পিয়ানোবাদকরা। বিমূঢ় হয়ে গেল তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য। দ্রুত নিজেদের সামলে নিল। এলিজাবেথের নাচের তাল দ্রুত ধরে ফেলল ওরা। ব্যাকস্টেজে রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করলেন মাদাম নেটরোভা। স্টেজ থেকে চলে যাবার জন্য ওকে বারবার ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু এলিজাবেথ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাল না, নিজের মধ্যে ডুবে গেছে ও। এই নাচ কারো জন্যে নয়। ও এখন শুধু নাচছে ওর বাবার জন্যে।

'মি. রোফ, আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমাদের স্কুলে এই ধরনের বেয়াদবি কখনোই বরদাশত করা হয় না।' মাদাম নেটরোভার গলা কাঁপছে রাগে। 'আপনার মেয়ে আমাদের সবাইকে অপমানের চূড়ান্ত করেছে। তার ভাবখানা ছিল এমন যেন— যেন সে একজন স্টার।'

এলিজাবেথ মুখ নিচু করে বসে আছে। টের পেল বাবা ওর দিকে তাকালেন। কিন্তু চোখ তুলে চাইতে সাহস পেল না ও। জানে আজ সে যা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু কী করবে এলিজাবেথ? কী করার ছিল তার? নিজেকে সে সামলাতে পারেনি! শুধু বাবার জন্যে, হ্যাঁ, শুধু বাবার জন্যে সে স্টেজে এমন কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যা দিয়ে বাবাকে আকৃষ্ট করা যায়, বাবা ওর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ওর জন্যে গর্ববোধ করেন। ওকে ভালোবাসেন।

এলিজাবেথ শুনল বাবা বলছেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মাদাম নেটরোভা। এই অপরাধের জন্যে এলিজাবেথের শাস্তি হওয়া দরকার।'

মাদাম নেটরোভা এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে বিজয়িনীর হাসি হাসলেন। বললেন, 'ধন্যবাদ মি. রোফ, ওর শাস্তির ভার আমি আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম।'

এলিজাবেথকে নিয়ে ওর বাবা বেরিয়ে এলেন স্কুলের বাইরে। একটা কথাও বললেন না। এলিজাবেথের খুব ইচ্ছে করছে বাবার পা জড়িয়ে ধরে। ক্ষমা চায়। কিন্তু কী বলবে সে? সে যা করেছে তা কেন করেছে এই কথা বাবাকে সে কীভাবে বোঝাবে? এলিজাবেথের তো মনে পড়ে না জন্মের পর থেকে বাবার সাথে সে কোনোদিন ফ্রিভাবে দুটো কথা বলেছে কি না। এলিজাবেথ শুনেছে বাবা যখন রেগে যান তখন নাকি আর মানুষ থাকেন না, পশু হয়ে ওঠেন। প্রচণ্ড ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে এলিজাবেথের। বাবা কি ওকে খুব বেশি মারবেন? মাগো, জীবনে মার খায়নি ও।

বাবা ঘুরলেন এলিজাবেথের দিকে, 'এই মেয়ে, মন খারাপ করে আছে কেন? চলো। রামপেলমেয়ার থেকে চকোলেট সোডা কিনে খাই?'

কেঁপে উঠল এলিজাবেথ। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জলধারা। ফুঁপিয়ে উঠল ও। বাবাকে জড়িয়ে ধরল। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বাবা বললেন, 'মন খারাপ করার কিছু নেই রে, পাগলী মেয়ে। আমি তোর ওপর একটুও রাগ করিনি বরং খুশিই হয়েছি। তোকে এই স্কুলে আর পড়াব না আমি।'

সে রাতে উত্তেজনার চোটে এলিজাবেথের চোখে ঘুমই এল না। এত উত্তেজনা সইতে পারছে না। কারণ এটি কোনো দিবাস্বপ্ন নয়। এটা ঘটেছে। বাস্তব। চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছে বাবা আর সে রামপেলমেয়ারের টেবিলে বসে আছে। চারপাশে ভালুক, হাতি, সিংহ আর জেব্রার মূর্তি। এলিজাবেথ প্রকাণ্ড একটি ব্যানানা স্পিলেটার অর্ডার দিয়েছে। কিন্তু বাবা ওকে ঠাট্টা করছেন না। ওর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। সম্প্রতি টোকিও ঘুরে আসার গল্প করছেন। বলছেন তার হোস্ট তাকে চকোলেট-মাখানো ঘাসফড়িং আর পিঁপড়ে খেতে দিয়েছেন। বাবা একটুও মুখ বিকৃত না করে সে খাবার খেয়ে নিয়েছেন।

আইসক্রিমের পুরোটা চেটেপুটে শেষ করার পরে বাবা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওটা কেন করলে, লিজ?' এলিজাবেথ বুঝতে পারল সবকিছু এখন নষ্ট হয়ে যাবে। বাবা তাকে বকা দেবেন। বলবেন ওর কাণ্ড দেখে কতটা হতাশ হয়েছেন তিনি।

এলিজাবেথ বলল, 'আমি সবার চেয়ে ভালো করতে চেয়েছিলাম।' কথাটা বলতে পারল না 'তোমার জন্য।'

অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন বাবা, শেষে হেসে উঠলেন, 'তুই সবাইকে চমকে দিয়েছিস মেয়ে।' বাবার গলায় গর্ব।

এলিজাবেথ টের পেল তার গালে রক্ত ছুটেছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো?'

বাবার চোখে এমন দৃষ্টি কখনও দেখেনি এলিজাবেথ। 'সেরা হওয়ার জন্য? রোফরা এজন্যই আজ এ অবস্থানে পৌঁছুতে পেরেছে।' তিনি হাত বাড়িয়ে মেয়ের হাত ধরলেন।

এলিজাবেথ ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যেতে যেতে ভাবল : আমার বাবা আমাকে পছন্দ করেন, সত্যি পছন্দ করেন। এখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকব। বাবা তার সঙ্গে আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবেন। আমরা নানা বিষয় নিয়ে গল্প করব এবং বন্ধু হয়ে যাব।

দশ

পরদিন স্যাম রোফের সেক্রেটারি এলিজাবেথকে জানালেন, সুইজারল্যান্ডের এক বোর্ডিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করা হয়েছে ওকে।

নুশাতেল হ্রদের পাড়ে, সাঁতে-ব্লেইস গ্রামে মেয়েদের বোর্ডিং ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল শাঁতিউ লেমন্ড। এই বোর্ডিঙের মেয়েদের প্রায় সবাই কিশোরী। প্রায় সবারই বয়স চৌদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে। সুইজারল্যান্ডের সেরা স্কুলগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম।

কিন্তু স্কুলটা পছন্দ হল না এলিজাবেথের।

এলিজাবেথ ভয়ানক নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল। মনে হল ওকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। যেন ও বিরাট কোনো অপরাধ করেছে আর সেই অপরাধে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। অথচ কোনো অপরাধ করেনি সে। সেই দুর্লভ সন্ধ্যায় স্টেজের ওপর বিজয়ের আনন্দে নাচছিল ও। মনে হয়েছে বাবাকে আবিষ্কার করতে যাছে সে। বাবা এবং সে বন্ধু হতে যাচ্ছে। কিন্তু হল তার উল্টো। বাবা আরো দূরে চলে গেলেন।

বাবা সম্পর্কে এলিজাবেথ সব খবর পায় দৈনিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকায়। প্রায়ই পত্রিকাগুলোতে ছবিসহ বাবার খবর ছাপে : অমুক রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি আলোচনা করছেন, বোম্বেতে নতুন ফার্মাসিউটিক্যাল প্ল্যান্ট খুলছেন, পাহাড়ে চড়ছেন, ইরানের শাহের সঙ্গে ডিনার করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সবগুলো খবর পত্রিকার পাতা থেকে কেটে স্ক্র্যাপ-পেপারে যত্ন করে সেঁটে রাখে এলিজাবেথ।

এই বোর্ডিঙে এলিজাবেথ সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। বেশিরভাগ মেয়েই এখানে রুমে ডাবলিং করে, কিন্তু এলিজাবেথ একা থাকতেই ভালোবাসে। একা বসে বাবার কাছে বিশাল সব চিঠি লেখে, তারপর ছিঁড়ে ফেলে। ওর জন্মদিনে বাবার সেক্রেটারির কাছ থেকে দামি উপহার পায় এলিজাবেথ, কিন্তু তাতে একটুও খুশি হয় না মন। বরং বাবার জন্যে অন্তর আরও কাঁদে। বাবাকে এখানে আসার পর থেকে সবচেয়ে বেশি মিস করছে ও। কিন্তু হতাশ হয় না ও। অন্তত জোর করে হলেও হতাশা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে : বাবা তো আর চিরজীবনের জন্যে হারিয়ে যাননি। তাকে নিশ্চয়ই আবার একান্ত করে পাবে সেই আশ্চর্য মধুর সন্ধ্যাটির মতো। আর সেই আশায় বুক বাঁধে কিশোরী এলিজাবেথ।

এগারো

কিছুদিন পর কোম্পানির নিজস্ব লিয়ার জেট এল এলিজাবেথকে জুরিখ থেকে নিয়ে যেতে। অলবিয়া এয়ারপোর্টে ওর জন্য লিমুজিন অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে চড়ে কেন যেন হাঁটু কাঁপতে লাগল এলিজাবেথের। বারবার মনকে প্রবোধ দিল ও। কাঁদবে না সে, বাবার সামনে কিছুতেই কাঁদবে না। তাকে বুঝতে দেবে না এলিজাবেথ অন্তরের বেদনা।

লম্বা হাইওয়ে পাহাড়ের মাঝখানে পথ করে এঁকেবেঁকে চলে গেছে কোস্টা এসমেরেলডার দিকে। কোস্টা এসমেরেলডা থেকে একটা ছোট রাস্তা মোড় নিয়েছে সোজা পাহাড়চুড়োর দিকে। এই রাস্তায় আসলেই ভয়ে বুক ঢিবঢিব করে এলিজাবেথের। ভয়ানক ঢালু আর আঁকাবাঁকা এই রাস্তাটার একধারে উঁচু পর্বতমালা, অন্যধারে অতল গিরিখাদ। যেন গিলে খাবে। এ রাস্তাটা পার হবার সময় দম প্রায় বন্ধ করে রাখল এলিজাবেথ, বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই দরজা খুলে নেমে পড়ল। হাঁটার গতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে ওর, একসময় দৌড়াতে শুরু করল, যেন আর তর সইছে না। খুলে গেল সামনের দরজা। মার্গেরিটা, ওদের বাড়ির চাকরানী ওকে দেখে হাসল :

'হ্যালো, মিস এলিজাবেথ।'

'বাবা কোথায়?' জানতে চাইল এলিজাবেথ।

'জরুরি কাজে উনি অস্ট্রেলিয়া গেছেন। আপনার জন্যে খুব সুন্দর উপহার কিনে রেখেছেন। আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে মিস এলিজাবেথ।'

এলিজাবেথ সার্ডিনিয়ার বাড়িতে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কাটায় স্যামুয়েল রোফ আর টেরেনিয়ার ছবির সামনে। ছবির মানুষদুটিকে ওর জীবন্ত মনে হয়। মনে হয় ওদের সত্তা যেন অনুভব করতে পারছে অন্তরে। বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। তারপর টাওয়ার-রুমে গিয়ে বইটা নিয়ে বসে। কোত্থেকে সময় কেটে যায় টেরও পায় না। একেকটা পৃষ্ঠা বারবার পড়ে ও। প্রতিবার মনে হয় ও যেন স্যামুয়েল আর টেরেনিয়ার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে....

পরবর্তী কয়েক বছরে, পড়ে চলেছে এলিজাবেথ, ডা. ওয়ালের ল্যাবরেটরিতে নিবেদিতপ্রাণ একজন কর্মী হয়ে উঠেছিল স্যামুয়েল। ডা. ওয়ালকে সে বিভিন্ন ঔষধ মেশাতে সাহায্য করত, গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখত এগুলো কীভাবে কাজ করে। আর তার এই আগ্রহের মূলে অনুপ্রেরণা ছিল টেরেনিয়া নামের আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটি। টেরেনিয়াকে একমুহূর্ত দেখাই স্যামুয়েলের জন্য যথেষ্ট ছিল। আশ্চর্য উৎসাহ অনুভব করত ও ভেতরে-ভেতরে। দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ শিখত। টেরিনিয়াকে পাবার যোগ্যতা যে তাকে অর্জন করতেই হবে।

ডা. ওয়ালের সঙ্গে স্যামুয়েলের সম্পর্ক ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠলেও টেরেনিয়ার মায়ের ক্ষেত্রে ঘটল তার উল্টোটা। ভদ্রমহিলা ভয়ানক খচ্চর টাইপের। জিভের ডগায় প্রচণ্ড ধার। স্যামুয়েলকে দুচোখে দেখতে পারেন না তিনি। আর স্যামুয়েলও সবসময় তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

মানুষের রোগ উপশমকারী ওষুধগুলোর কার্যক্ষমতা স্যামুয়েলকে অবাক করে তোলে। ডা. ওয়ালের লাইব্রেরি গাদা-গাদা বই আর ম্যাগাজিনে ঠাসা। গভীর মনোযোগে ওগুলো পড়ে স্যামুয়েল। তত্ত্ব নিয়ে আলাপ করে ডাক্তারের সঙ্গে।

একদিন ডা. ওয়ালকে স্যামুয়েল বলল, 'স্যার, চিকিৎসাশাস্ত্রের যুক্তি থেকে আমার ধারণা জন্মেছে, প্রতিটি অসুখের কোনো-না-কোনো প্রতিকার থাকতেই হবে। সুস্থতা প্রাকৃতিক, অসুখ অপ্রাকৃতিক।'

'আসলেও তাই', বললেন ডাক্তার, 'কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ রোগী কোনো নতুন ওষুধ খেতে চায় না।'

সেই সময় সকল বিষয়ে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। নিত্যনতুন আবিষ্কার হচ্ছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর বিশ্বাস শরীরে প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে জীবাণু আক্রমণ করতে পারবে না, ফলে অসুখ হবে না। সেবা এবং ভ্যাকসিন এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। ডা. ওয়াল নিজেই একবার পরীক্ষা চালালেন। এক ডিপথেরিয়া রোগীর রক্ত নিয়ে একটা ঘোড়াকে ইনজেকশন দিলেন। কিন্তু মারা গেল ঘোড়াটা। হাল ছেড়ে দিলেন তিনি। তবে স্যামুয়েল দমল না। ওর বিশ্বাস ডাক্তার ঠিক পথেই এগোচ্ছিলেন।

'আপনার হাল ছেড়ে দেয়া একদম ঠিক হবে না', ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক করল ও, 'আমি জানি এই রাস্তায় এগোলেই আমরা সাফল্য পাব।'

ডা. ওয়াল মাথা নাড়লেন, 'তোমার বয়স কম বলেই তুমি একথা বলতে পারছ স্যামুয়েল। কিন্তু আমার মতো বয়সে কোনো ব্যাপারেই এত নিশ্চিত হয়ে কথা বলতে পারবে না। যা হয়েছে, হয়েছে। ভুলে যাও সব।'

কিন্তু স্যামুয়েল ভুলে যাবার পাত্র নয়। ও গবেষণা চালিয়ে যেতে চাইল। তার জন্য সবার আগে চাই একটা জন্তু। প্রথমে বেড়াল তারপর ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালাল ও। কিন্তু বাঁচল না একটাও। নিজের ভুল বুঝতে পারল স্যামুয়েল। বড় জন্তু ছাড়া ইনজেকশনের ডোজ কেউ সহ্য করতে পারবে না : ভাবল ও। এজন্য দরকার ঘোড়া, গরু কিংবা ভেড়া। কিন্তু এগুলো কোথায় পাবে সে? কেমন করে জোগাড় করবে? কেনার টাকা যে নেই। হতাশায় বুক মুচড়ে উঠল স্যামুয়েলের।

একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেই স্যামুয়েল দেখল ওদের বাড়ির সামনে একটা নতুন গাড়ি, তার সামনে একটা ঘোড়া। গাড়ির এককোনায় লেখা : 'রোফ অ্যান্ড সন্স'। ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না স্যামুয়েল, একছুটে ভেতরে ঢুকে বাবার কাছে জানতে চাইল ও, 'বাবা, বাইরে ঐ ঘোড়াটা কার?'

'আমাদের। কিনেছি। ফার্ড ওর নাম।' গর্বের হাসি বাবার মুখে।

ওর বাবার অনেকদিনের স্বপ্ন একটা ঘোড়া কেনার। তাতে অল্পসময়ে অনেক বেশি জায়গায় ঘুরে ঘুরে মাল বেচা যাবে। 'আমার বাবার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, এবার আমার স্বপ্ন পূরণ করবে ফার্ড।' মনে-মনে বলল স্যামুয়েল। ওর আনন্দে কাঁদতে ইচ্ছে করল।

সেই রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল স্যামুয়েল। ঘোড়াটা খুব বুড়ো। স্যামুয়েলের সন্দেহই হল এ বেচারা ওর বাবার চেয়ে আদৌ আগে চলতে পারবে কি না। কিন্তু স্যামুয়েলের কাছে ওটা কোনো ব্যাপার না। ঘোড়াটাকে সে ও ওর ল্যাবরেটরির কাজে ব্যবহার করতে পারবে সেই আনন্দেই মশগুল। তবে কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে তাকে, যাতে বাবা কিচ্ছুটি টের না পান। স্যামুয়েল আদর করে ঘোড়াটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তুমি আমার ওষুধের দোকান হতে যাচ্ছ, ফার্ড।'

আস্তাবলের এককোণে স্যামুয়েল তার নিজস্ব ল্যাবরেটরির কাজ শুরু করল।

কয়েকদিনের চেষ্টায় স্যামুয়েল তার ল্যাবরেটরিতে একটা ঝোলভর্তি পাত্রে ডিপথেরিয়ার জীবাণু সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। ঝোলের ওপর আস্তরণ পরার পর সেখান থেকে কিছুটা সরিয়ে নিল অন্য একটা পাত্রে। ঝোলের জীবাণুগুলো দুর্বল করল প্রথমে পানি মিশিয়ে পাতলা করে তারপর আগুনে জ্বাল দিয়ে। সিরিঞ্জে ঝোল ঢুকিয়ে ও ফার্ডকে ইনজেকশন দিতে এল।

ফার্ডের কাঁধের নরম চামড়ায় সুচ ঢুকিয়ে স্যামুয়েল বলল, 'ফার্ড, মনে আছে আমার কথা? আজ তোমার জীবনের সেই স্মরণীয় দিন।'

ফার্ড বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকাল, তারপর ছরছর করে প্রস্রাব করে দিল।

স্যামুয়েল হিসেব করে দেখল ফার্ডের শরীরে জীবাণু বিকশিত হতে বাহাত্তর ঘণ্টা সময় লাগবে। সেই সময় পার হয়ে গেলে আর-একটা বড় ডোজ দিতে হবে ওকে। তারপর আর-একটা। অ্যান্টিবডি তত্ত্ব ঠিক হলে প্রতি ডোজের পর রক্তের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়তে থাকবে। সেই রক্ত থেকে স্যামুয়েল পেয়ে যাবে ভ্যাকসিন। এরপর পরীক্ষা চালাতে হবে মানুষের শরীরে।

পরের দুইরাত এক সেকেন্ডের জন্যেও ঘুমাতে পারল না স্যামুয়েল। বারবার উঠে গেল ফার্ডের কাছে ওর অবস্থা দেখতে। ফার্ডের প্রতি ছেলের এই ভালোবাসা দেখে বাবা তো মুগ্ধ। 'তোর মতো এমন পশুপ্রেমিক মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি রে', স্যামুয়েলকে প্রশংসার সুরে বলেন তিনি। স্যামুয়েল মুচকি হাসে। কিন্তু সেইসঙ্গে একধরনের অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। অবশ্য বাবাকে ওর পরীক্ষার কথা জানাবার কোনো উপায় নেই। জানে কোনোভাবে যদি বাবা জানতে পারেন ব্যাপারটা, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবেন।

অবশেষে এল সেই চূড়ান্ত দিন। বাবার চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠল ও। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বাবা চিৎকার করছেন, 'মিথ্যুক। প্রতারক। চোর।' পাশে পড়ে আছে গাড়ি; ফার্ড নেই। বাবার চারদিকে মানুষের ভিড়।

একদৌড়ে ভিড় ঠেলে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে স্যামুয়েল জানতে চাইল, 'বাবা, ফার্ড কই?'

ফুঁপিয়ে উঠলেন বাবা, 'মারা গেছে রে, স্যামুয়েল। রাস্তার কুত্তার মতো মরে গেছে।' প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল স্যামুয়েল।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বাবা তখনও বলে চলেছেন, 'স্যামুয়েল তুই তো জানিস, আমরা ওকে কত ভালোবাসতাম। আমি কখনও ওকে অত্যাচার করিনি। গাড়িতে বেশি মাল তুলিনি, একটানা বেশিক্ষণ ঘুরাইনি, চাবুক পর্যন্ত মারিনি। আমি বাটপাড় ব্যাপারীকে দেখে নেব। মিথ্যুক! ঠক! আমার সারাজীবনের জমানো টাকা নিয়ে একটা মরা ঘোড়া গছিয়েছে আমাকে।'

স্যামুয়েল চলে এল ওখান থেকে। বুকের ভেতর খুব কষ্ট হচ্ছে। এতদিনের স্বপ্ন এভাবে গুঁড়িয়ে যাবে কল্পনাও করেনি। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল ওর।

পরদিন স্যামুয়েল শুনল এক আইনজীবীর সঙ্গে টেরেনিয়ার বিয়ে ঠিক করেছেন ওর বাবা-মা। কথাটা বিশ্বাস করতে চাইল না ওর মন। না, এ হতে পারে না, টেরেনিয়া তার, শুধুই তার। বাড়ি থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল স্যামুয়েল। সোজা ডা. ওয়ালের বাসায় ঢুকল। ডা. আর মিসেস ওয়াল বসে আছেন বারান্দায়। তাদের দিকে

এগিয়ে গেল স্যামুয়েল, লম্বা করে একটা শ্বাস টানল, তারপর ঘোষণার সুরে বলল, 'শুনুন, একটা ভুল হয়ে গেছে। ভুলটা টেরেনিয়ার। ও আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন দুজনে।

'আমি জানি আমি ওর উপযুক্ত নই,' দ্রুত বলে চলল স্যামুয়েল। 'কিন্তু ও আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করলে সুখী হতে পারবে না। ঐ আইনজীবীটা ওর জন্য খুব বেমানান...'

'ইতর! নীচ! বেরো! বেরো!' সন্ন্যাসরোগীর মতো চিৎকার করে উঠলেন টেরিনিয়ার মা।

স্যামুয়েলকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হল বাড়ি থেকে। হতভম্বের মতো ও দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল ডা. ওয়ালের বাড়ির দিকে। এই বাড়ি চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে ওর জন্য।

সেই রাতে ঈশ্বরের সঙ্গে তর্ক করল স্যামুয়েল। 'তুমি আমার কাছে কী চাও, বলো ঈশ্বর? টেরিনিয়াকে নাইবা যদি পেলাম, তাহলে ওর জন্য কেন আমার মনে ভালোবাসা জন্মালে? আমার জন্য কি তোমার একটুও দয়া নেই, ঈশ্বর? বলো, জবাব দাও। চুপ করে আছ কেন?' হতাশায় কণ্ঠস্বর ক্রমশ ওপরে উঠতে শুরু করল। পাশের ঘরের বাসিন্দারা খেঁকিয়ে উঠল, 'রাতদুপুরে এসব কী শুরু করেছ, স্যামুয়েল। দয়া করে ঘুমাও এবং আমাদের একটু ঘুমাতে দাও।'

চুপ হয়ে গেল স্যামুয়েল। কিন্তু ঘুম এল না চোখে। সারারাত টেরেনিয়ার কথা ভাবল ও।

পরদিন বিকালে ডা. ওয়াল স্যামুয়েলকে ডেকে পাঠালেন। স্যামুয়েল এল। বারান্দায় ডা. ওয়াল, টেরেনিয়া আর ওর মাকে বসে থাকতে দেখল।

'আমরা একটা জটিল সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি, স্যামুয়েল,' বললেন ডা. ওয়াল। 'ছোটবেলা থেকেই আমাদের মেয়েটা খুব জেদি। আর একবার জিদ ধরলে সে ওটা পূরণ করেই ছাড়ে। জানি না কেন আমার মেয়ে হঠাৎ তোমার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। অবশ্য এই আকর্ষণকে আমি ভালোবাসা বলব না। কারণ টেরেনিয়ার মতো বাচ্চামেয়ে ভালোবাসার কীইবা বোঝে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ও সেই আইনজীবীকে বিয়ে করতে চাইছে না। ও তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে।'

আড়চোখে টেরেনিয়ার দিকে তাকাল স্যামুয়েল। হাসছে ওর স্বপ্নকন্যা। বুকের মধ্যে ঢেউ উঠল স্যামুয়েলের। মনে হল কে যেন আনন্দ-অনুরাগের সেতার বাজিয়ে চলেছে বুকের এস্রাজে। ডা. ওয়াল তার মেয়ের দিক থেকে স্যামুয়েলের নজর ফেরালেন। 'তুমি বলেছিলে তুমি আমার মেয়েকে ভালোবাসো।'

'জ্বি–জ্বি স্যার।' তোতলাতে তোতলাতে বলল স্যামুয়েল।

'তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, স্যামুয়েল। তুমি কি চাও টেরেনিয়া একটা ফেরিওয়ালাকে বিয়ে করে সারাটা জীবন কাটাক?'

ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে টের পেল স্যামুয়েল। কিন্তু এই ফাঁদকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। টেরিনিয়ার দিকে তাকাল ও আবার, বলল, 'না, স্যার।'

'তাহলে তো তুমি সমস্যাটা বুঝতেই পারছ। আমরা কেউই চাই না টেরেনিয়া একটা ফেরিওয়ালাকে বিয়ে করুক। আর তুমি তো একটা ফেরিওয়ালা বৈ অন্য কিছু নও, স্যামুয়েল।'

'আমি চিরদিন ফেরিওয়ালা থাকব না, ডা. ওয়াল।' দৃঢ় গলায় বলল স্যামুয়েল।

'তাহলে তুমি কী হবে শুনি?' মিসেস ওয়াল ফুঁসে উঠলেন। 'তোমার জন্মই ফেরিওয়ালার পরিবারে। তুমি সারাজীবন ফেরিওয়ালাই থেকে যাবে। আমরা এমন ফকিরনীর ছেলের কাছে আমাদের মেয়ে বিয়ে দেব না।'

'আমরা একটা আপসে পৌঁছেছি,' ডা. ওয়াল বললেন, 'তোমাকে ছয় মাস সময় দেয়া হবে। এর মধ্যে তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে তুমি শুধু একজন ফেরিওয়ালা নও। তুমি যদি আমাদের স্ট্যাটাসের সমকক্ষ হতে না পারো তাহলে টেরেনিয়ার সঙ্গে আমরা ঐ আইনজীবীরই বিয়ে দেব।'

স্যামুয়েল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ডা. ওয়ালের দিকে। 'মাত্র ছয় মাস!' এই ছয় মাসের মধ্যে কী করবে স্যামুয়েল? ঐ নরকের মধ্য থেকে এত অল্পসময়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব।

'আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছ?' ডা. ওয়াল জিজ্ঞেস করলেন।

'জ্বি, স্যার।'

ডাক্তারের কথা স্যামুয়েল খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। ভীষণ ভার ঠেকছে মাথাটা। ডাক্তার আসলে ও যোগ্যতা প্রমাণ করুক তা চাননি, তিনি এককথায় অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটাতে চেয়েছেন। জামাই হিসেবে ওঁরা পেতে চাইছেন ডাক্তার কিংবা আইনজ্ঞ, আর নয়তো কোনো ধনবান ছেলেকে। অথচ ওর পক্ষে এই তিনটার কোনোটা হওয়ারই কোনো সম্ভাবনা নেই। সরকারি আইন অনুযায়ী ডাক্তার হওয়া যাবে না। আইনজীবী? উঁহুঁ, তাও সম্ভব নয়। আইনজীবী হবার বয়সও সে পেরিয়েছে। ধনবান? প্রশ্নই ওঠে না। চব্বিশ ঘণ্টাও ও যদি ক্যাম্পের রাস্তায় রাস্তায় মাল বিক্রি করে তবুও নব্বই বছর বয়সেও ও গরিব থেকেই যাবে। ডাক্তার ওয়াল আর তার স্ত্রী একথা জানেন। আর জানেন বলেই প্রস্তাবটা দিয়েছেন। কিন্তু টেরেনিয়া? সম্ভবত টেরেনিয়া ওকে একমাত্র বিশ্বাস করে। ওর হয়তো ধারণা ছয়মাসে স্যামুয়েল নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারবে। ও আমার চেয়েও বেশি পাগল : হতাশ হয়ে ভাবল স্যামুয়েল।

শুরু হল অগ্নিপরীক্ষার ছয়মাস। ফেরিওয়ালার জীবন চলতে লাগল একঘেয়েভাবে। সকালে উঠে বাবার সঙ্গে ফেরি করতে বেরোয় স্যামুয়েল, সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসে। বাড়ি ফিরেই কোনোমতে দুমুঠো গিলে স্যামুয়েল ছোটে তার ল্যাবরেটরিতে। ইতিমধ্যে প্রায় একশো রকমের সেরাম তৈরি করেছে ও। ওষুধগুলো প্রয়োগ করেছে খরগোশ, বেড়াল, কুকুর, আর পাখিদের ওপর। কিন্তু সবগুলোই মরে গেছে। ডোজ সহ্য করার জন্য আসলে বড় রকমের কোনো প্রাণী দরকার, ভাবে স্যামুয়েল হতাশমনে। কিন্তু কোথায় পাবে ফার্ডের মতো একটা ঘোড়া কিংবা মোষ? এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে আপন মনে।

সপ্তাহে দুদিন স্যামুয়েল ক্রাকোভ শহরে যায় বাবার সঙ্গে মাল কিনতে। খুব ভোরে অন্যান্য ফেরিওয়ালার সঙ্গে বন্ধ-গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে স্যামুয়েল। কিন্তু মন পড়ে থাকে অন্যখানে, প্রেমিকা টেরেনিয়ার কাছে।

এমনি একদিন ভোরে স্যামুয়েল আপনমনে ভাবছে টেরেনিয়ার কথা, এই সময় একটা ক্রুদ্ধকণ্ঠ ভেসে এল কানে, 'এই ব্যাটা ইহুদির বাচ্চা, পথ আটকে রেখেছিস কেন? বেরো ব্যাটা।' চমকে উঠল স্যামুয়েল। গেট খুলে গেছে। ওর গাড়িটা বেরুবার পথ আটকে দিয়েছে। গার্ডদের একজন রেগে আগুন হয়ে ওকে ইঙ্গিত করছে বাইরে যেতে। গেটের সামনে সবসময় দুজন গার্ড পাহারা দেয়। সবুজ ইউনিফর্ম-পরা এই গার্ডদুটোর কোমরে সবসময় পিস্তল ঝোলানো থাকে আর হাতে ভারী লাঠি। একজন গার্ডের কোমরে সুতোর সঙ্গে বাঁধা থাকে বড় একটা চাবি। এটা দিয়েই সে গেট খোলে আর বন্ধ করে।

ওদের এই বন্দিশালার পাশেই ছোট্ট একটা নদী। নদীর ওপর কাঠের একটা পুরোনো সেতু। সেতুর ওপারে পুলিশদের দুর্গ। ওখানে এই বন্দিশালার গার্ডরা থাকে। বেশ কয়েকবার স্যামুয়েলের চোখে পড়েছে অসহায় কোনো ইহুদিকে পুলিশের লোকরা টেনে-হিঁচড়ে সেতুর ওপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যারা একবার যায় তারা আর ফিরে আসে না। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিদের সবাইকে ফিরে আসতে হয় বন্দিশালায়। অন্ধকার হওয়ার পরও যদি কোনো ইহুদি ফিরতে না পারে তার পক্ষে আর কোনোদিন ফিরে আসা সম্ভব হয় না এখানে। পুলিশের গার্ডদের হাতে একবার ধরা পড়লে সে লাপাত্তা হয়ে যায়। শোনা যায়, হতভাগ্য লোকটিকে নাকি কোথায়, কোনো এক লেবার-ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় যেখান থেকে কোনোদিন ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই সন্ধ্যার পরে গেটের বাইরে থাকার কথা কল্পনাও করতে পারে না বন্দিশালার কোনো লোক।

দুটো গার্ডেরই সমানভাবে সারারাত ধরে পাহারা দেয়ার কথা। কিন্তু বন্দিশালার লোকরা জানে ওদের খোঁয়াড়ে ঢোকাবার পরপরই একজন গার্ড ভেগে পড়ে। ফুর্তি করতে যায় শহরে। ঠিক ভোর হওয়ার আগে আবার ফিরে আসে। পালাক্রমে এই-ই চলে আসছে বহুদিন ধরে।

পল আর অ্যারাম নামের গার্ডদুটো ওদের পাহারা দেয়। পল লোকটা ফুর্তিবাজ। কিন্তু ওর সঙ্গীটা ওর সম্পূর্ণ বিপরীত। ভয়ানক নিষ্ঠুর স্বভাবের। ওর হাতে কেউ ধরা পড়লে আর তার রক্ষা নেই। পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলে। আর সেই শয়তানের মতো লোকটাই এখন স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে খ্যাঁকখ্যাঁক করছে। স্যামুয়েল তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল গেট থেকে। পেছনে না- তাকিয়েও স্পষ্ট অনুভব করল অ্যারাম শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

স্যামুয়েলের ছয়মাস খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তিনমাস ইতিমধ্যে চলে গেছে। হাতে আছে আর মাত্র তিনমাস। এমন কোনো মুহূর্ত নেই যখন স্যামুয়েল তার সমস্যা নিয়ে ভাবে না। স্যামুয়েলের খুব ইচ্ছে করে টেরেনিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে? অন্য কোনো ক্যাম্পে? না, টেরেনিয়াকে সে সামান্য কষ্টও দিতে পারবে না।

সময় চলে যাচ্ছে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে। তিন মাস থেকে দুই মাস, সেখান থেকে একমাসে এসে ঠেকল। এত কষ্টের মধ্যেও একটাই মাত্র সান্ত্বনা, সপ্তাহে তিনদিন সে তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পায়। আর প্রতিবার যেন আরো গভীর করে সে প্রেমে পড়ে টেনেরিয়ার। প্রতিবারই একটা মিশ্র অনুভূতি কুরে কুরে খায় ওকে। যতবেশি দেখা হচ্ছে টেনেরিয়ার সঙ্গে ততবেশি কমে আসছে ওকে হারানোর সময়। অথচ প্রতিবারই টেনেরিয়া ওকে আশ্বাস দেয়, 'ভেবো না, স্যামুয়েল, পথ একটা তুমি নিশ্চই খুঁজে পাবে।'

কিন্তু হাতে সময় আছে আর মাত্র তিন সপ্তাহ। অথচ স্যামুয়েলের অবস্থা এখনও আগের মতোই। যেখান থেকে শুরু করেছিল, এখনও ঠেকে আছে সেখানেই।

একরাতে হঠাৎ করেই টেরেনিয়া আস্তাবলে এল প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে। স্যামুয়েলের গলা জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'স্যামুয়েল, চলো আমরা পালিয়ে যাই।' ভয়ানক চমকে উঠল স্যামুয়েল। কল্পনাও করেনি এত রাতে টেরেনিয়া এভাবে চুপিচুপি তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আনন্দে বুক ভরে গেল ওর। টেরেনিয়া ওর দুঃখে দুঃখী হতে চাইছে, বাবা-মা সব ছেড়ে ওর সঙ্গে চলে যেতে চাইছে, ভাবতেই হু হু করে উঠল মন।

গভীর আবেগ আর ভালোবাসায় প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরল প্রেমিক, 'তা কীভাবে সম্ভব, টেরেনিয়া? আমরা যেখানেই যাই না কেন সেখানেই আমাদের এই নোংরা জীবন কাটাতে হবে। আমাকে ফেরিওয়ালাই থাকতে হবে।'

'হোক। আমার কিছু যায় আসে না।' স্যামুয়েলের চোখের সামনে ভেসে উঠল টেরেনিয়াদের সাজানো-গোছানো বাড়ি, বিলাসবহুল জীবন। না, টেরেনিয়াকে সে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারবে না।

'না, টেরেনিয়া', বলল সে। 'আমি তা পারব না।'

আর কোনো কথা বলল না টেরেনিয়া। চলে গেল। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যামুয়েল।

পরদিন সকালে স্যামুয়েলের দেখা হল আইজ্যাকের সঙ্গে, ওর স্কুলের বন্ধু। একচোখো, মরোমরো চেহারার একটা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিল ও, স্যামুয়েল হাত তুলে ওকে থামাল।

'এই যে আইজ্যাক, বুড়ো ঘোড়াটা নিয়ে কোথায় চললে? ওর যে অবস্থা দেখছি তাতে ওটা আর বেশিক্ষণ হাঁটতে পারবে বলে তো মনে হয় না।'

'তার দরকারও নেই। লোটিকে আমি একটা গামের ফ্যাক্টরিতে গছাতে যাচ্ছি।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে তোমার লোটির জন্য খুব বেশি দাম দেবে বলে মনে হয় না।'

'বেশি দামের দরকার কী? ওকে বেচে আমি একটা গাড়ি কিনতে পারলেই হল।'

স্যামুয়েলের বুকে ধুকপুকানি শুরু হল। 'আমি কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে পারি। তোমার ঐ ঘোড়াটার বিনিময়ে আমার এই গাড়িটা তোমাকে দিতে পারি।'

এককথায় রাজি হয়ে গেল আইজ্যাক। গাড়ি নিয়ে চলে গেল ও। আর ঘোড়াটা নিয়ে নাচতে নাচতে আস্তাবলে ফিরে এল স্যামুয়েল। ফার্ডকে যেখানে রেখেছিল লোটিকে সেখানেই বেঁধে রাখল। আদর করে ঘোড়াটার কাঁধে চাপড় মারতে মারতে বলল, 'ভয় নেই, লোটি, তুমি বিজ্ঞানের জগতে নতুন এক বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছ।'

কিছুক্ষণ পর স্যামুয়েল নতুন সেরাম তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে এখানে মহামারী লেগেই থাকে। নতুন যে রোগটা মহামারীর আকার ধারণ করেছে সেটা একধরনের জ্বর। প্রচণ্ড জ্বর ওঠে, কাশতে কাশতে রোগীর দম বন্ধ হয়ে আসে, শরীরের গ্রন্থিগুলো ফুলে ওঠে, অসহ্য কষ্ট পেয়ে মারা যায় রোগী। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছেন রোগের কারণটা বের করতে। পারেননি। কাজেই চিকিৎসার প্রশ্নই ওঠে না। আইজ্যাকের বাপকেও ধরল এই মরণ-রোগ। খবর শোনা মাত্র স্যামুয়েল ছুটল আইজ্যাকের বাড়িতে।

'ডাক্তার এসেছিল। বলে গেছে করার কিছুই নেই।' কাঁদতে কাঁদতে বলল আইজ্যাক।

'এত ভেঙে পড়লে চলবে না, আইজ্যাক,' বলল স্যামুয়েল। 'তোমার বাবার একটা রুমাল এনে দাও আমাকে।'

'কী!' বিস্মিত হল আইজ্যাক।

'তোমার বাবার একটা রুমাল এনে দাও। যেটা উনি ব্যবহার করেছেন সেটা। কিন্তু সাবধানে রুমালটা ধরবে। ওতে অনেক জীবাণু আছে।'

এক ঘণ্টা পর আইজ্যাকের বাবার কফভর্তি রুমাল নিয়ে আস্তাবলে ফিরল স্যামুয়েল। রুমালে শুকিয়ে যাওয়া কড়কড়ে কফ চেঁছে জিনিসটা একটা ঝোল ভর্তি পাত্রে ঢালল।

সেদিন সারারাত কাজ করল স্যামুয়েল। পরের দুদিনও একটানা পরিশ্রম করার পর ও পেল সেরামের জীবাণু। অল্প ডোজের একটা ইনজেকশন দিল লোটিকে। তারপর শুরু হল উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা।

বেঁচে থাকল লোটি। ডোজের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলল স্যামুয়েল। বাহাত্তর ঘণ্টা পরও যখন লোটি বেঁচে রইল, আত্মবিশ্বাস ফিরে এল ওর। পেরেছে সে! প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে অবশেষে সমর্থ হয়েছে।

ছুটল স্যামুয়েল আইজ্যাকের বাড়িতে। ওদের বাড়িতে তখন শোকের ছায়া। মৃতপ্রায় লোকটার জন্য গলা ফাটিয়ে কাঁদছে সবাই।

'বাবা প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন।' কাঁদতে কাঁদতে বলল আইজ্যাক।

'তোমার বাবার কাছে চলো।' বলল স্যামুয়েল।

আইজ্যাক স্যামুয়েলকে নিয়ে উঠে এল ওপরে। আইজ্যাকের বাপ বিছানায় শুয়ে আছেন। জ্বরে মুখটা পাণ্ডুর। দমকে দমকে কাশছেন তিনি। প্রতিবার কাশির সঙ্গে আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। কোনো সন্দেহ নেই লোকটি মারা যাচ্ছেন।

স্যামুয়েল গভীর করে শ্বাস টানল, বলল, 'আইজ্যাক, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

মুমূর্ষু স্বামীর পাশে বসে বিলাপ করছিলেন আইজ্যাকের মা। স্যামুয়েল তার হাতের ভায়ালটা দেখিয়ে বলল, ও আইজ্যাকের বাবার শরীরে ওর বানানো সেরামটা প্রয়োগ করতে চায়।

ঘরের সবাই চাইল ওর দিকে। ওর হাতের ভায়ালটা দেখে ভরসা পেল না কেউ। কিন্তু আইজ্যাকের মায়ের সামনে তখন কোনো বিকল্প নেই। তার স্বামীর মৃত্যু অবধারিত। তার হারাবার কিছু নেই। তিনি স্যামুয়েলকে ইনজেকশন দেয়ার অনুমতি দিলেন।

স্যামুয়েল ইনজেকশন দিল আইজ্যাকের বাবাকে। ঘণ্টা-তিনেক অপেক্ষা করল। অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। কাশি বরং আরো বেড়ে গেল। মুখ নিচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল স্যামুয়েল।

পরদিন সকালে স্যামুয়েলকে শহরে যেতে হল কিছু জিনিসপত্র কিনতে। ওর প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে আইজ্যাকের বাড়িতে যেতে। ওর বাবা এখনও বেঁচে আছেন কিনা কে জানে! অনেক কষ্টে ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখল স্যামুয়েল।

বাজারে প্রচণ্ড ভিড়। জিনিস কিনতে কিনতে বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এল। ক্যাম্প থেকে মাইলদুয়েক দূরে থাকতে স্যামুয়েলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল ভাগ্য। ওর গাড়ির একটা চাকা ভেঙে গেল, জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল রাস্তার ওপর।

বিরাট সমস্যায় পড়ল স্যামুয়েল। ওকে এখন একটা চাকা জোগাড় করতে হবে। কিন্তু জিনিসপত্র এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও ভয় করছে। এদিকে ভিড় জমতে শুরু করেছে। সবার দৃষ্টি ওর ছড়ানোছিটানো মালের দিকে।

এই সময় পুলিশের লোকটাকে চোখে পড়ল ওর। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। আর রক্ষা নেই। এই ব্যাটা নিশ্চয়ই সবকিছু কেড়ে নেবে। পুলিশটা ভিড় ঠেলে স্যামুয়েলের সামনে এসে দাঁড়াল।

'তোমার একটা নতুন চাকা দরকার তো?'

' জ্বি, জ্বি স্যার।'

'কোথায় পাওয়া যাবে, জানো?'

'না স্যার।'

একটা কাগজে ঠিকানা লিখে স্যামুয়েলের হাতে দিয়ে বলল,

'এখানে যাও। এখানে গেলে নতুন চাকা পাবে।'

'আমার গাড়িটা কে দেখবে স্যার?'

'আমি আছি। তাড়াতাড়ি যাও। তাড়াতাড়ি ফিরবে।'

চিরকুট নিয়ে ছুটল স্যামুয়েল, ঠিকানামাফিক এক কামারের দোকানে এসে হাজির হল। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতেই কামার একটা চাকা খুঁজে বের করল ওর বর্ণনামাফিক। দাম দিয়ে দিল স্যামুয়েল। তারপর ছুটল ফিরতি পথে।

পুলিশের লোকটা তখনও ওর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনের ভিড়টা নেই। ওর জিনিসপত্র ঠিকই আছে। পুলিশটা ওকে সাহায্য করল চাকা লাগাতে। আরো আধঘণ্টা লাগল গাড়ি ঠিকঠাক করতে। পুলিশকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল স্যামুয়েল।

ক্যাম্প থেকে আধমাইল দূরে থাকতে সূর্য ডুবে গেল বিশাল দেয়ালের ওপারে। ঝুপ করে নেমে এল আঁধার। রাস্তায় একটা লোকও নেই। এতক্ষণ আইজ্যাকের বাপের কথা ভাবছিল স্যামুয়েল। এইবার টনক নড়ল ওর। গাড়ি নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল গেট লক্ষ্য করে। হাতুড়ি পিটছে বুকে। গেট বন্ধ হবার পর কেউ বাইরে গার্ডদের হাতে ধরা পড়লে তার কী ভয়ংকর অবস্থা হয় মনে পড়ল স্যামুয়েলের।

দৌড়ের গতি বেড়ে গেল। হয়তো একজন গার্ড এখন থাকবে গেটে। গার্ডটা যদি পল হয়, তাহলে স্যামুয়েল হয়তো ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেতেও পারে। কিন্তু যদি অ্যারাম হয়! আর ভাবতে পারল না স্যামুয়েল।

অন্ধকার খুব দ্রুত ঘন হয়ে আসছে। বিরাট কুয়াশার পর্দার মতো ঢেকে ফেলছে ওকে। হালকা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। ক্যাম্পের গেটের কাছে এসে পড়েছে স্যামুয়েল, আর মাত্র দুটো ব্লক বাকি, গেটটা চোখে পড়ল ওর। আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। বন্ধ হয়ে গেছে গেট!

স্যামুয়েল জীবনেও কোনোদিন বন্ধ-গেটের বাইরে থাকেনি। বন্ধ-গেটটা দেখে ভয়ে পাথর হয়ে গেল ও। অনেক কষ্টে সামনের দিকে পা বাড়াল। গার্ডদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বুক নেচে উঠল স্যামুয়েলের। সম্ভবত কোনো জরুরি কাজে বাইরে গেছে ওরা। ভেতরে যাওয়ার কোনো রাস্তা এখন খুঁজে বের করতে পারলেই হল। দরকার হলে ও দেয়াল বাইবে। গেটের কাছাকাছি আসতেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরুল লোকটা।

'আসতে থাকো'— গম্ভীর গলায় আদেশ করল সে।

অন্ধকারে মুখটা চিনতে পারল না স্যামুয়েল। কিন্তু কণ্ঠস্বর চিনতে পারল। অ্যারাম।

'আসো বাছাধন, আরও কাছে আসো।'

হোঁচট খেল স্যামুয়েল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল অ্যারাম। 'উঁহুঁ, হোঁচট খেলে তো চলবে না। আসতে থাকো। আসো আরো।'

বিশালদেহী দানবটার দিকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে স্যামুয়েল। ওর তলপেটে বিচিত্র অনুভূতি, মাথা দপদপ করছে। এগিয়ে আসতে আসতে স্যামুয়েল বলল, 'স্যার, দয়া করে আমার কথা শুনুন। আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। আমার গাড়িটা...'

অ্যারামের বিশাল হাত এগিয়ে এল স্যামুয়েলের দিকে, কলার ধরে শূন্যে তুলে ফেলল ওকে, 'কুত্তার বাচ্চা ইহুদি,' হিসহিস করে উঠল ও, 'ভেবেছিস তোর মতো একটা জারজের কৈফিয়ত শোনার জন্য আমি পাহারা দিচ্ছি, না? জানিস তোর এখন কী দশা হবে?'

অসহায়ের মতো মাথা নাড়ল স্যামুয়েল।

'তাহলে শোন্, গত সপ্তাহে একটা নতুন আইন চালু হয়েছে। রাতে গেটের বাইরে কেউ ধরা পড়লে তাকে দশ বছরের জন্য সিলেসিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হবে। কি, এখন কেমন মজা বুঝছ?'

কথাটা বিশ্বাস হল না স্যামুয়েলের। কেমন ঘোরের মধ্যে ও বলে উঠল, 'কিন্তু আ-আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।'

ওর গালে প্রচণ্ড চড় কষাল অ্যারাম। ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে।

'চল্ ব্যাটা।'

'কো—কোথায়?' আতঙ্কে গলা বসে গেল স্যামুয়েলের।

'পুলিশ-ব্যারাকে। কাল সকালে ওরা তোমাকে বাকিদের সঙ্গে সিলেসিয়ার জাহাজে তুলে দেবে। ওঠ্।'

স্যামুয়েল চিৎ হয়ে পড়েই আছে মাটিতে। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। 'আমাকে—আমাকে একবার ভেতরে যেতে দিন দয়া করে। আমি একটু বাসার লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।'

অ্যারাম খিকখিক হাসল। 'ওরা তোমাকে বিদায় দিতে চাইবে না।'

'প্লিজ,' স্যামুয়েল হাতজোড় করল, 'অন্তত ভেতরে একটা খবর পাঠাতে দিন দয়া করে।'

হাসিটা মুছে গেল অ্যারামর মুখ থেকে। স্যামুয়েলের সামনে পাহাড়ের মতো দেহ নিয়ে দাঁড়াল। শান্তগলায় বলল, 'আমি তোমাকে উঠতে বলেছি। আবারও যদি আমাকে এক কথা বলতে হয় লাথি মেরে তোমার অণ্ডকোষ ফাটিয়ে দেব।'

স্যামুয়েল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বজ্রমুঠিতে অ্যারাম স্যামুয়েলের হাত চেপে ধরল। নিয়ে চলল পুলিশ-ব্যারাকের দিকে। সিলেসিয়ায় একবার গেলে এ জীবনে আর ফিরতে পারবে না ও। ভেঙে পড়ল স্যামুয়েল, 'প্লিজ আমার ওপর এত অবিচার করবেন না। আমাকে ছেড়ে দিন, প্লিজ, যেতে দিন।'

হাতের চাপ আরো বাড়ল। স্যামুয়েলের মনে হল ওর রক্তচলাচল বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। 'হ্যাঁ ভিক্ষা চাও। ইহুদি ভিক্ষুকগুলোর ফরিয়াদ শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। সিলেসিয়ার কথা শুনেছ তুমি? ওখানে শীতকালটা তোমার কাটাতে হবে। তবে চিন্তার কিছু নেই। তোমাকে মাটির নিচে, কয়লাখনিতে কাজ করতে হবে। যখন তোমার ফুসফুসের রোগ হবে আর কাশতে কাশতে কয়লা ফেলবে কফের সঙ্গে তখন ওরা তোমাকে বরফের ওপর ছুড়ে ফেলে দেবে। ওখানেই শান্তিতে মরতে পারবে তুমি।'

কথা বলতে বলতে অ্যারাম স্যামুয়েলকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সামনেই সেতু। বৃষ্টিতে অস্পষ্ট চেনা যাচ্ছে সেতুর ওপারের পুলিশ-ব্যারাক।

'তাড়াতাড়ি। আরো তাড়াতাড়ি।' খেঁকিয়ে উঠল অ্যারাম।

হঠাৎ স্যামুয়েলের মনে হল এভাবে অসহায়ের মতো ও মরতে পারে না। চোখের সামনে ভেসে উঠল টেরেনিয়া আর আইজ্যাকের মরণাপন্ন বাপের মুখচ্ছবি। না, কারো অধিকার নেই ওর জীবন ছিনিয়ে নেয়। যেভাবেই হোক ওকে পালাতে হবে, নিজেকে বাঁচাতে হবে। সেতুর উপর উঠে এল ওরা। আর মাত্র ত্রিশ গজের মতো বাকি। যা করার এখনই করতে হবে। কিন্তু কীভাবে কী করবে স্যামুয়েল? অ্যারামের হাতে বন্দুক আছে। তাছাড়া খালিহাতেই তো সে ওকে পিষে মারতে পারে।

সেতুর অপরপারে পৌঁছে গেল ওরা। পুলিশ-ব্যারাকটা এখন ঠিক সামনে।

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল অ্যারাম। 'আমার আরো কাজ আছে।'

পুলিশ-ব্যারাকের খুব কাছে এসে পড়েছে ওরা, গার্ডদের বাঁশির শব্দ শুনতে পেল স্যামুয়েল। অ্যারাম ওর মুঠি আরো শক্ত করল, খোয়া-বিছানো রাস্তা দিয়ে ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল থানার দিকে। আর কয়েক সেকেন্ড পরেই ওরা পৌঁছে যাবে থানায়। স্যামুয়েল ডান হাতটা ঢোকাল প্যান্টের পকেটে। পয়সা-ভরা থলেটার স্পর্শ পেল আঙুলে। উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় করতে লাগল ওর। মুক্ত হাতটা থলে-সুদ্ধ বের করল পকেট থেকে। আস্তে করে থলেটা ছেড়ে দিল হাত থেকে। ঝনঝন শব্দে পয়সাগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল অ্যারাম। 'কিসের শব্দ শুনলাম যেন?'

'জানি না,' তাড়াতাড়ি উত্তর দিল স্যামুয়েল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাঙচাল অ্যারাম। ওকে শক্ত করে ধরে এক পা পিছুতেই খোলা ব্যাগটা চোখে পড়ল ওর।

'যেখানে যাচ্ছ সেখানে তোমার টাকার দরকার হবে না।' বলল অ্যারাম।

থলেটা কুড়ানোর জন্য বসে পড়ল সে। একই সঙ্গে নিচু হল স্যামুয়েলও। অ্যারাম থলেটা তুলছে, তখন ও হাতে তুলে নিয়েছে বড় একটা পাথর। অ্যারাম উঠে দাঁড়াবার আগেই তার ডানচোখে ভীষণ গতিতে পাথরটা নেমে এল। মুহূর্তে চোখটা পরিণত হল লাল রঙের জেলিতে। একের-পর-এক আঘাত করেই যেতে লাগল স্যামুয়েল। রক্তের দলা হয়ে গেল অ্যারামের মুখ। দাঁড়িয়ে আছে অ্যারাম। অন্ধ একটা দানবের মতো। ওর দিকে তাকিয়ে ভয়ে শরীর অবশ হয়ে এল স্যামুয়েলের। নতুন করে আঘাত হানার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এই সময় মাটিতে পড়ে গেল অ্যারাম। আর নড়ল না।

স্যামুয়েল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লাশটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিশ্বাস হচ্ছে না ও মানুষ খুন করেছে। ব্যারাক থেকে ভেসে আসা বাঁশির শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেল।

বুঝতে পারল কী ভয়ংকর বিপদের মধ্যে সে আছে। এখন ওদের হাতে ধরা পড়লে সেলেসিয়ায় নয়, এখানেই জ্যান্ত ছাল ছাড়াবে ওরা তার। তারপর শহরের মাঝরাস্তায় লাশটা ঝুলিয়ে রাখবে। একজন পুলিশের গায়ে হাত তোলার অর্থই হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। আর সেখানে তো ও একজনকে খুনই করে ফেলেছে। এখান থেকে ওকে পালাতে হবে। তাড়াতাড়ি। সীমান্ত পেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারে ও। কিন্তু ফলাফল হবে ভয়াবহ। সারাজীবন ওকে পালিয়েই বেড়াতে হবে। না, অন্য কোনো বুদ্ধি করতে হবে ওকে।

অ্যারামের বিকৃত মুখটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল স্যামুয়েল কী করতে হবে। ঝুঁকল ও। অ্যারামের শরীর আতিপাতি খুঁজে বের করল গেটের চাবি। তারপর ওর পা দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল নদীতীরে। লাশটা টানতে গিয়ে জান বেরিয়ে গেল ওর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দম নিল। তারপর স্রোতে ভাসিয়ে দিল লাশটা। ভাসতে ভাসতে চোখের আড়াল হয়ে গেল ওটা। যে পাথরটা দিয়ে ও অ্যারামকে খুন করেছে সেটা ছুড়ে ফেলে দিল নদীতে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল ক্যাম্পের দিকে।

গেটের তালায় বিশাল চাবিটা ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা। খুলে ফেলল ভারী কাঠের দরজা। গাড়িটা ঢোকাল ভেতরে। তারপর গেটটা আবার বন্ধ করল। কাজগুলো যেন স্বপ্নের ঘোরে করছে স্যামুয়েল। এত শক্তি ও কোত্থেকে পাচ্ছে নিজেও জানে না। গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির দিকে এগোল স্যামুয়েল ওদের ঘরে বাড়ির তিন ঘরের বাসিন্দারা ওর অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন মুহূর্ত কাটাচ্ছে। ওকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সবাই।

'গার্ডরা তোমাকে ঢুকতে দিল?' স্যামুয়েলকে একসঙ্গে প্রশ্ন করল সবাই।

ওদেরকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল স্যামুয়েল। শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল ওরা।

'ও খোদা!' গুঙিয়ে উঠলেন স্যামুয়েলের বাবা, 'ওরা আমাদের সবাইকে খুন করবে।'

'না, আপনারা যদি আমার কথামতো কাজ করেন তাহলে কিছুই হবে না।' দৃঢ় গলায় বলল স্যামুয়েল। তারপর প্ল্যানটা খুলে বলল।

পনেরো মিনিট পর স্যামুয়েল ওর বাবা আর দুইজন প্রতিবেশী এল গেটে। হাতে একটা মোটা, লম্বা দড়ি।

'এখন অন্য গার্ডটা চলে এলে?' স্যামুয়েলের বাবা ফিসফিস করে বললেন।

'বাবা, ঘাবড়িয়ো না। ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। যদি প্ল্যানমাফিক কাজ না হয় তাহলে সব দোষ আমার।'

গেট খুলে বাইরে এল স্যামুয়েল। একা। বুক ধুকপুক করছে। যে-কোনো মুহূর্তে দ্বিতীয় গার্ড পল আসতে পারে। আবার গেট বন্ধ করল ও বাইরে থেকে। কোমরে চাবিটা বাঁধল। গেট ছেড়ে বাঁয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল ও। দেয়ালের ওপাশ থেকে মোটা একটা সাপের মতো নেমে এল দড়ি। নাগালের মধ্য আসতেই দড়িটা ধরে ঝুলতে লাগল ও। ওদিক থেকে টানতে আরম্ভ করলেন ওর বাবা আর দুই প্রতিবেশী। দেয়ালের মাথায় পৌঁছে দড়ির গোড়ায় ফাঁস তৈরি করল স্যামুয়েল। ফাঁসটা পরাল দেয়ালের মাথায় উঁচু হয়ে থাকা একটা গজাল লোহায়। তারপর দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে নিচে নেমে এল ও।

ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বাবা বললেন, 'ওহ্ খোদা, কাল সকালে আমাদের ভাগ্যে কী আছে তুমিই জানো।'

স্যামুয়েল বাবার দিকে তাকাল। বলল, 'কাল সকালে আমরা ভেতর থেকে দরজা ধাক্কাব। বলব সকাল হয়েছে আমাদের বেরুতে দাও।'

পরদিন সকালে দল বেঁধে এল পুলিশ আর সৈন্য। ভোর হতেই ক্যাম্পের লোকরা বাইরে বেরুনোর জন্য তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। আলাদা একটি চাবি জোগাড় করতে হয়েছে প্রশাসনকে গেট খোলার জন্য। দ্বিতীয় গার্ড পল স্বীকার গেল গতরাতে সে ক্রাকোভ শহরে একটু 'মৌজ' করতে গিয়েছিল। ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু অ্যারামের কোনো সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। অ্যারামের এই অন্তর্ধানের কারণে সব দোষ ক্যাম্পবাসীদের ঘাড়েই পুলিশ ফেলত। কিন্তু ওদের হতবুদ্ধি করে ফেলেছে বন্ধ-গেট। যেহেতু ওরা ভেতর থেকে তালাবন্ধ ছিল তাই ওদের পক্ষে অ্যারামের কোনো ক্ষতি করার প্রশ্নই ওঠে না। শেষমেশ ওরা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল অ্যারাম নিশ্চয়ই ওর কোনো গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ভেগেছে। কিন্তু গেটের চাবি কোথায় গেল? সব জায়গায় খোঁজ করা হল। পাওয়া গেল না। পাবেই বা কীভাবে, ওটা তো তখন স্যামুয়েলদের বাড়ির মেঝের নিচে ঘুমাচ্ছে।

প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অবসাদে চোখ বুজে এসেছিল স্যামুয়েলের। সারারাত অঘোরে ঘুমিয়েছে। হঠাৎ ভয়ানক চিৎকার আর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখের পাতা তখনও পুরোপুরি মেলেনি, অবচেতন মনে ভাবল ওরা নিশ্চয়ই অ্যারামের লাশ খুঁজে পেয়েছে, ওকে জবাই করতে আসছে।

চোখ মেলল স্যামুয়েল। আইজ্যাক দাঁড়ানো পাশে। হিস্টিরিয়া রোগীর মতো লাগছে ওকে, চিৎকার করে বলছে, 'বন্ধ হয়েছে। আবার বাবার কাশি বন্ধ হয়েছে। শিগগির আমাদের বাড়িতে চলো।'

হুড়মুড়িয়ে উঠল স্যামুয়েল। দুই বন্ধু মিলে তখুনি ছুটল। ভেতরে ঢুকেই স্যামুয়েল দেখল আইজ্যাকের বাপ বসে আছেন বিছানায়। শরীর ছুঁয়ে দেখল, । একদম জ্বর নেই। কাশছেনও না তিনি। বুড়োলোকটি স্যামুয়েলকে দেখে হাসলেন, বললেন, 'আমি সেরে গেছি, স্যামুয়েল। আমার মনে হয় আমি এখন একবাটি স্যুপ খেতে পারব।' আনন্দে চোখে জল এসে গেল স্যামুয়েলের।

আইজ্যাকের বাবার সুস্থ হওয়ার খবর ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল ক্যাম্পে। অসুস্থ রোগীদের আত্মীয়স্বজন ভিড় করতে লাগল স্যামুয়েলদের বাড়িতে। সবাই সেই আশ্চর্য সেরাম চাইছে। এত লোকের চাহিদা পূরণ করা স্যামুয়েলের পক্ষে অসম্ভব মনে হল। চলে এল ডা. ওয়ালের বাড়িতে।

ডা. ওয়ালের কানেও এসেছে স্যামুয়েল অসাধ্য সাধন করেছে। কিন্তু তিনি নিজের চোখে না-দেখে কিছু বিশ্বাস করতে রাজি নন। উনি নিজের রোগীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে মুমূর্ষু লোকটাকে বেছে নিলেন পরীক্ষা করার জন্য। স্যামুয়েল তাকে সেরাম ইনজেকশন দিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এল সে।

ডা. ওয়াল এবার নিজে গেলেন স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে ওর আস্তাবলের ল্যাবরেটরিতে। স্যামুয়েল তখন সেরাম তৈরিতে ব্যস্ত। ডা. ওয়াল বললেন, 'তুমি অসাধ্য সাধন করেছ, স্যামুয়েল। আমি খুব খুশি হয়েছি। এবার বলো আমার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে তুমি কী চাও?'

স্যামুয়েল চোখ তুলে তাকাল, মৃদু হেসে বলল, 'একটা ঘোড়া।'

সেই বছর, ১৮৬৮ সালে রোফ অ্যান্ড সন্স-এর যাত্রা হল শুরু।

স্যামুয়েল আর টেরেনিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। স্যামুয়েলকে ডা. ওয়াল যৌতুক হিসেবে দিলেন ছয়টা ঘোড়া আর সুসজ্জিত একটি ল্যাবরেটরি। স্যামুয়েল ওর গবেষণার পরিধি বাড়িয়ে চলল। গাছগাছড়া থেকে ওষুধ বানাতে লাগল। লোকজনের ভিড় বাড়তেই থাকল ওর ল্যাবরেটরিতে। সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে সুনাম। যারা খুব গরিব, পয়সা দেয়ার সামর্থ্য নেই, তাদেরকে স্যামুয়েল মাগনা ঔষধ দেয়। টেরেনিয়াকে বলে, 'ওষুধ মানুষকে রোগমুক্ত করার জন্য, লাভ করার জন্য নয়।'

স্যামুয়েলের ব্যবসা ক্রমশ বেড়েই চলল। একদিন ও টেরেনিয়াকে বলল সে একটা ওষুধের দোকান খুলতে যাচ্ছে।

দোকানটা প্রথম থেকেই সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করল। পয়সাওয়ালা কিছু লোক, যারা প্রথমে স্যামুয়েলকে ব্যবসার কাজে সাহায্য করতে চায়নি, তারা নিজেরাই এবার ওর ব্যবসার পার্টনার হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু রাজি হল না স্যামুয়েল। সরাসরি নাকচ করে দিল ও সবগুলো প্রস্তাব। নিজেদের ব্যবসায় বাইরের লোক ঢোকাতে চায় না ও। টেরেনিয়াও ওকে সমর্থন করল।

ব্যবসা যত বাড়ছে, পার্টনারশিপের প্রস্তাব ততই আসছে। কিন্তু সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে স্যামুয়েল। ডা ওয়াল কারণ জানতে চাইলে ও যুক্তি দেখাল শেয়াল যতই বন্ধুত্ব দেখাক, মুরগির খাঁচায় তাকে ঢুকতে দিতে নেই। একদিন-না-একদিন শেয়ালের খিদে পাবেই।

ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠছে, ওদিকে স্যামুয়েল আর টেরেনিয়ার সংসারে সুখ যেন উপচে পড়ছে। টেরেনিয়া স্যামুয়েলকে পাঁচটি দেবশিশু উপহার দিয়েছে। আব্রাহাম, জোসেফ, অ্যান্টন, জ্যান এবং পিতরের নামে একটি করে নতুন দোকান খুলল স্যামুয়েল। ওর কর্মচারীর সংখ্যা দুই ডজন ছাড়িয়ে গেল।

একদিন ক্রাকোভ শহর থেকে একজন সরকারি কর্মকর্তা এলেন স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে। একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তিনি। জানালেন, সরকার ইহুদিদের জন্য কিছু আইন শিথিল করেছেন। স্যামুয়েল ইচ্ছে করলে ক্রাকোভ শহরে ওর ব্যবসা শুরু করতে পারে।

প্রস্তাবটা লুফে নিল স্যামুয়েল। তিন বছরের মধ্যে ও ক্রাকোভ শহরে জমি কিনে চমৎকার একটি বাড়ি উপহার দিল টেরেনিয়াকে। অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হল ওর। এই স্বপ্নপূরণের অপেক্ষায় কত প্রহর গুনেছে ও।

কিন্তু স্যামুয়েলের চূড়ান্ত স্বপ্ন এটা নয়। ওকে আরও অনেকদূর যেতে হবে, স্বপ্নের শেষ সীমায় পৌঁছুতে হবে।

ওদের বাচ্চারা বড় হচ্ছে। স্যামুয়েল ওদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছে, বিভিন্ন ভাষা শেখাচ্ছে।

'ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি', একদিন স্যামুয়েলের শাশুড়ি বললেন, 'প্রতিবেশীরা ওকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করেছে ছেলেদের ভাষা শেখানোর বহর দেখে। আব্রাহাম আর জ্যানকে ইংরেজি শেখাচ্ছে, জোসেফ জার্মান, আন্টন শিখছে ফরাসি আর পিতর ইতালিয়ান। এত ভাষা শিখে কী লাভ হবে ওদের শুনি? এখানে কার সঙ্গে ওরা ঐ দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলবে?'

স্যামুয়েল শুনে হেসেছে, বলেছে, 'এটা ওদের শিক্ষারই একটা অঙ্গ।' ও জানে ওর ছেলেরা ভবিষ্যতে কাদের সঙ্গে কথা বলবে।

পনেরো বছরে পা দিল ওরা। বাবার সঙ্গে বিভিন্ন দেশ ঘুরতে শুরু করল। প্রতিটি ভ্রমণের পেছনে কাজ করল স্যামুয়েলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আব্রাহামের একুশ বছর বয়সে পরিবারের সবাইকে ডেকে স্যামুয়েল ঘোষণা করল, 'আব্রাহাম আমেরিকা যাচ্ছে ওখানে থাকার জন্য।'

'আমেরিকা!' চিৎকার করে উঠলেন টেরেনিয়ার মা। 'ঐ বর্বরদের দেশে। আমার নাতিদের আমি কোথায়ও যেতে দেব না। ওরা এখানেই থাকবে। নিরাপদে থাকবে।'

'আব্রাহাম আমেরিকাতেই যাবে।' দৃঢ় গলায় বলল স্যামুয়েল। ছেলের দিকে ঘুরল ও, 'তুমি নিউইয়র্কে একটা ফ্যাক্টরি খুলবে এবং ওটার দায়িত্ব তোমার হাতেই থাকবে।'

আব্রাহাম গর্বিত গলায় বলল, 'জ্বি বাবা।'

স্যামুয়েল এবার জোসেফের দিকে ঘুরল, 'তোমার একুশতম জন্মদিনে তুমি বার্লিন যাচ্ছ।' জোসেফ মাথা ঝাঁকাল।

অ্যান্টন বলল, 'আর আমি নিশ্চই প্যারিসে যাব, তাই না বাবা?'

স্যামুয়েল মাথা ঝাঁকিয়ে জ্যানের দিকে তাকাল, 'আর তুমি যাচ্ছ ইংল্যান্ডে।'

সবচেয়ে খুদেটা, পিতর এবার কথা বলে উঠল, 'আর আমি ইতালি যাব, না বাবা? কবে যাব, বলো না, বাবা, বলো না?'

স্যামুয়েল হাসল, 'আজ রাতে অবশ্যই নয়। তোমাকে তোমার একুশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পরের সাত বছরে পৃথিবীর পাঁচটা দেশে রোফ অ্যান্ড সন্সের শাখা গড়ে উঠল। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল আরো দেশে, মহাদেশে। শুধু ওষুধ-শিল্পে নয়, শিল্প-সাম্রাজ্যের দিকে পা বাড়াল রোফ অ্যান্ড সন্স।

অ্যাটর্নি ডাকল স্যামুয়েল শেয়ার বণ্টনের দলিল তৈরি করার জন্য। বলল, 'এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না। শেয়ার পরিবারের মধ্যেই থাকবে। শেয়ারের বড় অংশ থাকবে আমার বড়ছেলে এবং তার উত্তরাধিকারীদের হাতে। যদি কখনও শেয়ার বিক্রির প্রশ্ন ওঠে তাহলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় রোফ-পরিবারের যারা থাকবে তাদের ঐকমত্যে পৌঁছুতে হবে।'

ঘুরতে থাকল শতাব্দীর চাকা।

আব্রাহাম বিয়ে করল এক আমেরিকান মেয়েকে। ওদের ঘরে জন্মাল স্যামুয়েলের প্রথম নাতি, উড্রো। উড্রোর ঔরসে জন্মাল স্যাম; রোফ অ্যান্ড সন্সের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর। জোসেফ বিয়ে করল এক জার্মান মেয়েকে। এক ছেলে এক মেয়ে হল ওদের। ছেলেটি বড় হয়ে যাকে বিয়ে করল তার গর্ভে জন্মাল আনা। আনা বিয়ে করল ভালথার গাসনারকে। ফ্রান্সে অ্যান্টন বিয়ে করল এক ফরাসি মেয়েকে। দুই পুত্রের জন্ম দিল সে। একজন আত্মহত্যা করল। বাকি জন যে মেয়েটিকে বিয়ে করল তার গর্ভে জন্ম নিল হেলেন। হেলেন বহুবার বিয়ে করেছে।

কিন্তু এখনও মা হতে পারেনি। জ্যান লন্ডনে এক ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করল। ওদের একমাত্র মেয়ে নিকলস নামে এক ব্যারনেটকে বিয়ে করল। ওদের একমাত্র সন্তানের নাম অ্যালেক। রোমে পিতর বিয়ে করল এক ইতালিয়ান মেয়েকে। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে হল। ছেলেটি বিয়ে করল। ওর বৌ ওকে উপহার দিল সিমোনেটা নামের ফুলের মতো মেয়েটিকে। সিমোনেটা প্রেমে পড়ল তরুণ আর্কিটেক্ট ইভো পালাজির। প্রেম গিয়ে গড়াল পরিণয়ে।

বইটা পড়া শেষ হল এলিজাবেথের। তাড়াতাড়ি আগের জায়গায় রেখে দিল সে বইটা। আশ্চর্য এক গর্বে পুলকিত ওর মন। জীবনে প্রথমবারের মতো এলিজাবেথ জানতে পেরেছে ও কে এবং কোত্থেকে এসেছে।

বারো

পঞ্চদশ জন্মদিনে, এলিজাবেথ যখন স্কুলে সেকেন্ড টার্মের ছাত্রী, ওর সঙ্গে রিজ উইলিয়ামসের পরিচয় হল। রিজ স্কুলে এসেছিল ওকে একটা উপহার দিতে। স্যাম রোফ উপহারটি পাঠিয়েছেন।

'উনি নিজেই আসতে চেয়েছিলেন', রিজ ব্যাখ্যা করল, 'কিন্তু সময় করে উঠতে পারেননি।' এলিজাবেথ ওর হতাশা লুকোবার চেষ্টা করলেও ধরা পড়ে গেল রিজের কাছে। মেয়েটিকে খুব অভাগা মনে হল রিজের। ওর কষ্ট যেন ওকে স্পর্শ করল। একমুহূর্ত চুপ থেকে রিজ কলল, 'চলো, তুমি আর আমি কোথাও বসে ডিনার করি।'

প্রস্তাবটা চমৎকার : ভাবল এলিজাবেথ। রিজ নামের এই হ্যান্ডসাম যুবকের সঙ্গে মুখোমুখি বসে ডিনার করার কথা ভাবতেই কেমন রোমাঞ্চ জাগছে শরীরে। কিন্তু দ্বিধা কাটাতে পারল না ও, বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আ-আমার কিছু কাজ আছে।' রিজ বুঝতে পারছে এলিজাবেথের সমস্যাটা কোথায়। ও আসলে লজ্জা কাটাতে পারছে না। হেডমিস্ট্রেসের কাছে গেল সে। এলিজাবেথের জন্মদিনটা বাইরে কোথাও সেলিব্রেট করতে চায় জানাল। অনুমতি পেয়ে এলিজাবেথকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। এয়ারপোর্টের দিকে চলল।

'নুশাতেলে যাচ্ছি বোধহয় আমরা', এলিজাবেথ বলল।

রিজ ওর দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বলল, 'কে বলল আমরা নুশাতেলে যাচ্ছি?'

'তাহলে কোথায় যাচ্ছি?'

'ম্যাক্সিম। তোমার জন্মদিন পালন করার জন্য ওটাই একমাত্র উপযুক্ত জায়গা।'

প্রাইভেট জেটে ওরা উড়ে এল প্যারিসে। ম্যাক্সিমের অসাধারণ সব কোর্স দিয়ে জন্মদিনের ডিনার সেলিব্রেট করল। ঐ রাতেই আবার সুইজারল্যান্ড ফিরে এল। এত চমৎকার সন্ধ্যা জীবনে উপভোগ করেনি এলিজাবেথ। রিজ ওর সঙ্গে অসম্ভব ভালো ব্যবহার করেছে। প্রতিটি মুহূর্ত এলিজাবেথের কাছে অলৌকিক মনে হয়েছে।

রিজ এলিজাবেথকে স্কুলে পৌঁছে দিল। বিদায় নেয়ার সময় এলিজাবেথের মুখ রাঙা হল কথা বলতে গিয়ে, 'আমি—আমি ঠিক জানি না কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব। আমি এত সুন্দর সময় কখনও কারো সঙ্গে কাটাইনি, মি. রিজ।'

'ধন্যবাদটা তোমার বাবার প্রাপ্য।' হাসল রিজ। 'এ সমস্ত তারই প্ল্যান।'

কিন্তু এলিজাবেথ কথাটা বিশ্বাস করল না।

রিজ চলে যাওয়ার পর থেকে এলিজাবেথের কী যে হল কে জানে, খালি ওর কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হচ্ছে এমন চমৎকার স্বভাবের মানুষ সে জীবনে দেখেনি। আর কী সুন্দর দেখতে রিজ! সেই রাতে সারাক্ষণ শুধু রিজের কথাই ভাবল ও।

অনেক রাতে বিছানা ছেড়ে উঠল এলিজাবেথ। ডেস্কে বসে একটুকরো কাগজ টেনে নিয়ে তাতে গোটা-গোটা অক্ষরে লিখল : 'মিসেস রিজ উইলিয়ামস'। অনেকক্ষণ লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল এলিজাবেথ।

একটা পরিবর্তন আসছে ওর ভেতরে, ধরতে পারছে এলিজাবেথ, কিন্তু পরিবর্তনটার জন্য ওর বাবা নাকি রিজ উইলিয়ামস দায়ী ঠিক বুঝতে পারছে না। আগের মতো যখন-তখন খাওয়াও কমিয়ে দিল। স্লিম হতে শুরু করল শরীর। স্কুলের খেলাধুলা, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজবে এখন সেধেই এলিজাবেথ অংশ নিচ্ছে। ব্যাপারটা প্রথম প্রথম ঠিক বিশ্বাস হতে চাইল না ওর সঙ্গীদের। কারণ ওরা এর আগে অনেকবার এলিজাবেথকে ওদের 'পায়জামা পার্টিতে' অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু প্রতিবারই নানা অজুহাত তুলে ওদেরকে এড়িয়ে গেছে সে। অথচ এবার এলিজাবেথ নিজেই একরাতে কাউকে কিছু না-বলে পায়জামা পার্টিতে হাজির হল।

রুমের মধ্যে চব্বিশ-পঁচিশটি মেয়ে। সবার পরনে পায়জামা কিংবা রোব। এলিজাবেথ ভেতরে ঢুকতেই একটি মেয়ের নজরে পড়ে গেল ও। মেয়েটি চোখ কপালে তুলে বলল, 'দ্যাখো, দ্যাখো কে এসেছে। আমরা কল্পনাও করিনি তুমি আমাদের পার্টিতে আসবে।'

'হ্যাঁ, এলাম তো!' সলাজ হেসে বলল এলিজাবেথ। ওকে ওরা সাগ্রহে টেনে নিল নিজেদের কাছে। সিগারেটের মিষ্টি আর কটু গন্ধের মিশ্রিত ধোঁয়ায় ভরপুর রুম। এলিজাবেথ জানে এখানকার বেশিরভাগ মেয়েই মারিজুয়ানা খায়, কিন্তু ও নিজে কখনও জিনিসটার স্বাদ নেয়নি। রেনে টোকার নামে একটা ফরাসি মেয়ে এগিয়ে এল এলিজাবেথের দিকে। হাতে বাদামি রঙের মোটা একটা সিগারেট। সিগারেটে জোরে একটা টান দিল সে, ধোঁয়াটা এলিজাবেথের দিকে ছুড়ে বলল, 'তুমি সিগারেট খাও?'

'অবশ্যই।' বলল এলিজাবেথ। কথাটা মিথ্যে। সিগারেট তার দুচোখের বিষ, খাওয়া দূরে থাক। কিন্তু নিজেকে ওদের কাছে হালকা করতে মন চাইছে না। রেনে ওর দিকে সিগারেটটা বাড়িয়ে দিল। সিগারেটটা হাতে নিল এলিজাবেথ, এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর ঠোঁটে গুঁজে টান মারল। জ্বলে উঠল ফুসফুস। এলিজাবেথ

টের পেল ওর মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা রেনেকে বুঝতে দিল না ও। চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল মুখে, বলল, 'বাহ্, চমৎকার তো! ধন্যবাদ।'

রেনে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরতেই একটা সোফায় বসে পড়ল এলিজাবেথ। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। কয়েক সেকেন্ড পর ঝিমঝিম ভাবটা চলে গেল। সিগারেটে আরেকটা টান দিল এলিজাবেথ। হঠাৎ মনে হল মাথাটা হালকা ঠেকছে খুব।

এলিজাবেথ মারিজুয়ানা সম্পর্কে অনেক শুনেছে, বইতেও পড়েছে। যারা মারিজুয়ানা খায় তারা আর নিজেদের মধ্যে থাকে না। মনে হয় আলাদা একটা সত্তায় পরিণত হয়েছে। এলিজাবেথ আরেকটা টান মারল সিগারেটে। আগের চেয়েও জোরে। হঠাৎ অনুভব করল শরীরটা যেন শূন্যে ভাসছে, যেন অন্য কোনো গ্রহে চলে এসেছে ও। রুমের মেয়েগুলোকে দেখছে ও, ওদের কথাও শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সবকিছু কেমন অস্পষ্ট ঠেকছে। শব্দগুলো খুব আস্তে হচ্ছে, দূর থেকে ভেসে আসছে। আলোটা এত উজ্জ্বল কেন? চোখ বুজল এলিজাবেথ। মনে হল ও ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত একটা অনুভূতি! স্কুলের ছাদের ওপর থেকে ওর শরীরটা ভেসে যাচ্ছে, উঁচুতে উঠছে, ক্রমশ সাদা মেঘ ওর সারা শরীর ঢেকে ফেলছে। পৃথিবী থেকে কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। ওকে ফিরে আসতে বলছে। খুব বিরক্ত হল এলিজাবেথ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ খুলল। রেনে ঝুঁকে আছে ওর দিকে।

'তুমি ঠিক আছ তো, এলিজাবেথ?'

এলিজাবেথের মুখে খুব ধীরে একটা হাসি ফুটল, অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। জানো, আমি এই প্রথম মারিজুয়ানা খেলাম।'

'মারিজুয়ানা?' রেনে বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল, 'ও তো স্রেফ একটা গলোয়েজ ছিল।'

নুশাতেল গ্রামের অপরপ্রান্তে ছেলেদের স্কুল। এলিজাবেথের ক্লাসমেটরা সুযোগ পেলেই ছেলেদের সঙ্গে মিলিত হয়। এলিজাবেথের সঙ্গে পরে গল্প করে বলে অমুকের লিঙ্গের সাইজ অমুকের চেয়ে এত ইঞ্চি বড় ইত্যাদি ইত্যাদি। ওর ক্লাসমেটদের উদ্দাম যৌনলীলার গল্প শুনতে শুনতে এলিজাবেথের মনে হয় ও বোধহয় ভুলে কোনো নিম্ফোম্যানিয়াকদের রাজ্যে এসে পড়েছে যেখানে শুধুই বিকৃত যৌনতার ছড়াছড়ি। এলিজাবেথদের স্কুলের মেয়েদের একটা প্রিয় খেলা 'ফ্রলেজ'। খেলাটা এরকম—কোনো মেয়ে পুরো ন্যাংটো হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে, তখন আরেকটি মেয়ে এসে তার সুডৌল বুক দিয়ে শুয়ে-থাকা মেয়েটির উরুতে ধাক্কা মারতে থাকে। দশ মিনিট যদি কেউ এই খেলা খেলে তবে বিনিময়ে তাকে একটি পেস্ট্রি উপহার দেয়া হয়। দশ মিনিট এভাবে চলার পর মেয়েটির রেতঃপাত হওয়াই

স্বাভাবিক, কিন্তু যদি না হয় তাহলে খেলাটা পরবর্তী আরো দশমিনিট ধরে চলতে থাকে এবং তাকে আরেকটি পেস্ট্রি উপহার দেয়া হয়।

মেয়েদের আরেকটি উত্তেজক খেলা চলে বাথরুমে। এলিজাবেথদের স্কুলের বাথরুমগুলো বেশ বড়। সবগুলোতেই বাথটাব আর শাওয়ার আছে। ইচ্ছে করলেই শাওয়ার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়। মেয়েরা একটা বাথটাবে বসে শাওয়ার খুলে দেয়। শাওয়ার থেকে ঝরঝর করে পড়তে থাকে গরম জল। ওরা শাওয়ারের মুখটা দুই উরুর মাঝখানে চেপে ধরে আস্তে করে উপরে নিচে ঘষতে থাকে।

এলিজাবেথ এই দুটো খেলার একটাতেও কখনও অংশ নেয়নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও অগ্নিগিরি হয়ে উঠছিল। হঠাৎই একদিন বিস্ফোরণটা ঘটল।

এলিজাবেথদের এক টিচারের নাম শান্তাল হ্যারিয়ট। উনি দেখতে ছোটখাটো, স্লিম ফিগার, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, খুব আকর্ষণীর চেহারা আর দারুণ মিষ্টি হাসেন। এলিজাবেথকে খুব ভালোবাসেন ভদ্রমহিলা। এলিজাবেথও তার টিচারকে খুব পছন্দ করে। ওর মন খারাপ থাকলে সোজা মিস হ্যারিয়টের কাছে চলে যায়। এলিজাবেথ ওর মনের কথা বলে যেন হালকা হয়। মিস হ্যারিয়ট ওর হাতদুটো নিজের হাতে রেখে খুব মনোযোগী শ্রোতার মতো এলিজাবেথের সব সমস্যার কথা শোনেন। ওকে উপদেশ দেন, গরম চকলেট কিংবা কেক খাওয়ান। এলিজাবেথের মন ভালো হয়ে যায়।

এলিজাবেথ বাথটাবে শুয়ে শুয়েও মিস হ্যারিয়টের কথা চিন্তা করে। তার মুখটা ভেসে ওঠে মনের আয়নায়। মিস হ্যারিয়ট ওর হাতদুটো আস্তে আস্তে চাপছেন, আদর করছেন, এই দৃশ্যটা খুব মনে পড়ে।

শুধু বাথরুমেই নয়, অন্য টিচারদের ক্লাসে বসেও এলিজাবেথের মন চলে যায় মিস হ্যারিয়টের কাছে। মনে পড়ে সেই দিনটির কথা যেদিন মিস হ্যারিয়ট ওকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, ওর বুক স্পর্শ করেছিলেন। প্রথম প্রথম এলিজাবেথ ভাবত ওর বুকে অসাবধানে মিস হ্যারিয়টের হাতের ছোঁয়া লাগছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা প্রতিবার একইভাবে ঘটতে লাগল। মিস হ্যারিয়ট ওর দিকে কেমন দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে থাকেন। যেন এলিজাবেথের কাছ থেকে তিনি কিছু প্রত্যাশা করছেন। এলিজাবেথ মিস হ্যারিয়টের কথা ভাবলেই তার নগ্ন শরীর ভেসে ওঠে চোখে। কল্পনায় দেখতে পায় মিস হ্যারিয়টের সুঠাম নগ্ন পা, নিটোল উদ্ধত দুই বুক। মিস হ্যারিয়ট বিছানায় কেমন হবেন ভাবতেই এলিজাবেথের শরীর গরম হয়ে ওঠে। তারপর একদিন হঠাৎ করেই এলিজাবেথ মিস হ্যারিয়টের প্রতি ওর জৈবিক আকর্ষণের মূল কারণ আবিষ্কার করে ফেলল। আসলে ও সমকামী।

সমকামী না হলে ও কেন ছেলেদের প্রতি কখনও আকৃষ্ট হয় না, কেন শুধু মেয়েদের শরীর নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে। কেন মিস হ্যারিয়টের কথা ভাবলেই

রক্তে বান ডাকে। এলিজাবেথ সমকামীদের নিয়ে অনেক বই পড়েছে। জানে এদের জীবন কত ঘৃণিত। সমাজে এদের কোনো ঠাঁই নেই। সমকামিতাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা অপরাধ বলে মনে করে সবাই। কিন্তু এলিজাবেথ ভেবে পায় না সমকামিতায় দোষের কী আছে! একটা মেয়ে যদি আরেকটা মেয়েকে গভীরভাবে ভালোবেসে মিলিত হয়, তাহলে সমাজ কেন এটাকে ঘৃণার চোখে দেখবে, কেন এই ভালোবাসাকে মূল্য দেবে না? প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনের চেয়ে প্রেমময় সমকামিতা কি ভালো নয়?

বাবা যদি কখনও জানতে পারেন তার মেয়ে সমকামী তাহলে কী হবে ভাবতেই ভয়ে কাঠ হয়ে যায় এলিজাবেথ। যাই হোক না কেন ওকে সেই পরিস্থিতির সামাল দিতেই হবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাকে নতুন করে এখনই ভাবতে হবে। অন্য মেয়েদের মতো স্বামী-সন্তানসহ তথাকথিত স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন এলিজাবেথের জীবনে আসবে না, ও তা ভালো করেই জানে। সমাজ থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। তবুও এই জীবন ও মেনে নেবে। ও আর মিস হ্যারিয়ট। একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে কিংবা কোথাও ছোট্ট একটা বাড়ি কিনে একসঙ্গে থাকবে দুজনে। বাড়িটা খুব সুন্দর করে সাজাবে এলিজাবেথ। হয়তো ওর বাবা ওকে কোনো সাহায্য করতে চাইবেন না। এলিজাবেথ বাপের কাছ থেকে কোনো সাহায্য প্রত্যাশাও করে না। হয়তো বাবা এত রেগে যাবেন যে ওর সঙ্গে আর কথাই বলবেন না। অবশ্য তাতেও এলিজাবেথের কিছু আসবে যাবে না। ও মিস হ্যারিয়টকে নিয়ে সুখী হতে পারলেই হল।

একরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল এলিজাবেথ। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কেউ ভেতরে ঢুকেছে। চোখ মেলে চাইল এলিজাবেথ। হালকা চাঁদের আলো রুমের মধ্যে। একটা ছায়া এগিয়ে আসছে ওর দিকে। একদম বিছানার কাছে চলে এসেছে ছায়ামূর্তি। চাঁদের আলোয় তার মুখটা দেখতে পেল এলিজাবেথ। মিস হ্যারিয়ট! মুহূর্তে হার্টবিট বেড়ে গেল এলিজাবেথের। দমাদম হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল বুকে।

মিস হ্যারিয়ট ফিসফিস করে ডাকলেন, 'এলিজাবেথ।' এলিজাবেথ সাড়া দিল না। মিস হ্যারিয়ট সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ঝুপ করে শরীর থেকে খসে পড়ল নাইট গাউন। ভেতরে কিছু পরা নেই তাঁর। এলিজাবেথের গলা শুকিয়ে এল। এই মুহূর্তটির জন্য সে বহুবার অপেক্ষা করেছে। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে ভাবতেই কেমন আতঙ্ক বোধ করল এলিজাবেথ। ওর ভালোবাসার মানুষ ওর সামনে দাঁড়িয়ে। কী করবে, কী বলবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না এলিজাবেথ।

'আমার দিকে তাকাও'—খসখসে কণ্ঠে হুকুম করলেন মিস হ্যারিয়ট। এলিজাবেথ তাকাল। ওর চোখ সারাশরীর ঘুরে এল। কল্পনায় এতদিন যে শরীর

দেখে এসেছে এলিজাবেথ, তার সঙ্গে সামনে দাঁড়ানো এই শরীরের কিছুই মিলছে না। মিস হ্যারিয়টের বুক খুবই ছোট। তাও আবার নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। তলপেট উঁচু আর তার নিচের জায়গাটা দেখে মোটেই শিহরিত হতে পারল না এলিজাবেথ।

'ঘোরো এলিজাবেথ, আমাকে শুতে দাও।' ফিসফিসে গলায় নির্দেশ এল।

এলিজাবেথ সরল। মিস হ্যারিয়ট ওর পাশে শুয়ে পড়লেন। কটু একটা গন্ধ এসে ধাক্কা মারল এলিজাবেথের নাকে। মিস হ্যারিয়ট ঘুরলেন এলিজাবেথের দিকে, হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন, 'উহ্ চেরি, আমি এই মুহূর্তটির জন্য কতকাল অপেক্ষা করেছি।' বলে এলিজাবেথের ঠোঁটে চুমু খেলেন তিনি, জোর করে জিভ ঢুকিয়ে দিলেন ওর মুখে। গোঙানি বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁর মুখ থেকে।

এলিজাবেথের গা ঘৃণায় রি রি করে উঠল। এমন জঘন্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওর আগে কখনও পরিচয় হয়নি। কাঠ হয়ে পড়ে রইল ও বিছানায়। মিস হ্যারিয়টের খসখসে আঙুল এলিজাবেথের সারা শরীর ঘুরছে, ওর বুক টিপছে, পেট বেয়ে নেমে যাচ্ছে দুই ঊরুর মাঝখানে। পশুর মতো নির্দয়ভাবে তিনি সারাক্ষণ এলিজাবেথের কমলাকোয়া অধর চুষেই চললেন।

এই! এই জঘন্য অভিজ্ঞতার জন্য আমি এতদিন ব্যাকুল ছিলাম, এই কুৎসিত মহিলাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম! ভাবতেই কান্না পেয়ে গেল এলিজাবেথের। টের পেল মিস হ্যারিয়টের আঙুল ওর দুই ঊরুর ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। প্রাণপণে ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল এলিজাবেথ। ভাবতে চাইল মিস হ্যারিয়টকে নিয়ে স্বপ্নে দেখা সব স্মৃতি নিয়ে। কিন্তু মনে পড়ল না একটাও। শুধু মনে হল ওকে যেন মিস হ্যারিয়ট ধর্ষণ করছেন।

মিস হ্যারিয়ট গুঙিয়ে উঠলেন, 'ওহ্ চেরি, আই ওয়ান্ট টু ফাক ইউ।'

হঠাৎ কেঁদে উঠল এলিজাবেথ, তারপর হাসতে লাগল। ও কাঁদছে কারণ মিস হ্যারিয়টকে নিয়ে ওর সব সুখস্মৃতির এমন অপমৃত্যু হল বলে। ও হাসছে কারণ বুঝতে পেরেছে ও আসলে সমকামী নয়, আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতোই স্বাভাবিক যৌনচেতনার অধিকারী সে।

তার পরদিনই এলিজাবেথ বাথরুমে ঢুকে একা একা মেয়েদের শাওয়ার নিয়ে খেলাটা খেলল এবং তৃপ্তি পেল।

তেরো

আঠারো বছরে পা রাখল এলিজাবেথ। এ বছরই স্কুলের পাট চুকাতে যাচ্ছে ও। ইস্টারের ছুটিতে বাড়ি এল এলিজাবেথ। সার্ডিনিয়ায়। গাড়ি চালাতে শিখল। তারপর নিজে নিজে ঘুরে দেখল পুরো দ্বীপ। সাগরতীর ধরে গাড়ি চালিয়ে জেলেদের ছোট্ট গ্রামগুলো দেখল ও। প্রাণভরে সমুদ্রস্নান করল উজ্জ্বল সূর্যের নিচে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুনল পাহাড় থেকে ভেসে আসা অপার্থিব সংগীত, টেম্পিও গ্রামের লোকদের সঙ্গে তাদের বিশেষ উৎসবে জাতীয় পোশাক পরে নাচল এলিজাবেথ। পুন্টামুরা গ্রামে গিয়ে দেখল খোলামাঠে কেমন করে গ্রামবাসীরা আস্ত ভেড়া রোস্ট করে। গ্রামবাসীরা 'সিদা' খেতে দিল। জিনিসটা ছাগলের দুধ থেকে তৈরি। পনির আর গরম মধু মিশিয়ে খেতে হয়। এলিজাবেথকে ওরা 'সেলেমেন্ত' নামের খুবই দুষ্প্রাপ্য সাদা একটি পানীয় পান করতে দিল। এলিজাবেথ পর্তো কার্ভোতে রেডলায়ন ইন-এ প্রায়ই যেতে লাগল। পুরোনো আমলের এই বারটিকে ওর খুবই ভালো লাগে।

এলিজাবেথের সঙ্গে টাইম অভ দ্য বয়েজের পরিচয় হল। এরা সবাই ধনীর দুলাল, এলিজাবেথকে আমন্ত্রণ জানাল ওদের সুইমিং আর রাইডিং পার্টিতে। ওর বাবা ওকে যেতে দিলেন। বললেন, 'ওরা তোমার উপযুক্ত।'

কিন্তু ওদের ভালো লাগল না এলিজাবেথের। প্রত্যেকটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ওর সঙ্গে নষ্টামি করতে চাইল। কারণ ওরা কীভাবে যেন জেনে গেছে এলিজাবেথ এখনও কুমারী। কে এলিজাবেথের কুমারিত্ব হরণ করবে এই নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। প্রত্যেকেই এলিজাবেথকে এসে প্রস্তাব দিল, 'চলো, বিছানায় যাই।' সবাইকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল এলিজাবেথ। কিন্তু হাল ছাড়ল না ওরা। এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা হতেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। আর এলিজাবেথ প্রতিবারই ওদের হতাশ করল।

এদের কথা ভেবে হাসি পায় এলিজাবেথের। ওদের ধারণা সুন্দরী মেয়ে মানেই বোকা। এদের একটু পটালেই বিছানায় নিয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপারই না। এই বোকা ছেলেগুলোকে এলিজাবেথ বরং করুণাই করে। আসলে বাবাকে খুশি করার

জন্য ও এই ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু ওরা ওকে বিরক্তির চরম সীমানায় নিয়ে গেছে।

একদিন হঠাৎ করেই রিজ উইলিয়ামস এল সার্ডিনিয়ার বাড়িতে। ওকে দেখেই খুশিতে মন ভরে গেল এলিজাবেথের। অবাক হয়ে ভাবল : ওকে দেখে আমার এত ভালো লাগছে কেন? রিজকে আগের চেয়েও হ্যান্ডসাম আর আকর্ষণীয় মনে হল।

রিজ ওকে দেখে হাসল, 'তোমার বেশ পরিবর্তন দেখছি, এলিজাবেথ।'

'কেমন পরিবর্তন?' জানতে চাইল এলিজাবেথ।

'আয়নায় নিজের চেহারা দেখেছ ইদানীং?'

লজ্জা পেল এলিজাবেথ। 'না।'

স্যামের দিকে ঘুরল রিজ। বলল, 'লিজ দিনদিন যেমন সুন্দরী হয়ে উঠছে তাতে আমার মনে হচ্ছে ওকে আমরা শিগগিরই হারাব, মি. স্যাম।'

লাল হয়ে উঠল এলিজাবেথের মুখ। অদ্ভুত এক ভালোলাগায় আচ্ছন্ন হল মন। রিজের দিকে গভীর চোখে চাইল ও। রিজ ওকে চমৎকার একটি হাসি উপহার দিল। কী সুন্দর হাসে ও! মুগ্ধ হয়ে ভাবল এলিজাবেথ।

একদিন স্যাম রোফ টাওয়ার-রুমে বসে কাজ করছেন, রিজ এসে এলিজাবেথকে বলল, 'চলো আমরা লাঞ্চ করে আসি।' রাজি হয়ে গেল এলিজাবেথ। রিজ ওকে নিয়ে রেড লায়নে চলে এল। ওর প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছে এলিজাবেথ। আর মুগ্ধ হচ্ছে। সবার সঙ্গে কী চমৎকার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার রিজের। এই লোক পৃথিবীর সবখানে খুব সহজে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে : ভাবে এলিজাবেথ। ওরা কোনার ধারে এক টেবিলে বসল। রিজ ওর স্কুলের প্রসঙ্গ তুলল। জানতে চাইল কেমন লাগছে ওখানে।

'খারাপ না', বলল এলিজাবেথ। 'আমি আসলে কত কম জানি সেটা এখন বুঝতে পারছি।'

হাসল রিজ। 'খুব কম লোকেই এই জিনিসটা বুঝতে পারে। যাকগে, তুমি তো এই জুনেই স্কুলের পাট চুকিয়ে ফেলছ, না?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর কী করবে ভেবেছ কিছু?'

এই প্রশ্নটা নিজেকে বহুবার করেছে এলিজাবেথ। কিন্তু মনস্থির করতে পারেনি কিছু। সত্যি কথাটাই বলল ও, 'না, তেমন কিছু ভাবিনি।'

'বিয়েশাদি করার ইচ্ছে আছে?'

এক সেকেন্ডের জন্য এলিজাবেথের মনে হল ওর হার্ট একটা বিট মিস করল। পরমুহূর্ত বুঝল এটা স্রেফ একটা কথার কথা। ও হেসে বলল, 'এখনও মনের মতো কাউকে পাইনি।' মিস হ্যারিয়টের কথা মনে পড়ল ওর। তাকে নিয়ে মোমবাতির আলোতে ডিনার করার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই জোরে হেসে উঠল।

'বলা যাবে না?'

'বলা যাবে না।' কথাটা বলেই এলিজাবেথের ইচ্ছে করল সব কথা খুলে বলে সে রিজকে। কিন্তু রিজকে সে আসলে কতটুকু চেনে? এই হ্যান্ডসাম, আমুদে লোকটিকে আসলে তো সে ভালো করে জানেই না। বাবার কাছে শুনেছে ব্যবসায় অসাধারণ সাফ মাথা রিজের। কিন্তু সে রিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আসলেই কি এই লোকটিকে কেউ চিনতে পেরেছে! মনে-মনে ভাবল এলিজাবেথ।

এলিজাবেথ কুমারী। কিন্তু কৌমার্য সযত্নে লুকিয়ে রেখে শরীরকে কষ্ট দেয়ার মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়ে সে নয়। যৌনসঙ্গমের ব্যাপারটা তার কাছে অস্পষ্ট নয়, কিন্তু স্বাদটা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ওর প্রচণ্ড কৌতূহল রয়েছে ব্যাপারটা সম্পর্কে। জিনিসটা অম্ল নাকি মধুর জানতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু চাইলেই যারতার সঙ্গে সে নিশ্চয়ই বিছানায় যেতে পারে না। এমন কারো সঙ্গে সে বিছানায় যেতে চায় যে পুরো ব্যাপারটা তার জন্য উপভোগ্য করে তুলবে। জীবনের প্রথম যৌন-অভিজ্ঞতা সে প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে উপভোগ করতে চায়।

শনিবারের এক রাতে এলিজাবেথের বাবা ওদের বাড়িতে বিশাল এক পার্টি দিলেন।

'তোমার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটা তুমি পরবে', রিজ এলিজাবেথকে বলল, 'আমি সবার চোখ কানা করে দেব।'

রোমাঞ্চ অনুভব করল এলিজাবেথ। ধরে নিল আজ রাতেই রিজের সঙ্গে ডেট করতে যাচ্ছে ও। রিজ পার্টিতে এল। সঙ্গে এক সুন্দরী ইতালিয়ান রাজকুমারী। প্রচণ্ড রাগ হল এলিজাবেথের, অভিমানে চোখ ফেটে জল এল। যেন প্রতিশোধ নেয়ার বাসনাতেই রিজকে দেখিয়ে এক মাতাল রাশিয়ান চিত্রকরকে নিয়ে ও নিজের বেডরুমে ঢুকল।

পুরো ব্যাপারটাই বিশ্রীরকমভাবে শুরু এবং শেষ হল। এলিজাবেথ এত নার্ভাস ছিল আর রাশিয়ান লোকটা এত মাতাল ছিল যে এলিজাবেথের মনে হল যে ব্যাপারটার আসলে কোনো শুরু। বিরতি কিংবা শেষ নেই। ভাসিলভ তার প্যান্ট খুলেই ধপাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। এলিজাবেথের ইচ্ছে হল পালিয়ে যায়, কিন্তু রিজের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তাহলে দেয়া হবে না। নগ্ন হল ও, হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল বিছানায়। পরমুহূর্তে ওকে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে, একটুও আদর না করে ভাসিলভ ওর শরীরের ওপর চড়াও হল। মোটেও মজা পেল না এলিজাবেথ। এক মিনিট পরই প্রবল বেগে ভাসিলভের শরীর নড়তে লাগল, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও এলিজাবেথের বুকের ওপর। নিজেকে বিধ্বস্ত লাগল এলিজাবেথের। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এই ব্যাপারটা নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর গল্প আর কবিতা ও

পড়েছে বইতে। তৃপ্তি পাওয়া দূরের কথা, ঘৃণা লাগছে রীতিমতো। রিজের কথা মনে পড়ল ওর, কাঁদতে ইচ্ছে করল। আস্তে বিছানা ছেড়ে নামল এলিজাবেথ। কাপড় পরল, তারপর বেরিয়ে গেল রুম থেকে। পরদিন ভাসিলভ ফোন করল এলিজাবেথের কাছে। এলিজাবেথ চাকরানীকে বলল, 'বলে দাও আমি বাসায় নেই।' ঐদিনই সে ফিরে গেল তার স্কুলে।

স্কুলের শেষ ক'টা মাস খুব দ্রুত ফুরিয়ে এল। এলিজাবেথ এখন প্রায়ই নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। রিজের কথা মনে পড়ে ওর। রিজ জানতে চেয়েছিল স্কুলের পাট চোকাবার পর সে কী করবে। এলিজাবেথ এখনও এ-ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি। বুড়ো স্যামুয়েলের কথা ওর মনে পড়ে, অনুপ্রেরণা পায়। ভাবে ওদের এই পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে পড়লেও মন্দ হয় না। কী যে করবে সেটাই আসলে ঠিক করতে পারছে না ও। হয়তো দেখা গেল শেষপর্যন্ত ও ওর বাবাকে ব্যবসার কাজেই সাহায্য করছে। মা যেভাবে বাবাকে সাহায্য করতেন, সেভাবে। কে জানে হয়তো ভবিষ্যতে সে মায়ের জায়গাটাই দখল করবে। মা যেমন তার স্বামীর এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছিলেন, এলিজাবেথও তেমনি তার বাবার ডান হাত হতে পারলে হয়তো ভালোই লাগবে। তবে সময় আসুক তারপর দেখা যাবে।

চৌদ্দ

সুইডিশ রাষ্ট্রদূতের খোলা হাত এলিজাবেথের নিতম্বে চাপ দিচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝেও না-বোঝার ভান করছে এলিজাবেথ। ওর ঠোঁট হাসছে, নাচের তালে তালে চোখদুটো ঘুরে বেড়াচ্ছে দামি-পোশাক-পরা অভিজাত অতিথিদের মধ্যে। তকমা আঁটা চাপরাশিদের ছোটাছুটি, বুফে ডিনার আর উৎকৃষ্ট মদের ঢালাও পরিবেশনায় কোথাও কোনো খুঁত নেই। সন্তুষ্ট বোধ করছে এলিজাবেথ। পার্টি বেশ ভালো চলছে।

লং আইল্যান্ডের এস্টেটের বলরুমে চলছে পার্টি। উপস্থিত দুশো অতিথির সবাই রোফ অ্যান্ড সন্সের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলিজাবেথ টের পাচ্ছে সুইডিশ রাষ্ট্রদূত নাচের তালে সুযোগ বুঝে তার শরীর চেপে ধরছেন ওর গায়ে। কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন তিনি, ফিসফিস করে বললেন, 'আপনি খুব সুন্দর নাচেন, মিস এলিজাবেথ।'

'আপনিও', হাসিমুখে বলল এলিজাবেথ, তারপর হঠাৎ করেই ও একটা ভুল স্টেপ দিয়ে ফেলল, ওর হাইহিলের সুচের মতো ডগা নেমে এল রাষ্ট্রদূতের পায়ের ওপর। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি, তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাইল এলিজাবেথ, 'স্যরি অ্যামবাসাডর, এক্সট্রিমলি স্যরি। একটু দাঁড়ান, আপনার জন্য একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি আমি।'

রাষ্ট্রদূতকে ছেড়ে এলিজাবেথ ভিড়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দে পথ করে এগিয়ে চলল বারের দিকে। ওর চোখ বলরুমের প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছে। কোথাও কোনো ছন্দপতন নেই। সব ঠিক আছে, আবারও সন্তুষ্ট বোধ করল এলিজাবেথ।

সব কিছু নিখুঁত হওয়া চাই—এলিজাবেথের বাবার এটাই একমাত্র দাবি। এলিজাবেথ এ-পর্যন্ত বাবার নির্দেশমতো অনেকগুলো পার্টির ব্যবস্থা করেছে। প্রতিটি পার্টিতেই তাকে টেনশনে থাকতে হয়। কোথাও ভুলচুক হয়ে গেল কি না এ-ভয় কাজ করে মনে। বাবার খুব কাছাকাছি হওয়ার যে-স্বপ্ন সে আশৈশব লালন করে এসেছে, সেই স্বপ্ন এখন সত্যি হয়েছে। মায়ের শূন্যস্থান তো পূরণ করেছেই বরং মায়ের চেয়েও অনেক বেশি সে বাবাকে দিচ্ছে। বাবার সঙ্গে এলিজাবেথ বিভিন্ন বিজনেস কনফারেন্সগুলোতে অ্যাটেন্ড করছে; বিভিন্ন অ্যামবাসি, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি জায়গাগুলোতে যাচ্ছে; গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে বাবার প্রাণপ্রাচুর্য আর

শক্তি। কী অদ্ভুত দক্ষতায় তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন। এই সাম্রাজ্যের তিনিই মুকুটহীন সম্রাট, একথা ভাবলেই গর্ববোধ করে এলিজাবেথ।

বারের কাছে বাবাকে চোখে পড়ল এলিজাবেথের। রিজ, একজন প্রধানমন্ত্রী আর ক্যালিফোর্নিয়ার এক সিনেটরের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। বাপের সঙ্গে চোখাচোখি হল কন্যার। স্যাম মাথা ঝাঁকালেন, এগিয়ে গেল এলিজাবেথ তাঁর দিকে। ওর মনে পড়ে গেল তিন বছর আগের সেই দিনটিকে, যখন প্রথম সে এই জগতে পা রাখে। মাত্র গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে সে তখন।

গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরদিনই এলিজাবেথ ম্যানহাটানে ওদের বিকম্যান প্লেসের বাড়িতে চলে এল। রিজকে বাবার সঙ্গে দেখে একটুও অবাক হল না। যেন ধরেই রেখেছিল রিজকে এখানে দেখবে সে। পনেরো বছর বয়সে যে-মানুষটি ওর বুকে ঢেউ তুলেছিল এই আঠারোতে এসে সে এখন রীতিমতো তুফান তুলেছে। রিজকে ছাড়া এলিজাবেথ এখন কোনোকিছুই ভাবতে পারে না। স্কুলে কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে শুধু ওর গোপন ভালোবাসাকে স্মরণ করে। ও যখন পঞ্চদশী তখন রিজের বয়স পঁচিশ। রিজকে একান্ত করে পাবার ভাবনাটা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকত এলিজাবেথের। কিন্তু আঠারো বছরে পা দিয়ে কোনোকিছুই আর অবিশ্বাস্য মনে হয় না। মনে হয় খুব গভীরভাবে কাউকে কামনা করলে একদিন-না-একদিন তাকে পাওয়া যাবেই।

এলিজাবেথ লাইব্রেরিতে ঢুকল। স্যাম রোফ ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছিলেন, এলিজাবেথকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই এলে নাকি?'

'জ্বি।'

'অ। স্কুলজীবন তাহলে শেষ?'

'জ্বি।'

'ভালো। খুব ভালো।'

রিজ এলিজাবেথের দিকে এগিয়ে এল। হাসছে।

'তোমাকে খুব সুখী-সুখী লাগছে, লিজ। রেজাল্ট কী তোমার? স্যাম তোমাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু সময় করে উঠতে পারেননি, বোঝোই তো!'

বাবা যা জিজ্ঞেস করেননি বা করার প্রয়োজন বোধ করেননি, রিজ সেই প্রশ্নগুলো করল এলিজাবেথকে, খুঁটে খুঁটে সব জানতে চাইল।

এলিজাবেথের খুব অভিমান হল ওর বাবার ওপর। এতদিন পর স্কুলজীবনের পাট চুকিয়ে এসেছে ও, কই তিনি তো একবারও ভালো করে কিছু জানতে চাইলেন না। তিনি সবসময় আছেন নিজের ব্যবসা নিয়ে। এলিজাবেথ যেন তার কেউ না। এলিজাবেথ রিজের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, চলে যাচ্ছে। বাধা দিল ওকে রিজ। 'এক মিনিট', ঘুরল ও স্যামের দিকে।

'স্যাম, লিজ কিন্তু মোক্ষম একটা সময়ে এসে পড়েছে। শনিবার রাতের পার্টিতে ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

স্যাম তার মেয়ের দিকে তাকালেন। যেন ওকে পর্যবেক্ষণ করছেন নতুন দৃষ্টিতে। এলিজাবেথের চেহারা অনেকটা ওর মায়ের মতো। মায়ের মতোই রূপ পেয়েছে মেয়ে। চেহারায় সেই অসাধারণ আভিজাত্য। স্যাম আগ্রহ বোধ করলেন। মেয়ে যে রোফ অ্যান্ড সন্সের জন্য একটা অ্যাসেট হয়ে উঠতে পারে এই চিন্তা কখনও মাথায় আসেনি তার।

'তোমার কোনো ভালো পোশাক আছে পার্টিতে পরার মতো?' জানতে চাইলেন তিনি।

এলিজাবেথ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল ওর বাবার দিকে। 'আমি—'

'ঠিক আছে, না-থাকলেও ক্ষতি নেই। যাও, সুন্দর দেখে একটা পোশাক কিনে নিয়ে এসো। তুমি জানো কীভাবে পার্টি দিতে হয়?'

এলিজাবেথ ঢোক গিলল, বলল, 'হ্যাঁ, জানি।'

'চমৎকার। আমি সৌদি আরবের কিছু লোককে নিমন্ত্রণ করেছি। ওরা প্রায়—' রিজের দিকে ঘুরলেন তিনি। রিজ হাসিমুখে বলল, 'প্রায় চল্লিশজনের মতো হবে।'

'ঠিক আছে। কোনো অসুবিধে হবে না। আমার ওপর তুমি সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিতে পারো বাবা।' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল এলিজাবেথ।

কিন্তু পার্টি দিতে গিয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিল এলিজাবেথ।

এলিজাবেথ শেফকে বলেছিল প্রথম কোর্স হিসেবে কাঁকড়ার ককটেল পরিবেশন করতে। তারপর ক্যাজুলেট পরিবেশন করবে মদসহ। কিন্তু ক্যাজুলেটে শুয়োরের মাংস ছিল বলে আরবদের কেউ ওটা খেলেন না, কাঁকড়াও না। আর কেউই মদের পাত্র স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না। সবাই শুধু বিস্ফারিত চোখে খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, খেলেন না কিছুই। এলিজাবেথ লম্বা টেবিলটার একেবারে মাথায় বসেছিল। ভয়ে আর লজ্জায় ওর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

রিজ উইলিয়ামস রক্ষা করল এলিজাবেথকে। স্টাডিরুমে কয়েক মিনিটের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কার সঙ্গে যেন ফোনে কী কথা বলল, তারপর ফিরে এল ডাইনিং রুমে। এসে অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে উঠল। কর্মচারীরা তখন টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করেছে।

কয়েক মিনিট পর ভোজবাজির মতো ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল। বড় বড় ডিশ হাতে কর্মচারীরা ডাইনিংরুমে ঢুকতে লাগল। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অতি অল্প সময়ে নতুন করে টেবিল সাজিয়ে ফেলল। সুস্বাদু রোস্ট, পোলাও, মাছের কারি, মিষ্টি, পনির আর তাজা ফলে বিশাল টেবিল ভরে উঠল। এলিজাবেথ ছাড়া আর সবাই খাবারগুলো উপভোগ করলেন। ও এত আপসেট হয়ে পড়েছিল যে এক গরাস খাবারও গিলতে পারল না। যতবার রিজের চোখে চোখ পড়ল, দেখল হাসছে রিজ।

অতিথিরা সবাই চলে যাওয়ার পর প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল এলিজাবেথ। ড্রইংরুমে এখন শুধু রিজ, স্যাম আর সে। রিজ গ্লাসে ব্রান্ডি ঢালছে, বুক ভরে শ্বাস টানল এলিজাবেথ, ঘুরে দাঁড়াল বাপের দিকে, ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলতে শুরু করল, 'আজকের ঘটনার জন্য আমি খুবই দুঃখিত, বাবা। যদি রিজ না থাকত— '

বাধা দিলেন স্যাম, বললেন, 'এ নিয়ে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আগামীতে তুমি নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো করবে।'

স্যাম ঠিকই ধরেছিলেন। এরপর থেকে চারজন হোক আর চারশো জনের পার্টিই হোক, এলিজাবেথ খুব সতর্কভাবে আগে অতিথিদের পছন্দ-অপছন্দের কথা জেনে নিত। সেইভাবে ব্যবস্থা করত। অতিথিরা তাদের প্রিয় ব্রান্ডের সিগারেট কিংবা পানীয় অথবা পছন্দের কোনো খাবার পরিপাটি করে সাজানো দেখে খুব খুশি হতেন।

রিজ বেশিরভাগ পার্টিতে হাজির থাকে। আর সব পার্টিতেই ওর চারদিকে ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তোলে সুন্দরী মেয়েরা। এলিজাবেথ এদেরকে দুচোখে দেখতে পারে না। রিজের মন পাবার জন্য সে কী না করে। রিজের বান্ধবীরা যে-ধরনের চুলের স্টাইল করে এলিজাবেথও সেই স্টাইলে চুল বাঁধে। ওরা যেরকম পোশাক পরে এলিজাবেথও পার্টিতে সেইরকম পোশাক পরে অতিথিদের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু এত কিছুর পরেও কাজ হয় না। রিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয় এলিজাবেথ। শেষে হতাশ হয়ে ঠিক করে এখন থেকে কাউকে অনুকরণ করবে না সে, নিজের মতো চলবে।

একুশতম জন্মদিনের সকালে এলিজাবেথ বাপের সঙ্গে নাস্তা করছে। স্যাম বললেন, "আজ রাতে নাটক দেখতে যাব। তুমি টিকেট কেনার ব্যবস্থা করো। নাটক দেখে 'টুয়েন্টি ওয়ান'-এ ডিনার করব।"

এলিজাবেথ ভাবল বাবা বুঝি জন্মদিনের কথা মনে করে দিনটা সেলিব্রেট করতে যাচ্ছেন। খুশি হয়ে উঠল সে। কিন্তু স্যাম বললেন, 'বারোটা টিকেট করবে। আমার বারোজন গেস্ট আসছে। ওরা আমাকে বলিভিয়ার কন্ট্রাক্টটা পাইয়ে দেবে।'

ভেতরে ভেতরে হতাশ হল এলিজাবেথ। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। বাবাকে ইচ্ছে করল বলে আজ ওর একুশতম জন্মদিন। কিন্তু বলল না। জন্মদিনের শুভেচ্ছা হিসেবে প্রাক্তন স্কুলের বন্ধুদের কাছে থেকে ও শুভেচ্ছা-কার্ড পেল। ব্যস্‌, এই-ই। সন্ধ্যা ছ'টার দিকে বিশাল এক ফুলের তোড়া এসে হাজির হল। এলিজাবেথ নিশ্চিত ছিল এটা বাবা ওকে পাঠিয়েছেন। কার্ডটা পড়ল ও : 'হোয়াট আ লাভলি ডে ফর আ লাভলি লেডি'; নিচে সাইন করা— 'রিজ'।

স্যাম রোফ সন্ধ্যা সাতটায় বাসা থেকে বেরুলেন নাটক দেখবেন বলে। ফুলগুলো চোখে পড়ল তার। অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'ফুলের তোড়া পেয়েছ তুমি অ্যাঁ?'

এলিজাবেথের বলতে ইচ্ছে করল এটা ওর জন্মদিনের উপহার। কিন্তু বলে কী হবে? সবচেয়ে আপনজনকেও যদি মনে করিয়ে দিতে হয় আজ তোমার জন্মদিন, তাহলে সেই জন্মদিনের সার্থকতা কোথায়? এলিজাবেথ চুপ করে রইল। স্যাম বেরিয়ে গেলেন। এত লম্বা সন্ধ্যাটা এখন ও কীভাবে কাটায়? একুশ বছর বয়স ওর কাছে সবসময়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আজ প্রকৃত অর্থে ও বড় হল, স্বাধীনতা পেল, নারী হয়ে উঠল। আজ সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত একুশ বছর, অথচ দিনটি এমন একঘেয়ে হয়ে উঠবে তা কে জানত? বাবা ওর জন্মদিনের কথা একবারের জন্যও মনে করলেন না কেন? ও মেয়ে বলেই কি? ভাবতেই কান্না পেল এলিজাবেথের। চুপচাপ রুমে বসে রইল ও। বাটলার এল রাতের খাবারের কথা বলতে। কিন্তু এলিজাবেথের একটুও খিদে নেই; খুব খারাপ লাগছে ওর, নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছে।

রাত দশটার দিকে একটা নাইটগাউন পরে লিভিংরুমে ফায়ার প্লেসের সামনে অন্ধকারে মন খারাপ করে বসে আছে এলিজাবেথ। হঠাৎ একটা কণ্ঠ চমকে দিল ওকে, 'শুভ জন্মদিন।'

ঘরের ভেতর আলো জ্বলে উঠল। দাঁড়িয়ে আছে রিজ উইলিয়ামস। এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে এলিয়ে এল সে, 'উঁহুঁ, এভাবে একা একা জন্মদিন পালন করা ঠিক হচ্ছে না। একুশ বছর মানুষের জীবনে বারবার আসে না।'

'আ-আমি ভেবেছিলাম তুমি আজ রাতে আমার বাবার সঙ্গে থাকবে।' ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জায় লাল হল এলিজাবেথ।

'ছিলাম। উনি বললেন তুমি একা পড়ে আছ বাড়িতে, তাই চলে এলাম। এখন ঝটপট উঠে পোশাক পরে নাও তো। আমরা ডিনার করতে যাব।'

এলিজাবেথ এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল। 'ধন্যবাদ রিজ। কিন্তু আমি যাব না। আ-আমার আসলে তেমন খিদে পায়নি।'

'আমার পেয়েছে এবং একা-একা খেতে আমার একদম ভালো লাগে না। তোমাকে আমি পোশাক পরার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। নইলে কিন্তু এই পোশাকেই বাইরে নিয়ে যাব।'

লং আইল্যান্ডে ডিনার করল ওরা। এলিজাবেথ খেতে-খেতে ভাবল ম্যাক্সিমের চেয়ে এখানে খেতেই ওর বেশি ভালো লাগছে। রিজ সারাক্ষণ ওকে গল্পে মাতিয়ে রাখল। এলিজাবেথ এখন বুঝতে পারছে মেয়েমহলে রিজ এত জনপ্রিয় কেন। এ শুধু ওর মারাত্মক চাউনির জন্য নয়, আসল কথা হচ্ছে মেয়েদের জন্য ও সত্যি অনুভব করে, তাদের সঙ্গে কথা বলে সেও আনন্দ পায়। এলিজাবেথের সঙ্গে ও আশ্চর্য ভালো ব্যবহার করল। এমনভাবে আচরণ করল যেন এলিজাবেথের চেয়ে প্রিয় ওর কাছে আর কেউ নয়। এভাবে মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে মেয়েরা যে ওর

প্রেমে পড়ে যাবে তাতে আর বিচিত্র কী! মুগ্ধ হয়ে ভাবল এলিজাবেথ। নিজের জন্য ওর ব্যাকুলতা যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল। মনে-মনে ও বারবার বলতে লাগল : কবে, কবে তুমি বুঝবে তোমাকে কী গভীর ভালোবাসি আমি!

পরবর্তী তিন বছরে স্যাম রোফের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল এলিজাবেথ। স্যাম এলিজাবেথের কাছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরামর্শ পর্যন্ত চাইতে লাগলেন। এলিজাবেথ বাপকে কখনও নতুন ফ্যাক্টরি খোলার জন্য পরামর্শ দেয়, কখনওবা একটি ফ্যাক্টরি। যেটা স্যাম বন্ধ করে দেবেন বলে ভাবছেন সেটা খোলা রাখার জন্য তাকে অনুরোধ জানায়। বিজনেস মিটিঙের পর স্যাম মেয়ের কাছে জানতে চান অমুক লোকটাকে তার কেমন লেগেছে, কিংবা ব্যাখ্যা করেন অমুকের সঙ্গে তিনি কেন ওরকম আচরণ করলেন। বাবার প্রতিটি আচার-আচরণ এলিজাবেথ গভীরভাবে লক্ষ্য করে। বাবাকে ওর প্রেসিডেন্টের মতো মনে হয়। একদিন সে মুখ ফুটে বলেই ফেলে কথাটা, 'বাবা, আমার মনে হয়, মনে হয় তুমি যেন একটা দেশ চালাচ্ছ।'

গর্বিত হাসি হাসেন স্যাম। বলেন, 'আমাদের রোফ অ্যান্ড সন্সের যা আয় তা দিয়ে বিশ্বের অনেক দেশ চালানো কোনো ব্যাপারই না।'

বাবার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েই এলিজাবেথের পরিচয় হয় রোফ-পরিবারের সঙ্গে, ওর কাজিন এবং তাদের স্বামী কিংবা স্ত্রীদের সঙ্গে। ছোটবেলায় এলিজাবেথ দেখেছে ছুটির দিনগুলোতে ওর এই আত্মীয়রা বাবার বাড়িতে আসছেন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছুটিগুলো সে এদের কারো কারো বাড়িতে কাটিয়েছে।

সিমোনেটা আর ইভো পালাজিকে সবচেয়ে মজার মানুষ মনে হয় এলিজাবেথের। এরা ভীষণ খোলামেলা আর বন্ধুবৎসল। ইভো সেই ছোটবেলা থেকেই ওকে খুব ভালোবাসে। রোফ অ্যান্ড সন্সের ইতালির শাখার দায়িত্বে আছে সে। খুব ভালো কাজ দেখাচ্ছে। লোকজনের সঙ্গে ইভো খুব ফ্রি। আর ওর এই ফ্রিনেস সবচেয়ে ভালো লাগে এলিজাবেথের।

কাজিন হেলেনকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এলিজাবেথ। তার সঙ্গে সহজও হতে পারে না। এলিজাবেথের সঙ্গে সে খুবই ভালো ব্যবহার করে কিন্তু তারপরও কোথায় যেন একটা শীতল ভাব থাকে সম্পর্কের মধ্যে, সে বরফটুকু শত চেষ্টা করেও গলাতে পারেনি এলিজাবেথ। হেলেনের স্বামী চার্লস ফ্রান্স-শাখার প্রধান। লোকটা জানি কেমন ম্যাদা-মারা। ফ্রান্স-শাখা খুব ভালো চালাচ্ছে বলেই চার্লসকে বাবা ওর পদ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন না। অবশ্য এলিজাবেথের ধারণা চার্লসের এই সাফল্যের পেছনে হেলেনের হাত আছে।

এলিজাবেথ ওর জার্মান কাজিন আনা রোফ গাসনার এবং তার স্বামী ভালথারকে বেশ পছন্দ করে। এলিজাবেথ শুনেছে ভালথার নাকি স্রেফ টাকার লোভে আনাকে বিয়ে করেছে। নইলে কে আর এমন অসুন্দরী একটা মেয়েকে বিয়ে করতে যায়।

কিন্তু এলিজাবেথ মনে করে না যে আনা অসুন্দরী। আনাকে ওর খুব লাজুক আর সংবেদনশীল নারী বলেই মনে হয়। ভালথার সম্পর্কে অনেক কানাঘুষো অনেক খবরই এসেছে এলিজাবেথের কানে। লোকটা নাকি ভালো না; লোভী, হিংস্র স্বভাবের, বৌ পেটায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভালথারের নায়কসুলভ চেহারা আর নিষ্পাপ চাউনি দেখে এসব কথা বিশ্বাস করতে মন চায়নি এলিজাবেথের।

ওর সকল কাজিনের মধ্যে এলিজাবেথ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে অ্যালেক নিকলসকে। যখনই কোনো সমস্যায় পড়েছে সোজা ছুটে গেছে সে অ্যালেকের কাছে। অ্যালেক নিমিষে ওর মন ভালো করে দিয়েছেন। একবার এলিজাবেথের এত মন খারাপ হল ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চাইল বাবার ওপর রাগ করে। স্যুটকেস গুছিয়ে রওনা হচ্ছে, এই সময় কী মনে করে ও অ্যালেককে ফোন করল। অ্যালেক তখন একটা কনফারেন্সে ব্যস্ত। আলোচনা মাঝপথে, এই সময় এলিজাবেথের ফোন পেয়ে উঠে এলেন অ্যালেক। এক ঘণ্টারও বেশি সময় তিনি কথা বললেন এলিজাবেথের সঙ্গে। মন ভালো হয়ে গেল ওর। বাবাকে সেবারের মতো ক্ষমা করে দিয়ে স্যুটকেসটা আগের জায়গায় রেখে দিল সে। এই হচ্ছেন স্যার অ্যালেক নিকলস। হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান একটি মানুষ। কিন্তু তার স্ত্রী ভিভিয়ান ঠিক তাঁর উল্টো। সুন্দরী বলে দেমাগে মাটিতে পা পড়ে না। মহিলাকে একটুও পছন্দ করে না এলিজাবেথ। স্বার্থপর, অভদ্র, বুদ্ধিহীনা এক নারী। ভিভিয়ানের মতো আত্মকেন্দ্রিক মেয়ে জীবনে দেখেনি এলিজাবেথ।

বছর কয়েক আগে এলিজাবেথ অ্যালেকদের গ্লুচেস্টারশায়ারের খামারবাড়িতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। সেদিন একা একা পিকনিকে যায় ও। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দৌড়ে বাড়ি ফিরল এলিজাবেথ। খিড়কির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, হলওয়ের দিকে এগোচ্ছে, স্টাডিরুম থেকে ঝগড়ার আওয়াজ শোনা গেল।

'আমি আর কাজের বুয়া হয়ে থাকতে পারব না', বলছে ভিভিয়ান। 'তোমার অত্যন্ত দামি কাজিনকে আজ রাতে তুমিই সেবা করো। আমি লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি। আমার এনগেজমেন্ট আছে।'

'এনগেজমেন্টটাকে ইচ্ছা করলেই বাতিল করে দিতে পারো। মেয়েটা মাত্র আরেকটা দিন আছে আমাদের সঙ্গে। আর ও—'

'দুঃখিত অ্যালেক। আই ফিল লাইক এ গুড ফাক। আজ কারও সঙ্গে আমার বিছানায় যেতেই হবে।'

'ফর গডস শেক, ভিভিয়ান!'

'চেঁচিয়ো না! তোমার জন্য আমার জীবনটাকে নষ্ট করব নাকি?'

ওই মুহূর্তে, এলিজাবেথ সরে যাওয়ার আগেই ভিভিয়ান ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে এল স্টাডি থেকে। এলিজাবেথের আহত চেহারার দিকে একপলক তাকিয়ে হাসি-হাসি গলায় বলল, 'আজ এত জলদি?' তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

অ্যালেককে দেখা গেল দোরগোড়ায়। মৃদু গলায় বললেন—

'ভেতরে এসো, এলিজাবেথ।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্টাডিতে ঢুকল এলিজাবেথ। অ্যালেকের চেহারা বিব্রত। এলিজাবেথের ইচ্ছে করল তাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু কীভাবে দেবে বুঝতে পারছে না। অ্যালেক টেবিল থেকে একটা পাইপ তুলে নিয়ে তাতে তামাক ভরলেন। জ্বালালেন। এলিজাবেথের মনে হল অনেক সময় নিয়ে কাজটা করছেন তিনি।

'আশা করি তুমি ভিভিয়ানকে বুঝতে পারবে।'

এলিজাবেথ বলল, 'অ্যালেক, এটা তোমাদের ব্যাপার। আমি— ।'

'কিন্তু আমরা তো একই পরিবারের। আমি চাই না তুমি ওর ওপর রাগ করে থাকো।'

এলিজাবেথের বিশ্বাস হতে চাইল না এতকিছুর পরেও অ্যালেক স্ত্রীর পক্ষ নিচ্ছেন।

'সংসারে,' বলে চললেন তিনি, 'স্বামী-স্ত্রীর আলাদা কিছু প্রয়োজন থাকে।' একটু বিরতি দিলেন যেন সঠিক শব্দটি খুঁজছেন। 'আ-আমি ভিভিয়ানের সে প্রয়োজন মেটাতে পারি না। আর এতে তার কোনো দোষ নেই।'

এলিজাবেথ প্রশ্নটি না করে পারল না। 'সে—সে কি প্রায়ই অন্য পুরুষের কাছে যায়?'

'হ্যাঁ।'

আতঙ্ক বোধ করল এলিজাবেথ। 'তুমি ওকে ত্যাগ করছ না কেন?'

নম্র হাসলেন অ্যালেক। 'আমি ওকে ত্যাগ করতে পারব না, ডিয়ার চাইল্ড। কারণ আমি ওকে ভালোবাসি।'

পরদিনই এলিজাবেথ ফিরে এল স্কুলে। তবে ওইদিন থেকে অন্য যে-কারও চেয়ে অ্যালেকের জন্য মায়া পড়ে গেল ওর।

বাবা মারা যাবার আগে ক'টা দিন তাঁকে কী একটা ব্যাপারে খুব চিন্তিত দেখেছে এলিজাবেথ। অনেক ভেবেও কারণটা উদ্ধার করতে পারেনি। বাবাকে জিজ্ঞেসও করেছিল একদিন, স্যাম উত্তর দিয়েছিলেন, 'ও তেমন কিছু না। তোমাকে আমি পরে বলব।'

তারপর একদিন বাবা এলিজাবেথকে ডেকে বললেন, 'আমি কাল চ্যামোনিক্স-এ যাচ্ছি। পাহাড়ে চড়ব।' এলিজাবেথ শুনে খুব খুশি হল। বাবার বিশ্রামের খুব প্রয়োজন। এই সময় পাহাড়ে চড়ে তিনি রিলাক্স বোধ করবেন।

'তোমার জন্য আমি রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলল ও।

'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। রিজার্ভেশন অনেক আগেই হয়ে গেছে।'

পরদিন ভোরে স্যাম চ্যামোনিক্স যাত্রা করলেন। বাবার সঙ্গে ঐ তার শেষ দেখা। আর কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না...

এলিজাবেথ এক এক করে সব স্মৃতিচারণ করল, ওর এখন আর আগের মতো কান্না পাচ্ছে না। ও ভাবছে রোফ অ্যান্ড সন্সের হাল এখন কে ধরবে? কাকে বাবা এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভার দিয়ে গেছেন? পরদিন বিকেলেই এ-প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল সে ।

বিকেলবেলা স্যাম রোফের আইনজীবী এল এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করতে। কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি বলতে শুরু করলেন : 'আপনার বাবা যে উইল করে গেছেন তার একটা কপি আমি নিয়ে এসেছি। আপনার এই গভীর শোকের সময় উইলটুইল নিয়ে কথা বলতে আমার খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। আপনার বাবা আপনাকে তার একমাত্র উত্তরাধিকার করে গেছেন উইলে। এর মানে হচ্ছে রোফ অ্যান্ড সন্সের সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এখন শুধু আপনার হাতে।'

এলিজাবেথের মনে হল সে ভুল শুনেছে। সে তো স্বপ্নেও ভাবেনি বাবা তাকে এই বিশাল সাম্রজ্যের সিংহাসনে বসাবেন। 'কেন?' অবিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে, 'আমাকে কেন?'

আইনজীবী কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'তা আমি কী করে বলব, মিস রোফ? এই কোম্পানির সমস্ত ক্ষমতা এখন আপনার হাতে। আপনিই এখন সিদ্ধান্ত নেবেন কীভাবে এটাকে চালাবেন।' একটু থামলেন তিনি, এলিজাবেথকে যেন ভালো করে দেখলেন, তারপর বললেন, 'রোফ অ্যান্ড সন্সে এর আগে কোনো মহিলা এই বিরাট ক্ষমতা হাতে পাননি। যাকগে, এই শুক্রবার জুরিখে বোর্ড মিটিং আছে। আপনি কি ওখানে যাবেন?'

'হ্যাঁ, আমি যাব', দৃঢ় গলায় বলল এলিজাবেথ।

পনেরো

পর্তুগাল
বুধবার, সেপ্টেম্বর ৯
মধ্যরাত।

আস্তো এস্তোরিল এলাকার সবচেয়ে কুখ্যাত জায়গাগুলোর মধ্যে একটি রুয়া দেব বোম্বিরোস। এই রুয়ার এক চোরাগলির মধ্য ভাড়া-করা ছোট্ট একটি বাড়ির বেডরুমে আরেকটু পর অভিনীত হতে যাচ্ছে শ্বাসরুদ্ধকর একটি দৃশ্য। ছোট্ট রুমটায় চারজন লোক। এদের মধ্য একজন ক্যামেরাম্যান, বিছানায় শুয়ে থাকা দুজন পুরুষ আর নারী। পুরুষটির বয়স ত্রিশ। সে একজন অভিনেতা আর সোনালি-চুলো আকর্ষণীয় ফিগারের কমবয়েসী মেয়েটি একজন অভিনেত্রী। মেয়েটির গায়ে কিছু নেই। শুধু গলায় একটা লাল রিবন জড়ানো। লোকটা বেশ শক্তসমর্থ, কুস্তিগিরদের মতো পেশিবহুল চেহারা, লোমহীন বুক। তার 'জিনিস'টা দুই ঊরুর মাঝখানে ঝুলে থাকা অবস্থাতেও বিশাল। আর চার নম্বর লোকটি একজন দর্শক। পেছনে, একটা চেয়ারে বসে আছে সে। চওড়া কার্নিশের হ্যাট মাথায় তার, চোখে গাঢ় রঙের চশমা।

ক্যামেরাম্যান ঘুরল লোকটির দিকে, জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল। মাথা ঝাঁকাল লোকটি। ক্যামেরাম্যান একটা সুইচ টিপল, চালু হল ক্যামেরা। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে সে বলল : অলরাইট অ্যাকশন। পুরুষটি ঝুঁকল মেয়েটির দিকে। মেয়েটি পুরুষটির লিঙ্গ মুখে নিয়ে চুষতে লাগল। দেখতে দেখতে ওটা লোহার মতো শক্ত হয়ে গেল। মেয়েটি মুখ থেকে বের করল ওটা। বিস্মিত হয়ে বলল, 'মাগো, কত্তবড় এটা।'

'ওটা এখন ভেতরে ঢোকাও।' ক্যামেরাম্যানের নির্দেশ এল। মেয়েটি ঊরু ফাঁক করল, পুরুষ তার দুই ঊরুর মাঝে শরীর সংস্থাপন করল। ধাক্কা মারল।

'আস্তে, হানি, আস্তে,' ককিয়ে উঠল মেয়েটি।

'ভয় নেই, ব্যথা পাবে না।' হাসল পুরুষ।

'যা সাইজ তোমার, ভয় না করে পারি।' মেয়েটি ঊরুদুটি আরও মেলে ধরল।

চশমা-পরা লোকটি ঝুঁকে এল সামনের দিকে। নগ্ন নারী-পুরুষটির রমণের প্রতিটি দৃশ্য সে গিলছে গোগ্রাসে। মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, 'খোদা, কী দারুণ লাগছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐভাবে আস্তে আস্তে করো।'

লোকটির নিশ্বাস ঘন হয়ে এল।

মেয়েটি অসম্ভব সুন্দরী। এর আগের মেয়েগুলো ওর তুলনায় কিছুই ছিল না। মেয়েটি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে, গোঙানি বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। নিজ থেকেই কোমর তোলা দিচ্ছে সে। 'ওহ্ ইয়েস, ইয়েস,' হিসহিস করছে সে সাপের মতো, 'থেমো না থেমো না, চালিয়ে যাও।' পুরুষটির নিতম্ব খামচে ধরল সে দুহাত দিয়ে, টানল নিজের দিকে। পুরুষটির শরীর দ্রুত, ছন্দোবদ্ধভাবে ওঠানামা করছে রমণীর শরীরের ওপর। মেয়েটির নখ বসে গেল পুরুষের পিঠে। 'ওহ্ ইয়েস, ইয়েস', গুঙিয়ে চলেছে সে রীতিমতো, 'আমার আসছে, আসছে, এই এল...'

ক্যামেরাম্যান লোকটির দিকে তাকাল, তার চোখ চশমার আড়ালে ঝিলিক দিল, সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে।

'নাউ!' ক্যামেরাম্যান পুরুষটিকে হুকুম করল।

মেয়েটি বিছানায় এত ব্যস্ত ছিল যে টেরও পেল না কী ভয়ংকর বিপদ নেমে আসছে তার মাথার ওপর। বন্য উল্লাসে তার মুখ চকচক করছে, শরীর কাঁপছে ভীষণভাবে, এই সময় পুরুষ তার গলা জড়িয়ে ধরল দুই হাতে, চাপ দিতে শুরু করল। ক্রমশ চাপ বাড়তে লাগল, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মেয়েটির। প্রথমে অবাক হল সে, তারপর মৃত্যুভয় এসে গ্রাস করল তাকে। চোখে ফুটল নগ্ন আতংক।

লোকটি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে জান্তব উল্লাস অনুভব করছে। আতঙ্ক বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে মেয়েটির চোখ। গলা থেকে বজ্রবাঁধন ছাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ঠিক এই সময় তার রাগমোচন হতে শুরু করল। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে সে, ওদিকে রাগমোচন হচ্ছে। পুরো দৃশ্যটা ভয়ানক উত্তেজিত করে তুলল লোকটিকে। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। মেয়েটি মারা যাচ্ছে, চোখ থেকে প্রাণের আভাটুকু মুছে যাচ্ছে। আহ্ কী অসম্ভব সুন্দর একটি দৃশ্য!

একসময় শেষ হয়ে গেল সব। লোকটি ঠায় বসে রইল তার জায়গায়, বিধ্বস্ত কিন্তু তৃপ্ত। গভীর করে শ্বাস টানল সে। নিজেকে মুহূর্তে তার ঈশ্বরের মতো মনে হল।

ষোলো

জুরিখ
শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ১১
দুপুর।

জুরিখের পশ্চিমে ষাট একর এলাকা জুড়ে রোফ অ্যান্ড সন্সের হেডঅফিস। বারোতলা এই প্রশাসনিক ভবনের পুরোটা কাচ দিয়ে ঢাকা। প্রশাসনিক ভবনকে ঘিরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দালান। প্রতিষ্ঠানের গবেষণা, পরিকল্পনা, উৎপাদন আর ল্যাবরেটরি বিষয়ক শাখাগুলো আছে এসব দালানে।

সাদা আর সবুজ রঙ করা ডেনিশ আসবাব দিয়ে সাজানো রিসেপশন লবিটি অত্যাধুনিক। কাচের ডেস্কের পেছনে বসে আছে রিসেপশনিস্ট। যারা তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ভেতরে যাবার অনুমতি পায়, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে গাইড দেয়া হয়। লবির ডানদিকে একসারি লিফট। এর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত। ওটা শুধু কোম্পানির প্রেসিডেন্ট ব্যবহার করেন।

আজ সকাল থেকে ডিরেক্টরদের ব্যক্তিগত লিফট বার-পাঁচেক ওঠানামা করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ওরা কেউ প্লেন, ট্রেন, হেলিকপ্টার কিংবা লিমুজিনে এসেছেন। ওককাঠের প্যানেলে ঘেরা মস্তবড় বোর্ডরুমে এখন সবাই এলিজাবেথের জন্য অপেক্ষা করছেন। এরা হচ্ছেন স্যার অ্যালেক নিকলস, ভালথার গাসনার, ইভো পালাজি এবং চার্লস মার্টেল। ওদের মধ্য একমাত্র রিজ উইলিয়ামসই ননমেম্বার হিসেবে এখানে উপস্থিত। গাইডবোর্ডে বিভিন্ন ড্রিংক সাজানো। তবে ড্রিংকসের ব্যাপারে কাউকে আগ্রহী দেখাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে সবাই উত্তেজিত, নার্ভাস, ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন।

চল্লিশোর্ধ্ব মধ্যবয়সী সুইডিশ কেট আরলিং এই সময় ঘরে ঢুকল। ঘোষণা করল : মিস রোফের গাড়ি এসে গেছে। সে তীক্ষ্ণচোখে রুমের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করল। কলম, নোটপ্যাড, পানি, সিগার, সিগারেট, ছাইদানি ইত্যাদি সব ঠিকঠাক আছে দেখে সন্তুষ্ট হল। কেট আরলিং গত পনেরো বছর ধরে স্যাম রোফের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছে। কখনও তার কোনো কাজে খুঁত ধরতে পারেননি স্যাম। সব সাজানো-গোছানো আছে দেখে কেট মাথা ঝাঁকাল, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিচে, প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে দাঁড়াল এলিজাবেথের লিমুজিন। গাড়ি থেকে নামল সে। পরনে কালো স্যুট, সাদা ব্লাউজ। কোনো মেকআপ নেয়নি এলিজাবেথ। কিন্তু ওকে ওর বয়সের তুলনায় অনেক তরুণ লাগছে। তবে মুখটা বিষণ্ণ।

প্রেসের লোকজন অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। বিল্ডিং-এর দিকে হাঁটতে শুরু করতেই টেলিভিশন, রেডিও আর সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন নিয়ে ছেঁকে ধরল ওকে।

'মিস রোফ, আমি লা ইউরোপ থেকে এসেছি। আপনি কি একটা বিবৃতি দেবেন? আপনার বাবার মৃত্যুর পর কোম্পানির দায়িত্ব কে নিতে যাচ্ছেন?'

'মিস রোফ, অনুগ্রহ করে এদিকে একটু তাকান না! আমাদের পাঠক আপনার একটা হাসি উপহার চায়।'

'আমি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস থেকে বলছি, মিস রোফ। আপনার বাবা কোনো উইল রেখে গেছেন?'

'মিস রোফ, আমি নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজের সাংবাদিক। আপনার বাবা তো একজন নামকরা পর্বতারোহী ছিলেন, না? তার দুর্ঘটনার কারণ কি জানা গেছে?'

'মিস রোফ, ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল, কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে চায়। আপনি কি কিছু বলবেন?'

'আমি লন্ডন টাইমস থেকে এসেছি। আমরা রোফ অ্যান্ড সন্সের ওপর একটা প্রতিবেদন—'

এলিজাবেথের সিকিউরিটি গার্ডরা ওকে ঘিরে রাখল। সাংবাদিকদের স্রোতের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে ওকে লবিতে ঢুকতে হল।

'মিস রোফ, আরেকটা ছবি, প্লিজ...'

এলিজাবেথ ওর ব্যক্তিগত লিফটে ঢুকে গেল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল ও। যাক বাবা, বাঁচা গেল। কিন্তু ওকে কি ওরা একমুহূর্তের জন্যও একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না?

কয়েক মিনিট পর এলিজাবেথ ঢুকল বোর্ডরুমে।

সবার আগে অ্যালেক নিকলস স্বাগত জানালেন ওকে। দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এলিজাবেথ, জানি না কীভাবে তোমাকে সান্ত্বনা দেব; এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা আর হয় না। ভিভিয়ান এবং আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু....'

'ধন্যবাদ অ্যালেক। আমি, শুনেছি তোমরা আমাকে ফোন করেছিলে।'

ইভো পালাজি এসে ওর গালে চুমু খেল, বলল, 'কারা, সান্ত্বনার ভাষা আমারও জানা নেই। তুমি ঠিক আছ তো, সোনা?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ ইভো।' ঘুরল ও চার্লসের দিকে। 'হ্যালো, চার্লস।'

'এলিজাবেথ, আমি আর হেল কী পরিমাণ শক পেয়েছি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমাদের কিছু করার থাকলে বলো।'

'না, ধন্যবাদ।'

ভালথার হেঁটে এল এলিজাবেথের দিকে। 'এলিজাবেথ, খবরটা শোনার পর আমাদের মাথায় বাজ পড়েছে। অ্যানা আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তোমার অসুবিধের কথা চিন্তা করে...'

'ঠিক আছে, ভালথার। ধন্যবাদ। অ্যানা ভালো আছে তো?'

ভালথার মাথা ঝাঁকাল। এরা সবাই ওর দুঃখে সহানুভূতি জানালেও ভেতরে ভেতরে এলিজাবেথ খুব হাঁপিয়ে উঠেছে। হঠাৎই ইচ্ছে করল সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যায়। একটু একা থাকে।

রিজ উইলিয়ামস এককোণে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথকে লক্ষ্য করছিল। যেভাবে ওর আত্মীয়-স্বজনরা সহানুভূতি দেখাতে শুরু করেছে তাতে মেয়েটা আবার ভেঙে না পড়ে। দলটার হাত থেকে ওকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেল রিজ। হাত বাড়িয়ে দিল এলিজাবেথের দিকে।

'হ্যালো, লিজ।'

'হ্যালো রিজ।' বাবার মৃত্যুর খবর নিয়ে আসার পর এই প্রথম রিজের সাথে দেখা এলিজাবেথের। অল্প ক'টা দিনের ব্যবধান মাত্র। তবুও মনে হচ্ছে কত দিন সে দেখেনি রিজকে।

'সবাই যখন এখানে হাজির, আমরা আমাদের কাজ তাহলে শুরু করে দিতে পারি, কি বলো?'

রিজের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করল এলিজাবেথ। রিজ আসলে বুঝতে পেরেছে ওকে। তাড়াতাড়ি মুক্তি চায় ও এখান থেকে। মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিল ও রিজকে।

ডিরেক্টররা নিজের নিজের আসনে বসল। রিজ এলিজাবেথকে নিয়ে এল টেবিলের মাথায়। চেয়ার টেনে ওকে বসতে সাহায্য করল, তারপর ফিরে গেল নিজের আসনে।

'এটা আমার বাবার চেয়ার।' ভাবল এলিজাবেথ। 'এখানেই বসতেন তিনি। সভার সভাপতিত্ব করতেন।' ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলল ও, চাইল ডিরেক্টরদের দিকে।

চার্লস শুরু করল, 'যতদিন পর্যন্ত না আমরা—' কথা শেষ না করেই তাকাল অ্যালেকের দিকে। অ্যালেক, 'তুমিই শুরু করো।'

অ্যালেক ওদের দিকে তাকালেন। সবাই সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। অ্যালেক বললেন, 'ঠিক আছে। শুরু করছি।'

টেবিলের সামনে, কলিংবেল টিপলেন তিনি। ঘরে ঢুকল কেট আরলিং, হাতে একটা নোটবই। দরজা বন্ধ করে একটা চেয়ার টেনে নিল সে। নোটবই খুলে প্রস্তুত

হল। সভার কার্যবিবরণী লিখতে হবে ওকে। অ্যালেক শুরু করলেন, 'এলিজাবেথ, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের ফর্মালিটিগুলো বাদ দিতে পারি। স্যাম রোফের মৃত্যু আমাদের সবার জন্য এক অপূরণীর ক্ষতি। কিন্তু—' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে তিনি এলিজাবেথের দিকে তাকালেন, 'দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে, তাঁকে নিয়ে ভাববার সময় আমাদের নেই, কেননা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে জনসাধারণের কাছে আমাদের মানসম্মান বলতে কিছু নেই।'

'ঠিক। প্রচারমাধ্যমগুলো আমাদের বারোটা বাজাচ্ছে।' ক্রুদ্ধস্বরে বলল চার্লস।

এলিজাবেথ ওর দিকে চাইল, জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

রিজ ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা। 'আমাদের কোম্পানি এখন বিভিন্ন সমস্যার বেড়াজালে আটকা পড়েছে, লিজ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে তদন্ত করা হচ্ছে, বেশকিছু ব্যাংক আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে তাদের ঋণ ফেরত দেবার জন্য। আসল কথা হচ্ছে, এগুলোর কোনোটাই আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য গৌরবের বিষয় নয়। একটা ওষুধ কোম্পানি ভালো ওষুধ তৈরি করে বলেই মানুষ তাকে বিশ্বাস করে। কোনো কারণে সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলে আমরা আমাদের খদ্দের হারাব।'

ইভো বলল, 'তবে এলিজাবেথ, ব্যাপারটা তাই বলে এমন নয় যে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারব না। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কোম্পানিকে ঢেলে সাজানো।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল এলিজাবেথ।

জবাব দিল ভালথার, 'আমাদের নিজ নিজ শেয়ার বিক্রি করে।'

চার্লস ওকে সমর্থন করল। 'তাহলেই আমরা খুব দ্রুত আমাদের ব্যাংক-লোনগুলো শোধ করতে পারব।'

এলিজাবেথ অ্যালেকের দিকে চোখ ফেরাল। 'তুমিও কি ওদের সাথে একমত?'

'হ্যাঁ, এলিজাবেথ। আমরা সবাই এ-ব্যাপারে একমত।'

চেয়ারে হেলান দিল এলিজাবেথ। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। রিজ কতগুলো কাগজ নিয়ে এল ওর কাছে। 'আমি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব তৈরি করে রেখেছি, এলিজাবেথ! এগুলোতে তোমাকে এখন শুধু সই করতে হবে।'

এলিজাবেথ কাগজগুলোর দিকে একপলক চোখ বুলিয়ে বলল, 'আমি এতে সই করলে কি কোনো লাভ হবে?'

উত্তর দিল চার্লস, 'এলিজাবেথ, যেসব ফার্ম কমিশনে কাজ করে, আমাদের সঙ্গে বারোটারও বেশি সেরকম আন্তর্জাতিক কমিশন পাওয়া ফার্মের কথা হয়েছে। ওরা একটা কনসোর্টিয়াম গঠন করে রোফ অ্যান্ড সন্সের স্টক-সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে প্রস্তুত। ভালো দাম দেবে ওরা।'

'তার মানে ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর মতো?' জানতে চাইল এলিজাবেথ।

ওপর-নিচে মাথা দোলাল চার্লস। 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।'

'আর ওদের লোকেরা বোর্ডের ডিরেক্টর হবে?'

'সেটা হওয়াই স্বাভাবিক...'

'অর্থাৎ ওরা রোফ অ্যান্ড সন্সের ওপর কর্তৃত্ব ফলাবে?'

'আমরা তখনও ডিরেক্টর থাকব।' ইভো তাড়াতাড়ি বলল।

এলিজাবেথ চার্লসকে উদ্দেশ করে বলল, 'তুমি বললে একটা কনসোর্টিয়াম শেয়ার সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে প্রস্তুত!'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওরা তা করছে না কেন?'

বিভ্রান্ত দেখাল চার্লসকে। 'মানে? তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'ডিরেক্টরদের সবাই যদি বিশ্বাস করে যে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আমাদের পরিবারের বাইরের কারো হাতে গেলে ব্যবসা ভালোভাবে চলবে, তাহলে এটা আগে করা হয়নি কেন?'

হঠাৎ অদ্ভুত এবং অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল রুমের মধ্যে। ইভো নীরবতা ভেঙে বলল, 'এটা করতে হলে সবার ঐক্যমত দরকার, এলিজাবেথ।'

'তাহলে কে একমত হয়নি?'

আবার নীরব হয়ে গেল বোর্ডরুম। এবারের নীরবতা আগের চেয়েও বেশি।

অবশেষে কথা বলল রিজ। 'স্যাম।'

আর তখুনি এলিজাবেথ বুঝতে পারল বোর্ডরুমে ঢোকার পর থেকে যে-ব্যাপারটা ওকে বিরক্ত করছিল অথচ ও ঠিক ধরতে পারছিল না, এখন সেটা ও আবিষ্কার করতে পেরেছে। স্যামের মৃত্যুতে সবাই সহানুভূতি জানিয়েছে। কিন্তু সেই সহানুভূতি আসলে ছিল কৃত্রিম। সহানুভূতির আড়ালে সবার মধ্যে বিরাজ করছিল চাপা উত্তেজনা। আসলে সবাই ধরেই রেখেছে এলিজাবেথ এসেই সব কাগজপত্রে দস্তখত করে দেবে। 'বাইরের লোক ব্যবসায়ে ঢোকালে যদি লাভই হত তাহলে বাবা কেন সবসময় এর বিরুদ্ধে ছিলেন?' এলিজাবেথ জানতে চাইল এই প্রশ্নের উত্তর।

'স্যামের নিজস্ব কিছু ধারণা ছিল,' ভালথার বোঝাতে চেষ্টা করল। 'তোমার বাবা অত্যন্ত জেদি আর একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ ছিলেন।'

আমার দাদা বুড়ো স্যামুয়েলের মতো : ভাবল এলিজাবেথ । তিনি বলতেন, শেয়াল যতই বন্ধুত্ব দেখাক তাকে মুরগির খাঁচায় ঢুকতে দিতে নেই। একদিন-না-একদিন শেয়ালের খিদে লাগবেই। আর বাবাও রাজি হননি কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ ছিল।

এলিজাবেথকে চিন্তিত দেখে কথা বলল ইভো, 'বিশ্বাস করো কারা, তোমার ভালোর জন্যই বলছি, ব্যবসার ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ো না তুমি। এসব তুমি বুঝবে না।'

ঠাণ্ডা গলায় এলিজাবেথ বলল, 'কিন্তু আমার বুঝতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'এলিজাবেথ, কেন নিজেকে এ ঝামেলায় জড়াচ্ছ।' আপত্তি জানাল ভালথার। 'তুমি শেয়ার বিক্রি করামাত্র প্রচুর টাকা পেয়ে যাচ্ছ। এত টাকা যা তুমি সারা জীবনেও খরচ করতে পারবে না।'

ভালথারের কথায় যুক্তি আছে : ভাবল এলিজাবেথ। আসলেই সে কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছে? টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলোয় সই করে দিলেই আর কোনো ঝামেলা থাকে না। তারপর একেবারে মুক্ত ও।

চার্লস অধৈর্যভাবে বলে উঠল, 'এলিজাবেথ, আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। তোমার করার কিছু নেই।'

আর তখনি এলিজাবেথের মন বলল : না, ওরও করার কিছু আছে। যেমন ছিল বাবার। ও এখন থেকে কাগজে সই করে চলে যেতে পারে, তারপর ওরা কোম্পানি নিয়ে যা-খুশি করুক। অথবা ও বাবার আসনে বসে জানার চেষ্টা করতে পারে শেয়ার বিক্রি করতে কেন ওরা এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কেন ওর ওপর এত চাপ সৃষ্টি করছে।

রিজের দিকে তাকাল এলিজাবেথ। কী ভাবছে ও? ওর চেহারা আগের মতোই ভাবলেশহীন। কেট আরলিং-এর দিকে তাকাল এলিজাবেথ। ওর সঙ্গে একা কথা বলতে হবে, ঠিক করল সে। সবগুলো মুখে ঘুরে এল এলিজাবেথের দৃষ্টি। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, ওর সম্মতির জন্য অপেক্ষা করছে।

'আমি সই করব না।' ধীরে ধীরে কথাটা উচ্চারণ করল এলিজাবেথ।

চমকে উঠল সবাই। হিম নীরবতা নেমে এল ঘরে। শেষপর্যন্ত ভালথার কথা বলল। হতাশায় ছাই হয়ে গেছে মুখ। 'তোমার কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, এলিজাবেথ। তোমাকে অবশ্যই সই করতে হবে। সবকিছু ঠিকঠাক করা আছে।'

খেপে গেল চার্লস। 'ভালথার ঠিকই বলেছে। তোমাকে অবশ্যই সই করতে হবে।'

সবাই একসঙ্গে আক্রমণ করল এলিজাবেথকে। ইভো জানতে চাইল, 'তুমি সই করবে না কেন শুনি?'

এলিজাবেথ বলতে চাইল 'কারণ আমার বাবাও এতে সই করেননি। কারণ তোমরা আমাকে জোর করছ।' কিন্তু মুখে বলল, 'আমাকে ব্যাপারটা নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করতে হবে।' পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা।

'কত দিন সময় নেবে তুমি, কারা?' ইভো জিজ্ঞেস করল,

'এখুনি বলতে পারব না। সবকিছু আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।'

বিস্ফারিত হল ভালথার, 'ধুত্তোর খুঁটিয়ে দেখার নিকুচি করি। আমরা এতদিন অপেক্ষা করতে—'

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রিজ বলল, 'আমার মনে হয় এলিজাবেথ ঠিকই বলেছে।'

সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকাল। রিজ বলে চলল, 'কোম্পানির সমস্যাগুলো সম্পর্কে ওর আসলেই একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া দরকার। তাহলে ও বুঝতে পারবে ওর কী করা উচিত।'

রিজের কথা গিলছে সবাই। অ্যালেক বললেন, 'আমি রিজের সঙ্গে একমত।'

চার্লস তিক্তকণ্ঠে বলল, 'জেন্টেলমেন, আমরা একমত হই বা না হই তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ আমরা এখন এলিজাবেথের খেলার পুতুল।'

ইভো তাকাল এলিজাবেথের দিকে। 'কারা, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। তোমার সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি জানালে আমরা খুশি হব।'

'অবশ্যই তোমরা তাড়াতাড়ি জানতে পারবে।' প্রতিশ্রুতি দিল এলিজাবেথ। সবাই এলিজাবেথের দিকে চেয়ে আছে।

প্রতিটি মুখ চিন্তামগ্ন। ওদের মধ্যে একজন মনে-মনে আঁতকে উঠে ভাবল : খোদা, এলিজাবেথও শেষপর্যন্ত খুন হতে চলেছে।

সতেরো

শঙ্কিত হয়ে আছে এলিজাবেথ।

বাবার জুরিখের হেডকোয়ার্টার্সে বেশ কয়েকবার এসেছে সে। তবে সবসময় দর্শনার্থী হিসেবে। ক্ষমতার মালিক তখন ওর বাবা। আর ক্ষমতা এখন এলিজাবেথের হাতে। প্রকাণ্ড অফিসের চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে। নিজেকে জাল মনে হচ্ছে। ডেস্কে বসে আছে ও, সামনে পাহাড়প্রমাণ ফাইলপত্র। কোত্থেকে শুরু করবে বুঝতে পারছে না। বাবার কথা ভাবছে এলিজাবেথ। এখানে বসতেন তিনি, এই চেয়ারে। হঠাৎ অপূরণীয় ক্ষতির একটা অনুভূতি জাগল মনে। স্যাম দক্ষ এবং প্রতিভাবান ছিলেন। তাঁকে এলিজাবেথের এখন কী যে দরকার!

লন্ডনে ফিরে যাওয়ার আগে অ্যালেক এলিজাবেথকে বলেছিলেন ,'সময় নাও। কারও চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না।' তিনি এলিজাবেথের মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করেছিল, 'অ্যালেক, তুমি কি মনে করো কোম্পানি পাবলিকের কাছে তুলে দেয়ার জন্য আমার ভোট দেয়া উচিত হবে?'

হেসেছেন অ্যালেক, অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলেছেন, 'আমার মনে হয় তোমার তাই করা উচিত।'

প্রকাণ্ড অফিসে বসে অ্যালেকের কথা মনে পড়ছে এলিজাবেথের। ইচ্ছে করছে তাকে ফোন করে বলে দেয়, 'আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলেছি।' তারপর সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেবে। এখানে নিজেকে উপযুক্ত মনে হচ্ছে না ওর।

কনসোলের ইন্টারকম বাটনের দিকে তাকাল এলিজাবেথ। একটিতে লেখা : রিজ উইলিয়ামস। একমুহূর্ত ইতস্তত করল সে, তারপর টিপে দিল বোতাম।

রিজ এলিজাবেথের সামনে বসে আছে, লক্ষ্য করছে ওকে। এলিজাবেথ জানে রিজ কী ভাবছে, সবাই কী ভাবছে। 'আজ সকালের মিটিঙে তুমি একটি বোমা ফেলেছ,' বলল রিজ।

'আমি দুঃখিত, সবাইকে আপসেট করে দিয়েছি।'

মুচকি হাসল রিজ। 'আপসেট দিয়ে কিছুই বোঝায় না। সবাই ভয়ানক শকড। তুমি সাইন করলে না কেন লিজ?'

এলিজাবেথ কীভাবে ব্যাখ্যা করবে এটা স্রেফ একটা অনুভূতি, একটা ইনটুইশন ছিল!

এলিজাবেথের মনের কথা পড়তে পারল রিজ। 'তোমার গ্রেট গ্রেট গ্রান্ডফাদার রোফ এ-ব্যবসা শুরু করেন। তিনি প্রথম থেকেই এটিকে পারিবারিক ব্যবসা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, বাইরের কাউকে এর ভেতরে নাক গলাতে দেননি। তবে তখন এটা ছিল একটা ছোট কোম্পানি। সময় বদলেছে। আমরা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ওষুধের ব্যবসা চালাচ্ছি। তোমার বাবার চেয়ারে যেই বসুক, তাকেই সমস্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ভয়ানক এক দায়িত্ব।'

এলিজাবেথ তাকাল রিজের দিকে। 'তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

'তুমি জানো আমি তা করব।'

স্বস্তিবোধ করল এলিজাবেথ। বুঝতে পারল রিজের ওপর কতটা নির্ভরশীল সে।

'প্রথমে যে-কাজটা করা দরকার,' বলল রিজ, 'এখনকার প্ল্যান্ট তোমার ঘুরে দেখা দরকার। কোম্পানির কাঠামো সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে তোমার?'

'তেমন নেই।'

মিথ্যা বলেছে এলিজাবেথ। সে তার বাবার সঙ্গে প্রচুর মিটিঙে অংশ নিয়েছে, জানে রোফ অ্যান্ড সন্স কীভাবে কাজ করে। তবে রিজের কাছ থেকে সে শুনতে চায়।

'আমরা শুধু ওষুধ তৈরি করি না, লিজ। আমরা কেমিকেল, পারফিউম, ভিটামিন, হেয়ার স্প্রে এবং কীটনাশকও তৈরি করি। আমরা কসমেটিকস এবং বায়ো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি বানাই। আমাদের একটি ফুড ডিভিশন আছে, আছে অ্যানিমাল নাইট্রেট বিভাগ।' এ সবই এলিজাবেথের জানা, তবু রিজকে বলতে দিল ও। 'আমরা পত্রিকা বের করি যেগুলো ডাক্তারদের কাছে বিলি করা হয়। আমরা অ্যাডহেসিভ তৈরি করি। গ্যাস প্রটেকশন এবং প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভও প্রস্তুত করি।'

রিজের কণ্ঠে গর্বের ছোঁয়া। বাবাও কোম্পানি নিয়ে এভাবে গর্ব করে বলতেন।

'একশোটিরও বেশি দেশে রোফ অ্যান্ড সন্সের ব্যবসা এবং হোল্ডিং কোম্পানি রয়েছে। প্রত্যেককে এ অফিসে রিপোর্ট করতে হয়।' বিরতি দিল রিজ, যেন এলিজাবেথকে বিষয়টি বোঝার সময় দিচ্ছে। 'তোমার প্রপিতামহ স্যামুয়েল একটি ঘোড়া আর টেস্টটিউব নিয়ে ওষুধের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এখন সারাবিশ্বে এ কোম্পানির ষাটটি কারখানা রয়েছে। আছে দশটি গবেষণাকেন্দ্র, হাজার হাজার সেলসম্যানের নেটওয়ার্ক। গত বছর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওরা চৌদ্দ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন ওষুধের ওপরে, আমরা এ থেকে বিরাট লাভ করেছি।'

তারপরও রোফ অ্যান্ড সন্সের ব্যাংক নিয়ে সমস্যা চলছে। এর মধ্যে কিছু একটা ভজকট আছে : ভাবল এলিজাবেথ।

রিজ উইলিয়ামস এলিজাবেথকে জুরিখের সদর দপ্তরের শুধু প্রধান ভবনগুলো ঘুরিয়ে দেখাল। তাতেই পুরো ৬ দিন লেগে গেল। এর বিশালত্বে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে এলিজাবেথের। জানে ও রোফ-প্ল্যান্টের মাত্র একটা অংশ দেখেছে। সারাবিশ্বে এরকম প্ল্যান্ট কয়েক ডজন ছড়িয়ে রয়েছে। এলিজাবেথ জানল একটি নতুন ওষুধ বাজারজাত করতে পাঁচ থেকে দশ বছর লাগে। দুই হাজার কম্পাউন্ড পরীক্ষা করার পরে গড়ে মাত্র তিনটি পণ্য উৎপাদন করা হয়... রোফ অ্যান্ড সন্সের তিনশো মানুষ কেবল নিয়োজিত রয়েছে মান নিয়ন্ত্রণের কাজে... সারাবিশ্বে রোফ অ্যান্ড সন্সের ৫ লাখ কর্মী কাজ করছে.... গত বছরের আয় ছিল...

এলিজাবেথ রিজের কথা শোনে, তার দেয়া তথ্য হজম করার চেষ্টা করে। সে জানত তাদের কোম্পানি বিরাট। কিন্তু এত প্রকাণ্ড ধারণা ছিল না তার।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে রোফ অ্যান্ড সন্সের পরিচালকদের কথা মনে পড়ছিল এলিজাবেথের।

ইভো : *বিশ্বাস করো কারা ,আমাদের হাতে পুরোটা ছেড়ে দেয়াই ভালো হবে। তুমি এসব বুঝতে পারবে না।*

অ্যালেক : *আমার মনে হয় সময় থাকতে এগুলো বিক্রি করে দেয়া উচিত।*

ভালথার : *তুমি এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ কেন? তুমি এসব দুশ্চিন্তা মাথায় না নিয়ে ফুর্তি করো গে।*

এলিজাবেথ ভাবল ওরা ঠিকই বলেছে। আমি এর মধ্যে নিজেকে কেন জড়াতে যাই। ওরা কোম্পানি নিয়ে যা খুশি করুকগে। আমার এ অবস্থান ধরে রাখার যোগ্যতা নেই। সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই স্বস্তিবোধ করল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন শুক্রবার। ছুটির দিন। এলিজাবেথ অফিসে ঢুকে সেক্রেটারিকে বলল রিজ উইলিয়ামসকে ডেকে পাঠাতে। নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবে।

'গতরাতের ফ্লাইটে নাইরোবি গেছেন মি. উইলিয়ামস,' জানাল কেট আরলিং। 'উনি মঙ্গলবার ফিরবেন আপনাকে বলতে বলেছেন। আর কাউকে কিছু বলতে হবে?'

ইতস্তত করে এলিজাবেথ বলল,'আর অ্যালেককে ফোনে ধরো।'

'জি মিস রোফ', বলল কেট। একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'পুলিশ বিভাগ আজ সকালে আপনাকে একটা প্যাকেট দিয়ে গেছে। এর মধ্যে আপনার বাবার ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র আছে। এগুলো তিনি চ্যামনিক্সে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

স্যামের নামটা শোনামাত্র অপূরণীয় ক্ষতির সেই যন্ত্রণাটার কাঁটা বিঁধল এলিজাবেথের বুকে।

'পুলিশ আপনার ম্যাসেঞ্জারের কাছে প্যাকেটটা দিতে পারেনি বলে ক্ষমা চেয়েছে। এতক্ষণে ওটা আপনার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে।'

ভুরু কোঁচকাল এলিজাবেথ। 'আমার ম্যাসেঞ্জার?'

'যে লোককে আপনি প্যাকেটটা নিতে চ্যামনিক্সে পাঠিয়েছিলেন।

'আমি চ্যামনিক্সে কাউকে পাঠাইনি। কোথায় ওটা?'

'আপনার ক্লজিটে রেখে দিয়েছি।'

প্যাকেটটা আসলে একটা ভুইটন সুটকেস। ভেতরে স্যামের কাপড়চোপড়, একটা তালামারা অ্যাটাচি কেস, চাবিসহ। সম্ভবত কোম্পানি রিপোর্ট, রিজ এসব দেখুক। মনে পড়ল রিজ দেশের বাইরে। এলিজাবেথ ভাবল : আমিও ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। অ্যাটাচি কেসটার দিকে তাকাল। হয়তো স্যামের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আছে। একবার খুলে দেখা দরকার।

কেট আরলিং ইন্টারকমে বলল, 'দুঃখিত মিস রোফ, স্যার অ্যালেক অফিসের বাইরে আছেন।'

'ওকে বলো আমাকে ফোন করতে। আমি সার্ডিনিয়ার ভিলায় থাকব। একই ম্যাসেজ দিয়ো মি. পালাজি, মি. গাসনার এবং মি. মার্টেলকে।'

সে ওদেরকে বলবে ওরা স্টক বিক্রি করতে পারবে। কোম্পানি নিয়ে ওরা যা খুশি করুকগে। এর মধ্যে এলিজাবেথ আর নেই।

লম্বা ছুটি কাটানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে মন। ভিলায় একাকী বসে নিজেকে আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সময় পাবে এলিজাবেথ।

ওইদিন বিকেলে সার্ডিনিয়ার পথে উড়াল দিল এলিজাবেথ। সঙ্গে অ্যাটাচি কেস।

আঠারো

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিল এলিজাবেথ। ভিলায় কেউ থাকে না। বন্ধ। এলিজাবেথ কাউকে বলেওনি যে সে আসছে। পরিচিত প্রকাণ্ড ঘরগুলোর মধ্যে আস্তে আস্তে ও হেঁটে বেড়াল। এখানে ওর শৈশব কেটেছে। নির্জন বাড়িতে একাকী ঘুরতে কেমন যেন লাগছে। এ ভিলায় গমগম করত আধডজন চাকরবাকর। কেউ রান্না করছে, কেউ মেঝে পরিষ্কার করছে। আর এখন এলিজাবেথ একদম একা। অতীতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

অ্যাটাচি কেসটা নিচতলার হলওয়েতে রেখে নিজের সুটকেস নিয়ে দোতলায় উঠে এল এলিজাবেথ। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, হলওয়ের মাঝখানে, বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর বাবার ঘর শেষপ্রান্তে। ঘুরল এলিজাবেথ, হেঁটে গেল ওদিকে। আস্তে খুলল দরজা, যেন বাবাকে দেখতে পাবে ও, শুনতে পাবে তার কণ্ঠ।

খালি ঘরটা আগের মতোই আছে। ডাবল একটা বেড, একটা চমৎকার দেরাজঅলা উঁচু টেবিল। একটা ড্রেসিং টেবিল। একজোড়া আরামকেদারা এবং ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা কাউচ। এলিজাবেথ সুটকেস নামিয়ে রেখে জানালার ধারে হেঁটে গেল। লোহার শাটার নামানো পর্দা ফেলা। জানালা খুলে দিল এলিজাবেথ। পাহাড়ের তাজা, ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল ঘরে। ও এ-ঘরেই ঘুমাতে পারবে।

নিচতলায় ফিরে এল এলিজাবেথ। ঢুকল লাইব্রেরিতে। চামড়া-বাঁধানো জোড়া কেদারার একটাতে বসল আরাম করে। দুপাশে হাত বোলাচ্ছে। বাবার সঙ্গে মিটিং থাকলে রিজ সবসময় এ চেয়ারে বসত।

রিজের কথা মনে পড়ছে। ইশ, ও এসময় এখানে থাকলে খুব ভালো হত। সে রাতের কথা মনে পড়ল, রিজ যেবার ওকে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্যারিসে ডিনার খাইয়েছিল। নিজের ঘরে ফিরে বারবার 'মিসেস রিজ উইলিয়ামস' লিখেছিল এলিজাবেথ। ডেস্কের কাছে হেঁটে গেল ও, একটা কলম তুলে নিল। ধীরে ধীরে গোটা অক্ষরে লিখল : 'মিসেস রিজ উইলিয়ামস'। লেখাটার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। তারপর ঠাট্টার ছলে জোরে জোরে বলল : 'ভাবছি এরকম বোকার মতো কাণ্ড আর কটা মেয়ে করছে?'

রিজের কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়িটাতে চক্কর মেরে এল এলিজাবেথ। পুরোনো আদলের প্রকাণ্ড রান্নাঘরটা পছন্দ হয়ে গেল ওর। স্টোভ আছে, একজোড়া ওভেনও রয়েছে।

ফ্রিজ খুলল ও। খালি। ব্যাপারটা আগেই ভাবা উচিত ছিল। খালি বাড়িতে খাবার থাকবে না। খালি ফ্রিজ দেখেই খিদে লেগে গেল এলিজাবেথের। কাবার্ড খুঁজল। টিউনা মাছের একজোড়া ছোট কৌটা পেল, আর পেল আধখালি নেসক্যাফের জার এবং এক প্যাকেট বিস্কিট। এখানে দীর্ঘদিন ছুটি কাটাতে হলে কিছু প্ল্যান-প্রোগ্রাম করা দরকার। প্রতিদিন খাবার কিনে আনার চেয়ে কালি ডি ভোলপের ছোট মার্কেটে গিয়ে একদিন বাজার করে আনলেই হল। তাতে অনেক দিন চলে যাবে এলিজাবেথের। কারপোর্টে একটা অতিরিক্ত জিপ সবসময় থাকে। এখনও আছে কিনা কে জানে।

রান্নাঘরের পেছনে চলে এল ও, দরজা দিয়ে কারপোর্টে ঢুকল। আছে গাড়িটা। রান্নাঘরে ফিরে এল এলিজাবেথ। কাবার্ডের পেছনের একটা বোর্ডে লেবেল-লাগানো কয়েকটা চাবি ঝুলছে। জিপের চাবিটা পেয়ে গেল ও । ফিরে গেল গাড়িবারান্দায়। গাড়িতে পেট্রোল আছে? চাবি ঘোরাল ও, চাপ দিল স্টার্টারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জীবন ফিরে পেল মোটর। যাক, সমস্যাটা তাহলে মিটল। সকালে গাড়ি নিয়ে বাজারে যাবে ও, প্রয়োজনীয় মুদি সদাই কিনে আনবে।

বাড়িতে আবার ঢুকল এলিজাবেথ। রিসেপশন হলের টাইলস-মোড়ানো মেঝে দিয়ে হাঁটার সময় জুতোর খটখট শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল। অ্যালেকের যদি এখন ফোন আসত! ভাবল ও। ওকে চমকে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলল এলিজাবেথ। 'হ্যালো?'

'এলিজাবেথ, অ্যালেক বলছি।'

হেসে উঠল এলিজাবেথ।

'হাসার কী হল?'

'বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। কোথায় তুমি?'

'গ্লুচেস্টারে।' এলিজাবেথের খুব ইচ্ছে করল অ্যালেকের সঙ্গে দেখা করতে। ওকে কোম্পানির ব্যাপারে সিদ্ধান্তের কথা জানাতে। কিন্তু ফোনে এসব কথা বলা যাবে না।

'আমার একটা উপকার করবে, অ্যালেক?'

'বলো।'

'এ সপ্তাহের ছুটিতে এখানে আসতে পারবে? তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলব।'

সামান্য ইতস্তত করে অ্যালেক বললেন, 'অবশ্যই আসব।'

যত কাজই থাকুক এলিজাবেথের জন্য সবসময় হাজির থাকেন অ্যালেক। এজন্যই তাঁকে এত পছন্দ করে এলিজাবেথ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল এলিজাবেথ, 'ভিভিয়ানকে নিয়ে এসো।'

'ও বোধহয় আসতে পারবে না। ওর—ওর লন্ডনে একটা কাজ আছে। আমি কাল সকালেই আসতে পারি। চলবে?'

'খুব চলবে। সময়টা জানিয়ো। আমি তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসব।'

'তার দরকার হবে না। আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসতে পারব।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ, অ্যালেক। অনেক ধন্যবাদ।'

ফোন রাখার পর স্বস্তির একটা বোধ এলিজাবেথের শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

ও জানে ও সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছে। এলিজাবেথ ভাবছিল রোফ অ্যান্ড সন্সের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবেন। বোর্ড নিজেরাই এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। স্যামের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে দেখল এলিজাবেথ, তার মনে রিজ উইলিয়ামসের নামটা এল সবার আগে। অন্যরা যে-যার জায়গায় প্রতিযোগিতা করছে কিন্তু একমাত্র রিজই কোম্পানির গোটা বিশ্বের হালহকিকতের খবর রাখে। ও প্রতিভাবান এবং কর্মঠ। তবে সমস্যা হল রিজ প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না। কারণ সে রোফ-বংশের কেউ নয় কিংবা রোফদের কাউকে সে বিয়েও করেনি। এমনকি বোর্ডের পরিচালকও হতে পারবে না রিজ।

এলিজাবেথ সার্ডিনিয়ায় আসার সময় বাপের অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে এসেছে। একবার ভাবল এটা কাল সকালে স্যার আলেকের হাতে তুলে দেবে। তবে এর মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তিগত জিনিসপত্র থাকে... ওটাকে নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকল এলিজাবেথ। রাখল ডেস্কে। খুলল। কেসের মাঝখানে একটি বড়সড় ম্যানিলা খাম। এলিজাবেথ খুলল ওটা। একটি কার্ডবোর্ডের ভেতরে টাইপ-করা আলগা কিছু কাগজ। কার্ডবোর্ডের ওপরে লেখা :

মি. স্যাম রোফ
গোপনীয়
কোনো কপি নেই

সম্ভবত কোনো রিপোর্ট হবে। এলিজাবেথ পাতা ওল্টাতে লাগল। ধীর হয়ে এল গতি। এরপর থেমে গেল। যা পড়ছে বিশ্বাস হচ্ছে না। কাগজগুলো নিয়ে একটা আর্মচেয়ারে পা মুড়ে বসল ও । আবার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়া শুরু করল। এবার প্রতিটি শব্দ পড়ার সময় আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে।

এটা একটা অদ্ভুত ডকুমেন্ট, গত বছর ঘটে যাওয়া কতগুলো ঘটনার ওপরে তদন্তের গোপন রিপোর্ট। চিলিতে রোফ অ্যান্ড সন্সের একটি রাসায়নিক প্ল্যান্ট বিস্ফোরিত হয়ে শত শত টন বিষাক্ত পদার্থ দশ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। নিহত হয় বারোজন। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে শতাধিক। সকল গবাদিপশু এ দুর্ঘটনায় মারা পড়ে। বিষে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এলাকার সমস্ত গাছপালা। গোটা অঞ্চল খালি করে দেয়া হয়। রোফ অ্যান্ড সন্সের বিরুদ্ধে কয়েকশো মিলিয়ন

ডলারের মামলা করা হয়। তবে চমকে ওঠার ব্যাপার ছিল যে, ঘটনাটা নিছক দুর্ঘটনা ছিল না। কেউ ইচ্ছে করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে প্ল্যান্টে।

এলিজাবেথের মনে পড়ল পৃথিবীর সমস্ত খবরের কাগজ এবং পত্রিকা এ দুর্ঘটনার জন্য রোফ অ্যান্ড সন্সকে দায়ী করছিল। তাদের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতার অভিযোগ এনেছিল। এতে কোম্পানির ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গোপন রিপোর্টে আরও আছে : বিষাক্ত কিছু ওষুধের বিরাট একটা চালানে ভুল লেবেল লাগানো হয়েছিল। ওই ওষুধ খেয়ে বহু লোক মারা যায়। কোম্পানির ভাবমূর্তি আরও ক্ষুণ্ন হয়। তবে কেউ জানে না ভুল লেবেলগুলো কীভাবে লাগানো হয়েছিল। একটা অত্যন্ত ভয়ংকর টক্সিন সুরক্ষিত একটি গবেষণাগার থেকে চুরি হয়ে যায়। এর একঘণ্টার মধ্যে কেউ একজন ব্যাপারটা পত্রিকার কাছে ফাঁস করে দিলে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্টাডি রুম অন্ধকার হয়ে গেছে। আলো জ্বালল এলিজাবেথ। রিপোর্টটা কোলে নিয়ে স্থাণুর মতো বসে রইল। একটা ব্যাপার ওর কাছে পরিষ্কার। কেউ রোফ অ্যান্ড সন্সের ক্ষতি করতে চাইছে অথবা ধ্বংস করে দিতে চাইছে। রিপোর্টের শেষ পৃষ্ঠায় স্যাম রোফ গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছেন :

কোম্পানির খুব উঁচু পদের কেউ এর সঙ্গে জড়িত। কোম্পানিকে পাবলিক করার জন্য আমাকে চাপ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাস্টার্ডটাকে খুঁজে বের করো।

ওর বাবা কীরকম দুশ্চিন্তা করতেন মনে পড়ল এলিজাবেথের। কাকে বিশ্বাস করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠাটি আবার দেখল ও, কোনো *কপি নেই*। এলিজাবেথ বুঝতে পারছে বাইরের কোনো গোয়েন্দা সংস্থা এ রিপোর্ট তৈরি করেছে। এ রিপোর্টের কথা স্যাম ছাড়া অন্য কারও জানার কথা নয়। আর এখন জানে এলিজাবেথ। অপরাধী লোকটা জানে না তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। স্যাম কি লোকটার পরিচয় জানতেন? অ্যাক্সিডেন্টের আগে ওই লোকের সঙ্গে কি তার তর্ক হয়েছিল? একথা জানার উপায় নেই এলিজাবেথের। সে শুধু জানে লোকটা একটা বিশ্বাসঘাতক এবং সে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কেউ একজন। স্যাম কি অপরাধীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন? এ-কারণেই কি তিনি কোম্পানির স্টক বিক্রির বিপক্ষে ছিলেন? একবার কোম্পানি পাবলিক লিমিটেডে পরিণত হলে গোপনে তদন্ত অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বোর্ড মিটিঙের কথা মনে পড়ে গেল এলিজাবেথের। সবাই ওকে স্টক বিক্রি করে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। এলিজাবেথের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। দেয়ালে ঝোলানো প্রপিতামহের ছবির দিকে চোখ চলে গেল। বুড়ো স্যামুয়েল এ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। আর এলিজাবেথের বাবা কোম্পানিকে নিজের চেষ্টায় এটাকে এতবড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। নিজেকে হঠাৎ খুব একা লাগল এলিজাবেথের। এমন সময় ফোনের ঝনঝন শব্দে চমকে গেল। ফোন তুলল। 'হ্যালো?'

'লিজ? আমি রিজ। এইমাত্র তোমার ম্যাসেজ পেলাম।'

'রিজ,' বলল এলিজাবেথ, 'আমি মঙ্গলবার বিকেল দুটায় বোর্ড মিটিং করব। সবাইকে মিটিঙে হাজির থাকতে বলতে পারবে?'

'পারব,' বলল রিজ, 'আর কিছু?'

ইতস্তত করল এলিজাবেথ। 'না, ধন্যবাদ।'

ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল এলিজাবেথ। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে সে। জানিয়ে দেবে কোম্পানির শেয়ার সে বিক্রি করবে না।

উনিশ

সে রাতে প্রচণ্ড ঝড় হল সার্ডিনিয়ায়। পরদিন ভোরে এলিজাবেথ ঘুম ভেঙে দেখে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। থেমে গেছে ঝড়। তবে চিহ্ন রেখে গেছে। বাতাসের ধাক্কায় স্টাডিরুমের জানালা খুলে গিয়েছিল। বৃষ্টির ছাট আর ঝড়ো হাওয়ার তাণ্ডবে ঘরের মধ্যে রীতিমতো ঝড় বয়ে গেছে। সবকিছু ওলটপালট হয়ে আছে। গত রাতে পড়া রিপোর্টের আলগা কয়েক টুকরো কাগজ মেঝেতে পড়ে আছে। ভেজা বাকি কাগজগুলোর হদিস নেই। নিশ্চয় উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাতাস।

ফেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল এলিজাবেথ। লনে কোনো কাগজ নেই। মনে পড়ল এ রিপোর্টের কোনো কপি নেই। স্যাম রিপোর্টের তদন্তভার যাকে দিয়েছিলেন তাকে খুঁজে বের করতে হবে। হয়তো কেট আরলিং তার নাম জানে। কিন্তু এলিজাবেথ জানে না স্যাম কেটকে বিশ্বাস করতেন কি না। এটা একটা ভয়ংকর খেলা। এখানে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে ওকে।

এলিজাবেথ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘরে খাবার নেই। কালা ডি ভোলপ থেকে খাবার কিনে আনবে। বাসায় ফিরে এসে হয়তো দেখবে অ্যালেক চলে এসেছেন। ওর আজ সকালে আসার কথা।

ধীরগতিতে গাড়ি চালাচ্ছে এলিজাবেথ। এদিকের রাস্তা বিপজ্জনক। সরু রাস্তা দুটো লেন দিয়ে গভীর একটা খাদের পাশ দিয়ে পাহাড় কেটে বেরিয়ে গেছে। ভেতরের লেনের পাশে পাহাড়ের নিখাদ গা, বাইরের দিকের লেনের পরে ঝপ করে নেমে গেছে খাদ, কয়েকশো ফুট নিচে সমুদ্র। ভেতরের লেনের গা ঘেঁষে গাড়ি চালাতে লাগল এলিজাবেথ।

সরু একটা বাঁকের দিকে এগোচ্ছে গাড়ি। গাড়ির গতি কমাতে ব্রেকে পায়ের চাপ দিল এলিজাবেথ।

কাজ করছে না ব্রেক।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। আবার ব্রেকে চাপ দিল এলিজাবেথ, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে পেডাল চেপে ধরল। বুক ধক করে উঠল দেখে গাড়ির গতি বাড়ছে। বাঁক ঘুরল গাড়ি, আগের চেয়ে জোরে ছুটছে ঢালের রাস্তা দিয়ে। প্রতি সেকেন্ডে বাড়ছে স্পিড। আবার ব্রেক চাপল এলিজাবেথ। কাজ হল না।

আবার একটা তীক্ষ্ণ বাঁক সামনে। স্পিডোমিটারের দিকে চোখ যেতে হিম হয়ে গেল বুক। মিটারের কাঁটা ক্রমে উপরের দিকে উঠছে। গাড়ির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে রোলার কোস্টার, সামনে হাঁ হয়ে আছে বাঁক।

এলিজাবেথ একবার ভাবল গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু গাড়ি ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ছুটছে। প্রতিমুহূর্তে বেড়ে চলেছে গতি। একপাশে পাহাড়ের নিরেট দেয়াল, অন্য পাশে খাদ, মাঝখানের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে ও। মারা যাচ্ছে এলিজাবেথ। একমুহূর্তের জন্য মনে হল খুন করা হচ্ছে ওকে। ওর বাবাকেও কেউ খুন করেছে। কিন্তু হত্যাকারী কে সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই এলিজাবেথের । হয়তো ওদের পরিবারের কেউ। চেহারাগুলো ভেসে উঠল মনের ছবিতে। অ্যালেক... ইভো... ভালথার... চার্লস... ওদের কেউ। কোম্পানির অতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কেউ...

এলিজাবেথের মৃত্যু দুর্ঘটনা বলে ধরা হবে, যেমনটি স্যামের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এলিজাবেথ কাঁদছে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অশ্রু। গাড়ির চাকা ভেজা রাস্তায় পিছলে যেতে শুরু করেছে। স্টিয়ারিং হুইল ধরে রাখা হাতদুটোয় কোনো সাড়া পাচ্ছে না এলিজাবেথ। গাড়িটা একবার ঝাঁকি খেল, পিছলে যেতে চাইল রাস্তা দিয়ে, খাদের দিকে ছুটে যেতে চাইছে। ওটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় রাস্তায় ধরে রাখল এলিজাবেথ।

গাড়ির গতি এখন ঘণ্টায় আশি মাইল। আরেকটা বাঁকের দিকে ছুটছে গাড়ি। বাঁকটার ঠিক আগে এক ঝলকের জন্য একটা ছোট ট্রেইল দেখতে পেল এলিজাবেথ। পাহাড় কেটে ভেতরে ঢুকে গেছে। জানে না ট্রেইলটা কোন্ দিকে গেছে। তবে মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল ও। গাড়ি বাঁকের মুখে চলে এসেছে, প্রাণপণ শক্তিতে ডানদিকে হুইল ঘোরাল ও। ট্রেইলের মধ্যে ঢুকে পড়ল গাড়ি। তারপরই প্রবল একটা সংঘর্ষের শব্দ। দুনিয়া আঁধার হয়ে এল ওর কাছে। এরপর আর কিছু মনে নেই এলিজাবেথের।

কুড়ি

হাসপাতালের বিছানায় চোখ মেলে চাইল এলিজাবেথ। পাশে বসে আছেন অ্যালেক নিকলস।

'ঘরে তোমাকে খেতে দেয়ার মতো কিছু নেই', ফিসফিস করে বলল এলিজাবেথ। কাঁদতে শুরু করল।

অ্যালেকের চোখে বেদনা ফুটল, ওকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

'এলিজাবেথ।'

বিড়বিড় করল এলিজাবেথ। 'ঠিক আছে, অ্যালেক। এভরিথিং ইজ ফাইন।'

ঠিকই বলেছে ও। সারাগায়ে ক্ষত, প্রচণ্ড ব্যথা। তবু তো বেঁচে আছে এলিজাবেথ। বিশ্বাস হচ্ছে না ব্যাপারটা। পাহাড়ের ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঠাণ্ডা হয়ে এল গা।

'আমি এখানে কতদিন আছি?' এলিজাবেথের গলার স্বর দুর্বল এবং কর্কশ।

'দুই দিন আগে ওরা তোমাকে নিয়ে এসেছে। তখন তুমি অজ্ঞান, ডাক্তার বলেছেন তোমার বেঁচে যাওয়াটা অলৌকিক। শরীরের প্রচুর জায়গা কেটেছিঁড়ে গেছে। তবে কোনো হাড়গোড় ভাঙেনি। কিন্তু কী ভয়ংকর অ্যাক্সিডেন্ট!'

'ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না, অ্যালেক।'

বিস্মিত দেখাল অ্যালেককে। 'বুঝতে পারলাম না।'

উনি বুঝবেন কী করে? উনি তো আর রিপোর্ট পড়েননি। এলিজাবেথ বলল, 'কেউ ইচ্ছে করে ব্রেক নষ্ট করে রেখেছিল।'

অবিশ্বাসের চোখে ওর দিকে তাকালেন অ্যালেক। 'কিন্তু এমন কেন করতে যাবে কেউ?'

'কারণ', অ্যালেককে অন্য সবার থেকে বেশি বিশ্বাস করলেও কথাটি বলতে পারল না এলিজাবেথ। এখনও দুর্বল ও, কথাটা বলার আগে ভাবতে হবে ওকে। সময় দরকার। 'আমি জানি না,' বলল ও। 'তবে আমি নিশ্চিত কেউ কাজটা করেছে।'

অ্যালেকের চেহারা লক্ষ্য করছে এলিজাবেথ। বিস্ময় এবং অবিশ্বাস কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে রাগ।

'ঠিক আছে। আমরা অবশ্যই ব্যাপারটা দেখব।' তাঁর কণ্ঠ গম্ভীর।

স্যার অ্যালেক ওলবিয়ায় পুলিশপ্রধান লুইগি ফেরারোকে ফোন করলেন। এলিজাবেথের গাড়ি এখন পুলিশের গ্যারেজে, জানালেন ফেরারো। অ্যালেক বললেন, 'আপনি একজন ভালো মেকানিক জোগাড় করুন। আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।' ফোন রেখে দিলেন তিনি।

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।' বলল এলিজাবেথ।

অবাক হল অ্যালেক। 'ডাক্তার তোমাকে কমপক্ষে দুদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছেন। তুমি পারবে না—'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।' জেদি গলা এলিজাবেথের।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ডাক্তারের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ব্যান্ডেজ-বাঁধা ফোলা, ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে অ্যালেক নিকলসের সঙ্গে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল এলিজাবেথ। চলল পুলিশ-গ্যারেজে।

ওলবিয়ার পুলিশপ্রধান লুইগি ফেরারো মধ্যবয়স্ক, বড়সড় ভুঁড়ি। তার সঙ্গে রয়েছে সুঠামদেহী ডিটেকটিভ ব্রুনো কামপাংগা, সে লম্বায় তার বস্‌কে ছাড়িয়ে গেছে। হাইড্রলিক লিফটে এলিজাবেথের বিধ্বস্ত গাড়িটি তোলা হয়েছে। বামদিকের ফ্রন্ট ফেন্ডার এবং রেডিয়েটর দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, গাছের ছাল লেগে রয়েছে গায়ে। গাড়িটা দেখে মাথাটা কেমন দুলে উঠল এলিজাবেথের। অ্যালেককে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল। টলে পড়ে যাচ্ছিল ও।

উদ্বিগ্ন দেখাল অ্যালেককে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ', মিথ্যা বলল এলিজাবেথ। ভয়ানক দুর্বল আর ক্লান্ত লাগছে শরীর। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা ওর নিজের দেখতে হবে।

গ্রিজ-মাখা একটা কাপড়ে হাত মুছল মেকানিক, হেঁটে এল দলটার কাছে। 'এরকম গাড়ি ওরা আজকাল আর বানায় না। অন্য কোনো গাড়ি হলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।'

'ব্রেকের কী অবস্থা?'

'ব্রেক, ব্রেক ঠিকই আছে।'

অবিশ্বাস গ্রাস করল এলিজাবেথকে। 'কী বলছেন আপনি!'

'আমি ঠিকই বলছি। ব্রেক ঠিকই আছে। অ্যাক্সিডেন্টেও ব্রেকের কোনো ক্ষতি হয়নি। এজন্যই বলছিলাম ওরা আজকাল এরকম গাড়ি তৈরি করে না।'

'অসম্ভব', প্রতিবাদ করল এলিজাবেথ। 'আমি গাড়ি চালানোর সময় কাজ করছিল না ব্রেক।'

'মিস রোফের ধারণা কেউ ব্রেক নষ্ট করে রেখেছে।' বললেন পুলিশ চিফ ফেরারো।

মাথা নাড়ল মেকানিক। 'না, স্যার,' সে জিপের কাছে হেঁটে গেল। নিচের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আপনি দুভাবে ব্রেক নষ্ট করতে পারেন। হয় ব্রেক লিঙ্ক

কেটে ফেলতে হবে নয়তো এই নাটটা আলগা করে রাখতে হবে।' নিচের একটা ধাতবখণ্ড দেখাল সে। 'তখন ব্রেক ফ্লুইড পড়ে যাবে। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন ব্রেক লিঙ্কের কিছু হয়নি। আমি ব্রেক ড্রাম পরীক্ষা করেছি। ভরা।'

চিফ ফেরারো এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি এরকম একটা অবস্থায়—'

'এক মিনিট,' বাধা দিলেন অ্যালেক। মেকানিকের দিকে ঘুরলেন। 'এরকমও তো হতে পারে, ব্রেক লিঙ্ক কেটে ফেলে পরে ওটা আবার জোড়া লাগানো হয়েছে কিংবা কেউ ব্রেক ফ্লুইড ফেলে দিয়ে আবার ভরে রেখেছে ড্রাম।'

সবেগে মাথা নাড়ল মেকানিক। 'মিস্টার, ওই লিঙ্কগুলো কেউ স্পর্শও করেনি।' সে হাতের কাপড়টা দিয়ে নাটের চারপাশের ফ্লুইড মুছল সতর্কতার সাথে। 'নাটটা দেখছেন? কেউ এটা আলগা করলে রেঞ্চের তাজা দাগ থাকত গায়ে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি গত ছয় মাসে এতে কেউ হাত লাগায়নি। ব্রেকেও কোনো সমস্যা নেই। দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে।'

দেয়ালের কাছে হেঁটে গেল সে। একটা সুইচ টেনে নামাল। ঘরর আওয়াজ করে হাইড্রলিক লিফট মেঝেতে নামিয়ে আনল জিপ। মেকানিক গাড়িতে উঠল, চালু করল ইঞ্জিন, পিছিয়ে নিয়ে গেল জিপ। পেছনের দেয়াল ছুঁল ওটা, মেকানিক ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে অ্যাকসিলেরেটর দাবিয়ে ধরল। গাড়ি সবেগে ছুটে গেল ডিটেকটিভ কামপাংগার দিকে। সে চিৎকার দেয়ার জন্য হাঁ করেছে মুখ, সেই মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে গাড়ি থেমে গেল তার এক-ইঞ্চি সামনে। মেকানিক ডিটেকটিভের কটমটে চাউনি উপেক্ষা করে বলল, 'দেখলেন তো? ব্রেক ঠিক আছে।'

সবাই এখন লক্ষ্য করছে এলিজাবেথকে। ওরা কী ভাবছে ধারণা করতে পারছে এলিজাবেথ। অ্যালেক অসহায় গলায় ডাকলেন, 'এলিজাবেথ।'

'কিন্তু আমি যখন ওই জিপ চালাচ্ছিলাম তখন কাজ করেনি ব্রেক।'

অ্যালেক একমুহূর্ত দেখলেন ওকে তারপর মেকানিককে বললেন, 'এমনও তো হতে পারে কেউ এমন কিছু করে রেখেছিল যাতে ব্রেক কাজ না করে।'

ডিটেকটিভ কামপাংগা বলে উঠল, 'ব্রেক লাইনিং কেউ পানিতে ভিজিয়ে দিয়েছিল হয়তো।'

উত্তেজনা বোধ করল এলিজাবেথ। 'সেরকম কিছু হলে কী ঘটবে?'

মাথা ঝাঁকাল মেকানিক। 'উনি ঠিকই বলেছেন।' এলিজাবেথের দিকে ফিরল। 'গাড়ি চালানোর শুরুতে আপনার ব্রেক কাজ করছিল?'

এলিজাবেথের মনে পড়ল কারপোর্ট থেকে বেরুবার সময় এবং প্রথম মোড় ঘোরার সময় কাজ করছিল ব্রেক। 'হ্যাঁ' জবাব দিল ও। 'কাজ করছিল।'

'এই তো জবাব পেয়ে গেছেন', উল্লসিত গলায় বলল মেকানিক। 'আপনার ব্রেক বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল।'

'দাঁড়াও। দাঁড়াও।' বাধা দিলেন অ্যালেক। 'গাড়ি চালানোর আগে কেউ ব্রেকে পানি দেয়নি কীভাবে নিশ্চিত হলে তুমি?'

'কারণ', ধৈর্য ধরে বলল মেকানিক, 'উনি গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে কেউ ব্রেক ভিজিয়ে রাখলে ব্রেক একেবারেই কাজ করত না।

চিফ অফ পুলিশ ঘুরলেন এলিজাবেথের দিকে। 'বৃষ্টি খুব বিপজ্জনক হতে পারে, মিস রোফ। বিশেষ করে এসব সরু পাহাড়ি রাস্তায় এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।'

অ্যালেক লক্ষ্য করছেন এলিজাবেথকে, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। নিজেকে একটা নির্বোধ মনে হল এলিজাবেথের। তবু ওর মন বলছে ওটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল। সে এখান থেকে চলে যেতে চায়। চিফ অব পুলিশের দিকে তাকাল ও। 'আ– আমি দুঃখিত। এসবের মধ্যে আপনাকে টেনে আনলাম।'

'না, না। দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। বরং ঘটনাটা ঘটার জন্য আমার খারাপই লাগছে। তাছাড়া এ তো আমাদের কর্তব্য। ডিটেকটিভ কামপাংগা আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

অ্যালেক ওকে বললেন, 'বুড়ি, তোমাকে সাংঘাতিক বিধ্বস্ত লাগছে। এখন সোজা বিছানায় যাবে। টানা কয়েকদিন রেস্ট নেবে। আমি দোকানে ফোনে বলে দিচ্ছি কিছু মুদি সদাই বাসায় পাঠিয়ে দিতে।'

'আমি বিছানায় শুয়ে থাকলে রান্না করবে কে?'

'আমি,' ঘোষণা করলেন অ্যালেক।

সন্ধ্যার পরে তিনি নিজের রান্না-করা ডিনার পরিবেশন করলেন। নিয়ে এল এলিজাবেথের কাছে।

'আমি খুব একটা ভালো রাঁধুনি নই,' উৎফুল্ল গলায় বললেন তিনি। ট্রে নামিয়ে রাখলেন বিছানায়।

অ্যালেক সত্যি ভালো রাঁধুনি নন। খাবারগুলো কোনোটা পুড়িয়ে ফেলেছেন, কোনোটা আধাসেদ্ধ রয়েছে, আবার কোনোটিতে এমন লবণ-পোড়া হয়েছে মুখেই পোড়া যায় না। তবু তাই খেল এলিজাবেথ। কিছুটা খিদের চোটে আর বাকিটা অ্যালেককে আঘাত দিতে চায় না বলে। অ্যালেক ওর পাশে বসে গল্প করলেন। এলিজাবেথ বিব্রত হবে বুঝতে পেরে পুলিশ-গ্যারেজের প্রসঙ্গ ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলেন। এতে খুশিই হল এলিজাবেথ।

পরবর্তী ক'টা দিন ওদের ভিলায় কেটে গেল। এলিজাবেথ বিছানায় শুয়ে থাকল আর অ্যালেক ওর সেবাযত্ন করে গেলেন। রান্না করলেন, বই পড়ে শোনালেন। এ ক'টা দিন অনবরত বেজে চলল ফোন। প্রতিদিনই তার খবর নিল ইভো, সিমোনেটা, হেল, চার্লস এবং ভালথার। এমনকি ভিভিয়ানও। সবাই বলল ওকে ক'টা দিন সঙ্গ দিতে চায়।

'আমি ঠিক আছি,' তাদেরকে বলল এলিজাবেথ। 'তোমাদেরকে আসতে হবে না। আমি কয়েকদিনের মধ্যে জুরিখে ফিরছি।'

ফোন করল রিজ উইলিয়ামস। ওর কণ্ঠ শোনার পর এলিজাবেথ বুঝতে পারল ওকে কীরকম মিস করছে সে।

'শুনলাম তুমি নাকি হেলকে প্রতিযোগিতায় হারানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছ', ঠাট্টা করল রিজ, তবে ওর গলায় উদ্বেগের সুর ঠিকই টের পেল এলিজাবেথ।

'ভুল। আমি শুধু পাহাড়ে গাড়ি চালাই। ঢালে।'

রিজ বলল, 'তুমি ঠিক আছ জেনে আমি খুব স্বস্তিবোধ করছি, লিজ।'

ওর কণ্ঠ উষ্ণ করে তুলল এলিজাবেথকে। ভাবল এ মুহূর্তে রিজ কোথায় আছে। হয়তো কোনো সুন্দরীর সঙ্গে। গোল্লায় যাক সুন্দরী।

'তুমি জানো, তুমি পত্রিকার পাতায় হেডলাইন তৈরি করেছ?' জিজ্ঞেস করল উইলিয়ামস।

'না।'

'পত্রিকায় লিখেছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন রোফ-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী।'

আধঘণ্টা গল্প করল দুজনে। ফোন রেখে দেয়ার পর এলিজাবেথের মনে হল আগের চেয়ে ভালো লাগছে ওর।

অ্যালেক বেডরুমে ঢুকলেন। 'তোমাকে চেসায়ার বেড়ালের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

রিজের সঙ্গে কথা বললেই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে এলিজাবেথ। রিজকে গোপন রিপোর্টটা সম্বন্ধে বলবে, সিদ্ধান্ত নিল ও।

জুরিখে কোম্পানির প্লেনে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন স্যার অ্যালেক। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, 'এই অবস্থায় তোমাকে জুরিখে নিয়ে যেতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে। সবাই অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।'

জুরিখ এয়ারপোর্টে এলিজাবেথের জন্য সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছিল। এলিজাবেথ অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা তাদেরকে সংক্ষেপে জানাল। অ্যালেক ওকে নিয়ে লিমুজিনে চড়লেন। চললেন কোম্পানি হেডকোয়ার্টারের অভিমুখে।

জুরিখে, কনফারেন্স-রুমে রোফ অ্যান্ড সন্সের সকল পরিচালক উপস্থিত। রিজও এসেছে। কোনো ভূমিকার ধার না-ধেরে এলিজাবেথ জানিয়ে দিল : 'আমি কোম্পানির শেয়ার বিক্রি না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে একা এ কোম্পানি চালাতে

চাই না আমি। আমি জানি আমার এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। তবে তোমাদের সবার ওপর আমার ভরসা আছে। সবাইকে নিয়ে সমস্যাগুলো এক এক করে সমাধা করতে পারব।'

এলিজাবেথের সিদ্ধান্তে পরিচালকদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় উঠল। সবাই যে-যার মতো করে বোঝাতে চেষ্টা করল ওকে। কিন্তু নিজের জায়গায় অনড় এলিজাবেথ। শেষে হাল ছেড়ে দিল সকলে।

রিজ বলল, 'এলিজাবেথ আপনাদের সবার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। আমার মনে হয় কাজটা সকলের করা উচিত।'

'ধন্যবাদ রিজ,' এলিজাবেথ সবার দিকে একে একে তাকাল। 'একটি কথা, যেহেতু বাবার জায়গায় বসেছি আমি, কাজেই ব্যাপারটা অফিশিয়াল হওয়া উচিত।'

চার্লস স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'তার মানে, তুমি কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হতে চাইছ?'

'কার্যত।' শুকনো গলায় তাকে মনে করিয়ে দিলেন অ্যালেক, 'এলিজাবেথ ইতিমধ্যে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট, ও সৌজন্যের খাতিরে আমাদেরকে সুচারুভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।'

ইতস্তত করল চার্লস, বলল, 'ঠিক আছে। আমি প্রস্তাব করছি এলিজাবেথ রোফকে রোফ অ্যান্ড সন্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনুমোদন দেয়া হোক।'

'আমি এ প্রস্তাবের পক্ষে', বলল ভালথার।

অন্য সবাই তাদেরকে সম্মতি জানাল।

এদের মধ্যে একজন মনে-মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল : *প্রেসিডেন্টের জন্য সময় খুব খারাপ যায়। অনেকেই গুপ্তহত্যার শিকার হন।*

একুশ

কোম্পানির বিশাল দায়িত্ব সম্পর্কে এলিজাবেথ সম্পূর্ণ সজাগ। হাজার মানুষ ওর ওপর নির্ভরশীল। এলিজাবেথের সাহায্য দরকার। তবে জানে না কাকে সে বিশ্বাস করবে। কেট আরলিংকে ডেকে পাঠাল।

'জ্বি, মিস রোফ!'

ইতস্তত করল এলিজাবেথ, কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না। কেট আরলিং স্যাম রোফের সঙ্গে বহুদিন কাজ করেছে।

আপাতদৃষ্টিতে শান্ত সাগরের অশান্ত তলে কী ঘটছে তা তার অজানা থাকার কথা নয়। কোম্পানির ভেতরের খবর, স্যাম রোফের পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে ওর জানার কথা।

এলিজাবেথ বলল, 'আমার বাবার জন্য একটা গোপন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে তুমি কিছু জানো, কেট?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কেট। 'এসব নিয়ে উনি আমার সঙ্গে কখনও কথা বলেননি, মিস রোফ।'

এলিজাবেথ জানতে চাইল, 'বাবা গোপন রিপোর্ট করতে চাইলে কার কাছে যেতেন?'

'সিকিউরিটি ডিভিশন', এবার জবাব দিতে ইতস্তত করল না কেট।

'ধন্যবাদ।' বলল এলিজাবেথ।

কোম্পানির সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক রিপোর্ট এলিজাবেথের ডেস্কে। বিরক্তি নিয়ে রিপোর্ট পড়ল ও, তারপর ডেকে পাঠাল কোম্পানি-কন্ট্রোলারকে। তার নাম উইলটন ক্রাউস। যা ভেবেছিল তার চেয়ে বয়স কম লোকটার। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল মুই কী হনুরে। হয় হোয়ারটন স্কুল অথবা হার্ভার্ড থেকে পাস করেছে ও : ভাবল এলিজাবেথ।

কোনোরকম ভূমিকা ছাড়া শুরু করল এলিজাবেথ। 'রোফ অ্যান্ড সন্সের মতো কোম্পানি অর্থসংকটে পড়ল কীভাবে?'

ক্রাউস তাকাল ওর দিকে। কোনো মহিলার কাছে রিপোর্ট দিতে অভ্যস্ত নয় সে। কিন্তু এলিজাবেথকে দেখে তার কেমন ভয় লেগে গেল। প্রবল ব্যক্তিত্ব এ নারীর। এর সামনে নিজেকে ক্ষুদ্র লাগল। ঢোক গিলে বলল, 'কয়েক বছর আগে আমাদের কোম্পানিতে অস্বাভাবিক কিছু ব্যয় হয়। আপনার বাবা এবং বোর্ডের

পরিচালকরা সিদ্ধান্ত নেন ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নেবেন। আমরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে সাড়ে ছয়শো মিলিয়ন ডলার ঋণ নিই। এর মধ্যে কিছু লোন ডিউ পড়ে আছে।'

'ওভারডিউ', এলিজাবেথ শুধরে দিল তাকে।

'জ্বি, ম্যাম। ওভারডিউ।'

'আমরা ওভারডিউ লোনগুলো শোধ করিনি কেন?'

'কারণ কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কোম্পানির ক্যাশ ফ্লো কমে যায়। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা ব্যাংকের কাছে গিয়ে সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করি..'

এলিজাবেথ ক্রাউসকে লক্ষ্য করছে। ভাবছে কার পক্ষে আছে ও।

'আমাদের সমস্যার কথা এখন সবাই জানে', বলে চলেছে ক্রাউস। 'বিজনেসের দুনিয়া একটা জঙ্গল। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি টের পেয়ে যায় আপনি আহত, ওরা আপনাকে খুন করতে আসবে।' বিরতি দিল সে, ইতস্তত ভঙ্গিতে যোগ করল, 'ওরা খুন করতে এগিয়ে আসছে।'

'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তো আমাদের ব্যাংকারদের কাছ থেকেও লোন নিচ্ছে।' মন্তব্য করল এলিজাবেথ।

'জি, তবে ব্যাংকগুলোর লোন দেয়ার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ওরা যদি বুঝতে পারে এ বি'র চেয়ে ভালো রিস্ক—'

'ওরা তাই ভাবছে নাকি?'

চুলের মধ্যে আঙুল ঢোকাল ক্রাউস, নার্ভাস লাগছে। 'আপনার বাবা মারা যাওয়ার পর হের জুলিয়াস বাডরাট আমাকে অনেকবার ফোন করেছেন। আমরা যাদের সঙ্গে কাজ করছি সেই ব্যাঙ্কিং কনসোর্টিয়ামের তিনি প্রধান ব্যক্তি।'

'হের বাডরাট কী চান?'

এলিজাবেথ জানে কী জবাব আসবে।

'তিনি জানতে চাইছেন রোফ অ্যান্ড সন্সের নতুন প্রেসিডেন্ট কে?'

'আপনি জানেন নতুন প্রেসিডেন্ট কে?' প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

'না, ম্যাম।'

'আমি।' বিস্ময়টুকু হজম করার সময় ওকে দিল এলিজাবেথ। 'খবরটা শুনলে হের বাডরাটের প্রতিক্রিয়া কীরকম হবে?'

'উনি ব্যাপারটা কীভাবে নেবেন আমি জানি না, ম্যাম।'

'আমি তার সঙ্গে কথা বলব', চেয়ারে হেলান দিল এলিজাবেথ। 'আচ্ছা একটা কথা। আমার জায়গায় আপনি হলে কী করতেন ড. ক্রাউস?'

দৃঢ় গলায় বলল ক্রাউস : 'খুব সাধারণ একটা ব্যাপার। রোফ অ্যান্ড সন্সের বিশাল অ্যাসেট রয়েছে। পাবলিকের কাছে কিছুটা স্টক বিক্রি করে দিলেই আমাদের সমস্ত ব্যাংক লোন শোধ করা যেত।'

এলিজাবেথ এখন জানে ক্রাউস কার পক্ষে।

বাইশ

হামবুর্গ
শুক্রবার, ১ অক্টোবর
রাত ২টা

সাগর থেকে ধেয়ে আসছে বাতাস। ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে। হামবুর্গের রিপারবাহন সেকশনের রাস্তায় পর্যটকদের ভিড়। পাপোর নগরীর নিষিদ্ধ আনন্দের স্বাদ নিতে এসেছে তারা। রিপারবাহনে সবকিছু পাওয়া যায়— পানীয়, মাদক, নারী কিংবা পুরুষ। পয়সা ফেললে সব মেলে।

মেইন স্ট্রিটের বারগুলোয় ভূতুড়ে আলো। গ্রস ফ্রাইহিট বারে চলছে নোংরা স্ট্রিপ শো। এক ব্লক দূরে, হারবারস্ট্রাসে শুধু পথিকদের পদচারণা। রাস্তার দুপাশের ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর খোলা জানালায় স্রেফ স্বচ্ছ নাইটগাউন পরে আছে বারবনিতারা। দেখা যাচ্ছে সব। রিপারবাহন প্রকাণ্ড মার্কেট। এটা একটা বিশাল মাংসের দোকান, যখন যে মাংসের প্রয়োজন, টাকা দিলেই চলে আসবে হাতে। বিকৃত যৌনতার চরম আনন্দের সন্ধান মিলবে এখানে। রিপারবাহনে বারো বছরের কিশোর কিংবা কিশোরীকে আপনি কিনতে পারবেন, মা এবং কন্যাকে একসঙ্গে বিছানায় নিয়ে যেতে পারবেন। অসংখ্য নারীপুরুষের দলবদ্ধ যৌনমিলন দেখে কামোত্তেজনা সৃষ্টির ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। কিশোরী আর তরুণী পতিতারা খাটো স্কার্ট আর গায়ে সেঁটে থাকা ব্লাউজ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফুটপাথে।

ক্যামেরাম্যান ধীরপায়ে রাস্তায় হাঁটছে। ঝলমলে পোশাক পরা মেয়ে আর ছেলেগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। সে তাদেরকে অগ্রাহ্য করে বছর আঠারোর একটা তরুণীর দিকে এগিয়ে গেল। তরুণী স্বর্ণকেশী। একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে তার বান্ধবীর সঙ্গে। লোকটাকে দেখে মেয়েটি ঘুরল। হাসি ফোটাল মুখে। 'পার্টি হবে, ডার্লিং? আমি আর আমার বন্ধু তোমাকে সুন্দর একটা সময় উপহার দিতে পারব।'

লোকটা মেয়েটিকে দেখল। বলল, 'শুধু তুমি।'

অন্য মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

'কী নাম তোমার?'

'হিল্ডি।'

'সিনেমায় অভিনয় করবে, হিল্ডি?' জিজ্ঞেস করল ক্যামেরাম্যান।

ঠাণ্ডা চোখে তাকে দেখল মেয়েটি। 'হেরগট পুরোনো পচা হলিউডি ছবিতে আমি কাজ করব না।'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল ক্যামেরাম্যান। 'না, না, এটা ভালো প্রস্তাব। এটা একটা পর্নো ছবি। আমার এক বন্ধুর জন্য ছবিটা বানাচ্ছি।'

'পাঁচশো মার্ক দিতে হবে। অ্যাডভান্স।'

'ঠিক আছে।'

আফসোস করল মেয়েটা কেন আরও বেশি চাইল না। যাক, এর কাছ থেকে পরে বাড়তি কিছু আদায় করে নেবে। 'আমাকে কী করতে হবে?' জানতে চাইল হিল্ডি।

হিল্ডি নার্ভাস।

ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্টের বিছানায় নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে সে। ঘরের তিন পুরুষকে দেখছে এবং ভাবছে। কিছু একটা ভজকট আছে এখানে। বার্লিন, মিউনিখ এবং হামবুর্গের রাস্তার অভিজ্ঞতা তার অনুভূতিশক্তিকে প্রখর করেছে। আর এ উপলব্ধিক্ষমতার ওপর বিশ্বাস আছে তার। এ লোকগুলোর আচরণ যেন কেমন। এদেরকে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। ঘটনা ঘটার আগেই সে চলে যেত। কিন্তু ওরা তাকে ইতিমধ্যে পাঁচশো মার্ক দিয়েছে, ভালো কাজ দেখাতে পারলে আরও পাঁচশো দেবে বলেছে। ভালো কাজ দেখাবে হিল্ডি। সে একজন পেশাদার এবং নিজের কাজ নিয়ে গর্বও করে। পাশে শোয়া, ন্যাংটো পুরুষটার দিকে ফিরল সে। শক্তসমর্থ পেটা শরীর। গায়ে একগোছা লোমও নেই। লোকটার অনেক বয়স। তার চেহারা দেখে অস্বস্তি লাগছে হিল্ডির। তবে তাকে সবচেয়ে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে ঘরের দূরপ্রান্তে চুপচাপ বসে থাকা দর্শকটি। এর পরনে লম্বা কোট, মাথায় বড় হ্যাট, চোখ ঢেকে রেখেছে কালো চশমায়। দর্শক নারী না পুরুষ বুঝতে পারছে না হিল্ডি। সে ঘাড়ে বাঁধা একটা লাল রিবন হাত দিয়ে স্পর্শ করল। বুঝতে পারল না ওরা তাকে এটা কেন গলায় বাঁধতে বলেছে। ক্যামেরাম্যান বলল, 'ঠিক আছে। আমরা এখন প্রস্তুত। অ্যাকশন।'

ক্যামেরা ঘরঘর শব্দে চলা শুরু করল। কী করতে হবে বলাই আছে হিল্ডিকে। লোকটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। হিল্ডি কাজ শুরু করে দিল।

জিভ আর ঠোঁট ব্যবহার করল সে। লোকটার কান আর ঘাড় চেটে নেমে এল বুকে। তারপর পেট ছুঁয়ে কুঁচকি এবং পুরুষাঙ্গে। এরপর দুই পা, পায়ের আঙুলও চুষল সে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে ওর সঙ্গী, দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লিঙ্গ। লোকটার পেটের ওপর গড়িয়ে চলে এল হিল্ডি, এখন শুধু জিভ ব্যবহার করছে। কামোত্তেজনা জাগানোর যত উপায় আছে এক এক করে সবগুলো প্রয়োগ করল সে। লোকটা এখন পুরোপুরি জেগে উঠেছে। তার পুরুষাঙ্গ পাথরের মতো শক্ত।

‘ওর ভেতরে ঢোকো’, আদেশ করল ক্যামেরাম্যান। লোকটা গড়ান দিয়ে চলে এল হিল্ডির গায়ের ওপর। যোনিতে প্রবেশ করাল তার জিনিস। কোমর নাড়াতে শুরু করল। হিল্ডিও একই সঙ্গে সাড়া দিতে লাগল। তার নিতম্ব দ্রুত নড়ছে। ঘরের কোণের দর্শক ঝুঁকে এল সামনের দিকে, রমণরত নারী-পুরুষের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। বিছানায় শোয়া মেয়েটি চোখ বুজল।

মেয়েটা সব নষ্ট করে ফেলবে!

‘ওকে চোখ খুলতে বলো’, চেঁচিয়ে উঠল দর্শক।

পরিচালকের হুকুম এল, ‘অফনে ডাই অজেন।’

বিস্মিত হয়ে চোখ মেলে চাইল হিল্ডি। তার শরীরের ওপর উঠে বসা লোকটাকে দেখল। ভালোই খেলুড়ে। এ-ধরনের মিলন পছন্দ করে হিল্ডি। শক্ত এবং জোরে জোরে। লোকটার কোমর দোলানোর গতি আগের চেয়ে দ্রুত হয়ে উঠল। সাড়া দিল মেয়েটিও। ওর সাধারণত রেতঃপাত হয় না, শুধু বান্ধবীর সঙ্গে মিলনের সময় ছাড়া। খদ্দেরদের সঙ্গে সে রেতঃপাত হওয়ার অভিনয় করে। তবে কাস্টমার কখনোই ফাঁকিটা ধরতে পারে না। কিন্তু ক্যামেরাম্যান তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে রেতঃপাত না হলে সে অতিরিক্ত টাকাটা পাবে না। নিজেকে রিল্যাক্স হতে দিল হিল্ডি, টাকা দিয়ে কী কী কিনবে তা ভাবতে লাগল। টের পেল রেতঃপাতের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে সে।

‘আসছে!’ গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা। ‘আমার আসছে।’

শরীর থরথর করে কাঁপছে হিল্ডির। ‘ওহ্ গড!’ শীৎকার করল ও। ‘আমার হয়ে আসছে। এই এই এল, উহ্!’

মাথা ঝাঁকাল দর্শক। চেঁচাল ক্যামেরাম্যান। ‘এখন –’

রমণরত পুরুষের শক্তিশালী হাত উঠে এল হিল্ডির ঘাড়ে। গাট্টাগোট্টা আঙুলগুলো চেপে ধরল তার শ্বাসনালি। চাপ বাড়াল। হিল্ডি লোকটার চোখে তাকাল। দৃষ্টি দেখে আতঙ্ক বোধ করল সে। চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু নিশ্বাস নিতে পারছে না। নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল সে। এদিকে রেতপাত হচ্ছে তার, ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর, ভলভল করে রস গড়িয়ে পড়তে লাগল দুই ঊরুর ফাঁক দিয়ে। কিন্তু লোকটা তাকে বজ্রমুষ্ঠিতে গলা চেপে ধরেই আছে। যেন গেঁথে ফেলেছে বিছানার সঙ্গে।

ঘরের কোণে বসে থাকা দর্শক বিস্ফারিত চোখে হিল্ডির রাগমোচন হওয়ার দৃশ্য এবং মৃত্যুযন্ত্রণা উপভোগ করছে।

মেয়েটির শরীর আরেকবার ঝাঁকি খেল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

তেইশ

জুরিখ
সোমবার, ৪ অক্টোবর
সকাল ১০ টা

এলিজাবেথ অফিসে ঢুকে দেখল টেবিলের ওপর তার নাম লেখা একটি খাম। মুখবন্ধ খামে 'গোপনীয়' কথাটা লেখা। ভেতরে কেমিকেল ল্যাবরেটরি রিপোর্ট। নিচে দস্তখত : এমিল জোয়েপলি। নানা টেকনিকাল টার্ম বোঝাই রিপোর্ট। এলিজাবেথ আগাগোড়া পড়ল। কিন্তু বুঝতে পারল না কিছুই। আবার পড়ল। আবার। প্রতিবার আগের চেয়ে ধীরগতিতে। অবশেষে যখন রিপোর্টের মূল বিষয়টি বুঝতে পারল কেট আরলিংকে বলল, 'আমি ঘণ্টাখানেকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।' সে এমিল জোয়েপলির কাছে গেল।

জোয়েপলির বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়, লম্বা, সরু, দাগে ভরা মুখ। মাথার টাকে সামান্য লালচুল এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অস্বস্তি নিয়ে নড়াচড়া করছে সে, যেন নিজের ছোট গবেষণাগারে দর্শনার্থীদের আগমনে অভ্যস্ত নয় সে।

'তোমার রিপোর্ট পড়েছি আমি', এলিজাবেথ বলল তাকে। 'তবে অনেক জায়গা বুঝতে পারিনি। আমাকে রিপোর্টটা একটু বুঝিয়ে বলো।'

সাথে সাথে জোয়েপলির নার্ভাসনেস দূর হয়ে গেল। চেয়ারের সামনে ঝুঁকে বসল সে, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি। দ্রুত কথা বলতে লাগল সে। তবে তার টেকনিক্যাল বিষয়গুলো মাথায় ঢুকল না এলিজাবেথের। শুধু বুঝতে পারল জোয়েপলি এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে যাতে সাফল্য পেলে মানুষ অনন্ত যৌবন পাবে। আর বুড়িয়ে যেতে হবে না তাকে। রীতিমতো রোমাঞ্চ অনুভব করল এলিজাবেথ। জোয়েপলি গবেষণায় সফল হলে গোটা বিশ্বে রীতিমতো বিপ্লব সৃষ্টি হবে। জোয়েপলির মতে, মানুষ কেন একশো বা দুশো বছর বেঁচে থাকতে পারবে না— এ ব্যাপারটা বোধগম্য নয় তার।

'এরজন্য ইনজেকশন দেয়ারও প্রয়োজন নেই', বলল জোয়েপলি। 'এ ফর্মুলার উপাদান বড়ি কিংবা ক্যাপসুলে থাকবে। খেয়ে নিলেই হল।'

এ গবেষণা সফল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সমাজে বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি হবে। হাজার কোটি ডলার ব্যবসা করতে পারবে রোফ অ্যান্ড সন্স। পঞ্চাশোর্ধ্ব এমন

কোনো লোক নেই যে এ বড়ি কিনবে না। এলিজাবেথ উত্তেজনা দমন করে রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'প্রজেক্ট নিয়ে কদ্দুর এগিয়েছ?'

'রিপোর্টে লিখেছি আমি গত চার বছর ধরে নানা প্রাণীর ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছি। সাম্প্রতিক সব ফলাফল ইতিবাচক। এখন শুধু মানুষের ওপর পরীক্ষা বাকি।' জোয়েপলির উৎসাহ ভালো লাগল এলিজাবেথের।

'এ ব্যাপারটা আর কে জানে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আপনার বাবা জানতেন। এটা একটা রেড ফোল্ডার প্রজেক্ট। টপ সিকিউরিটি। আমি শুধু কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং বোর্ডের একজন সদস্যের কাছে রিপোর্ট করি।'

গা শিরশির করল এলিজাবেথের। 'কোন্ সদস্য?'

'মি. ভালথার গাসনার।'

একমুহূর্ত নীরব থেকে এলিজাবেথ বলল, 'আজ থেকে তুমি সরাসরি আমাকে রিপোর্ট দেবে। শুধু আমাকে।'

জোয়েপলি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে 'জ্বি, মিস রোফ।'

'আমরা এ ওষুধ কবে নাগাদ বাজারে ছাড়তে পারব?'

'সবকিছু ঠিকঠাক চললে আঠারো থেকে চব্বিশ মাসের মধ্যে।'

'বেশ, তোমার যদি কিছু দরকার হয়—টাকা, অতিরিক্ত সাহায্য, ইকুইপমেন্ট—আমাকে জানিয়ো। আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব তুমি কাজ করবে।'

'জ্বি, ম্যাম।'

সিধে হল এলিজাবেথ, সাথে সাথে এমিল জোয়েপলি লাফ মেরে খাড়া হল।

'আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল', হাসল সে। লাজুক ভঙ্গিতে যোগ করল, 'আমি আপনার বাবাকে খুব পছন্দ করতাম।'

'ধন্যবাদ।' বলল এলিজাবেথ। ওর বাবা এ প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতেন! কোম্পানির স্টক বিক্রি করতে না-চাওয়ার পেছনে এটাও কি একটা কারণ ছিল?

'রেড ফোল্ডার প্রজেক্ট কীভাবে কাজ করত?'

কেট আরলিং জিজ্ঞেস করল, 'শুরু থেকে বলব?'

'শুরু থেকে।'

'বেশ, আপনি জানেন বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে আমাদের শতাধিক নতুন পণ্য রয়েছে। ওগুলো—'

'এগুলোর অথারাইজ কে করে?'

'একটি নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ পর্যন্ত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এর সঙ্গে জড়িত থাকে।' জবাব দিল কেট।

'কত টাকা?'

'পাঁচ হাজার ডলার।'

'তারপর?'

'তারপর বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন। তবে প্রারম্ভিক পরীক্ষায় উতরে না-যাওয়া পর্যন্ত কোনো প্রজেক্ট রেড ফোল্ডার ক্যাটাগরিতে আসতে পারে না।'

'তার মানে সফল হওয়ার সুযোগ থাকলেই তা কেবল সম্ভব?' জানতে চাইল এলিজাবেথ।

'জ্বি।'

'এটা কীভাবে প্রটেক্ট করা হয়?'

'এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রজেক্ট। সমস্ত কাজ স্থানান্তর করা হয় আমাদের একটি হাই-সিকিউরিটি ল্যাবরেটরিতে। সাধারণ ফাইল থেকে সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলে রাখা হয় রেড ফোল্ডার ফাইলে। এসব ফাইল দেখার সুযোগ পান মাত্র তিনজন। প্রজেক্টের দায়িত্বরত বিজ্ঞানী, কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং বোর্ডের একজন সদস্য।'

'সে সদস্য করার সিদ্ধান্ত কে নেন?' প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

'আপনার বাবা ভালথার গাসনারকে নির্বাচিত করেছিলেন।' কথাটা বলেই বুঝল ভুল করে ফেলেছে সে। এলিজাবেথ তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, কেট। এতেই চলবে।'

এলিজাবেথ জোয়েপলির প্রজেক্টের ব্যাপারে কিছু বলেনি। তবে কেট বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। দুটো সম্ভাবনা রয়েছে। হয় স্যাম কেটকে বিশ্বাস করে জোয়েপলির প্রজেক্টের কথা বলেছিলেন অথবা সে নিজে থেকে ওটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে। কারও মাধ্যমে।

এ প্রজেক্টে কোনো ভুল-ত্রুটি ঘটতে দেয়া যাবে না। এলিজাবেথ নিজে সিকিউরিটি চেক করবে। ভালথার গাসনারের সঙ্গে কথা বলবে। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল ও। এর চেয়ে ভালো একটা উপায় আছে।

ওইদিন সন্ধ্যাবেলা এলিজাবেথ বাণিজ্যিক এয়ারলাইনারে বার্লিন রওনা হল।

নার্ভাস হয়ে আছে ভালথার গাসনার।

কুরফুরস্টানন্যামের প্যাপিলনের দোতলার কিনারার একটা বুথ দখল করেছে দুজনে। এর আগে এলিজাবেথ যতবার বার্লিন এসেছে ভালথার প্রতিবার নিজের বাসায় ওকে নিয়ে গিয়ে ডিনার খাইয়েছে। এবার সে ওই প্রসঙ্গেই যায়নি। এই রেস্টুরেন্টে এসেছে। অ্যানাকে ছাড়া।

ভালথার গাসনার এখনও আগের মতো সুদর্শন, ছেলেমানুষি ভাবটা ধরে রেখেছে চেহারায়। তবে সে যে টেনশনে আছে মুখ দেখেই বোঝা যায়। অ্যানার কথা জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ। অস্পষ্ট গলায় জবাব দিল ভালথার। 'ওর শরীরটা ভালো নেই। তাই আসতে পারেনি।'

'সিরিয়াস কিছু নয় তো?'

'না, না। ও ঠিক হয়ে যাবে। বাসায় আছে। বিশ্রাম নিচ্ছে।'

'আমি ওকে ফোন করব—'

ভালথার এভাবে আগে কখনও কথা বলেনি এলিজাবেথের সঙ্গে। সে সবসময়ই স্বতঃস্ফূর্ত থাকত, অনর্গল কথা বলত।

এমিল জোয়েপলির প্রসঙ্গ তুলল এলিজাবেথ। 'আমি ওকে নিষেধ করেছি তোমার কাছে আর রিপোর্ট না করতে।'

থমথমে দেখাল ভালথারের চেহারা। 'কেন?'

'এর মধ্যে তোমার কিছু করার নেই, ভালথার। এটা আমি নিজের মতো করে করতে চাই।'

মাথা ঝাঁকাল ভালথার। 'আচ্ছা।' তারপর জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'এলিজাবেথ, কোম্পানিতে অ্যানার প্রচুর স্টক রয়েছে। তুমি হ্যাঁ-না বলা পর্যন্ত ওই স্টক বিক্রি করা যাবে না। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি—'

'দুঃখিত ভালথার। আমি এ মুহূর্তে স্টক বিক্রি করতে দিতে পারব না।'

আবার মেঘ ঘনাল ভালথারের চেহারায়।

চব্বিশ

হের জুলিয়াস বাডরাট রোগা-পাতলা, কালো স্যুটে তাকে লাগছে একটা প্রেয়িং ম্যান্টিসের মতো। রোফ অ্যান্ড সন্সের বোর্ডরুমে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছেন তিনি এলিজাবেথের সামনে। তার সঙ্গে আরও পাঁচজন কর্মকর্তা রয়েছেন। সবার পরনে ওয়েস্টকোটসহ কালো স্যুট, সাদা শার্ট এবং গাঢ় রঙের টাই। মিটিং শুরু হওয়ার আগে কেট কফি আর সুস্বাদু পেস্ট্রি পরিবেশন করেছে। কিন্তু উপস্থিত অভ্যাগতদের কেউ তা মুখে তোলেননি। তারা এলিজাবেথের লাঞ্চের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটা অশুভ লক্ষণ।

এলিজাবেথ বলল, 'সবার আগে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এখানে আসার জন্য।'

অভ্যাগতরা বিড়বিড় করে কী বললেন বোঝা গেল না। গভীর দম নিল এলিজাবেথ। 'আপনাদেরকে এখানে ডেকে আনার উদ্দেশ্য রোফ অ্যান্ড সন্সের কাছে আপনাদের পাওয়া লোনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন জুলিয়াস বাডরাট। 'দুঃখিত, মিস রোফ। আমরা আগেই বলেছি—'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি', বলল এলিজাবেথ। ঘরের বাসিন্দাদের ওপর চোখ বুলাল সে। 'আপনাদের জায়গায় আমি হলে আমিও এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতাম, ভদ্রমহোদয়গণ।'

তারা সবাই তাকালেন এলিজাবেথের দিকে। তারপর পরস্পরের সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। বিভ্রান্ত।

বলে গেল এলিজাবেথ, 'বাবা যখন কোম্পানি চালাতেন, লোনের ব্যাপারে আপনারা অবগত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসায় অনভিজ্ঞ একজন নারীর জন্য আপনারা কেন লোনের মেয়াদ বৃদ্ধি করবেন?'

শুকনো গলায় বললেন বাডরাট, 'আপনার প্রশ্নের মধ্যেই জবাব রয়েছে, মিস রোফ। আমাদের কোনো ইচ্ছে নেই—'

এলিজাবেথ বলল, 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।' তারা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন এলিজাবেথের দিকে। এলিজাবেথও তাদের দিকে এক এক করে তাকাল। এঁরা সুইস ব্যাঙ্কার, সমাজের অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি, অর্থনৈতিক বিশ্বে

অন্যদের চোখে ঈর্ষার পাত্র। তাঁরা সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন, অধৈর্যভাব কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে কৌতূহল।

'রোফ অ্যান্ড সন্সকে আপনারা বহুদিন ধরে জানেন', বলে চলল এলিজাবেথ। 'আমার ধারণা আপনাদের অনেকেই আমার বাবাকে চিনতেন এবং সম্মানও নিশ্চয় করতেন।' কয়েকজন ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালেন।

'আমার ধারণা', বলল এলিজাবেথ, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যখন জানতে পেরেছেন বাবার জায়গায় আমি বসেছি, নির্ঘাত সকালের কফি পান করতে গিয়ে বিষম খেয়েছেন।'

একজন ব্যাংকার হেসে উঠলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস রোফ। আমি আমার কলিগদের সবার পক্ষ থেকেই বলছি কফি পান করতে গিয়ে সত্যি বিষম খেয়েছিলাম।'

মিষ্টি হাসল এলিজাবেথ। 'এজন্য আপনাদেরকে দোষ দিই না। আমিও হয়তো এভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখাতাম।'

আরেকজন ব্যাংকার বললেন, 'আমি জানতে চাইছি, মিস রোফ, আমাদেরকে এখানে ডেকেছেন কেন?'

'আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি কারণ', বলল এলিজাবেথ, 'আপনারা বিশ্বের সেরা ব্যাঙ্কার। আর রোফ অ্যান্ড সন্স হল বিশাল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। আমি বাবার চেয়ারে না বসলে এর বিশালত্ব বুঝতে পারতাম না। আমি জানি না এ কোম্পানি বিশ্বের কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে, আমার জানা নেই মেডিসিনে আমাদের কতবড় অবদান রয়েছে। কিংবা কত হাজার মানুষ এ কোম্পানির ওপর নির্ভর করে সংসার চালাচ্ছে। যদি—'

বাধা দিলেন জুলিয়াস বাডরাট। 'সবই ঠিক আছে। তবে আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে আসছি। আমি বুঝতে পারছি আপনাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে আপনি যদি কোম্পানির স্টক বাজারে ছেড়ে দেন তাহলে আমাদের লোন মেটানোর মতো পর্যাপ্ত টাকা পেয়ে যাবেন।'

লোকটার প্রথম ভুল, ভাবল এলিজাবেথ। আমি বুঝতে পারছি একথা বলার পরামর্শ তোমাকে দেয়া হয়েছে। কারণ বোর্ড অব ডিরেক্টরদের বৈঠক হয় অত্যন্ত গোপনে। বৈঠকের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই বাইরের লোকের জানার কথা নয়, যদি-না বিষয়টা ফাঁস করে দেয়া হয়। কেউ একজন এলিজাবেথের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এলিজাবেথ খুঁজে দেখবে কে সে।

'একটা কথা জানতে চাই', বলল এলিজাবেথ। 'আপনাদের লোন যদি শোধ করে দেয়া হয়, টাকাটা কোত্থেকে এল তা জানার কি আপনাদের দরকার আছে?'

জুলিয়াস বাডরাট স্থিরদৃষ্টিতে এলিজাবেথকে দেখছেন। শেষে বললেন, 'না, আমরা আমাদের টাকা ফেরত পেলেই খুশি।'

এলিজাবেথ ঝুঁকে এল সামনের দিকে। জরুরি গলায় বলল, 'টাকাটা কোত্থেকে আসবে সেটা যেহেতু আপনাদের ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না আর যেহেতু আপনারা জানেন রোফ অ্যান্ড সন্স কোনোদিনই তার ব্যবসা বন্ধ করবে না, কাজেই আমি শুধু অতিরিক্ত ক'টা দিন সময় চাইছি।'

শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিলেন বাডরাট। 'বিশ্বাস করুন, মিস রোফ। আপনার প্রতি আমরা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। আমরা জানি মানসিক কী যাতনার মাঝ দিয়ে আপনি যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা পারব না।'

'তিন মাস', বলল এলিজাবেথ। 'নব্বই দিন। আপনাদের বাড়তি সুদসহ টাকাটা শোধ করে দেয়া হবে।'

নীরবতা নেমে এল ঘরে। নেতিবাচক নীরবতা। তাদের ঠাণ্ডা,বিরূপ চেহারাগুলো দেখছে এলিজাবেথ। শেষ জুয়োটা খেলার সিদ্ধান্ত নিল ও।

'আ—আমি জানি না বিষয়টা প্রকাশ করা ঠিক হচ্ছে কি না।' কণ্ঠে ইতস্তত ভঙ্গি ফোটাল এলিজাবেথ। 'আমার অনুরোধ ব্যাপারটা গোপন রাখবেন।' লক্ষ্য করল চেহারাগুলোর মধ্যে আবার আগ্রহের ছাপ ফুটেছে। 'রোফ অ্যান্ড সন্স একটা দুর্দান্ত জিনিস বাজারজাত করার দ্বারপ্রান্তে। গোটা ওষুধ-শিল্পে এর ফলে একটা বিপ্লব ঘটে যাবে।' রহস্য উস্কে দিতে বিরতি দিল ও। 'আমরা এমন একটি ওষুধ আবিষ্কার করতে চলেছি যা বাজারে গেলে বাজারের অন্য কোনো ওষুধ তার কাছে পাত্তা পাবে না।'

ঘরের আবহাওয়া বদলে গেছে, টের পেল এলিজাবেথ। জুলিয়াস বাডরাট ঢোঁপ গিললেন। 'আ—ওটা কী ধরনের ওষুধ?'

মাথা নাড়ল এলিজাবেথ। 'দুঃখিত, হের বাডরাট। আমি বোধহয় একটু বেশিই বলে ফেললাম। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি ব্যবসার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটা হতে চলেছে বৃহত্তম পরিবর্তন। আমরা এর পেছনে বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় করছি।'

পরস্পরের দিকে মুখ তাকাতাকি করছেন ব্যাঙ্কাররা, নীরবে সংকেত-বিনিময়। নীরবতা ভাঙলেন হের বাডরাট, 'আমরা আপনাকে নব্বই দিন সময় দিলে নিশ্চয় আশা করতে পারি প্রধান ব্যাংক হিসেবে রোফ অ্যান্ড সন্সের আগামী সমস্ত ট্রানজেকশন আমাদের দ্বারাই সম্পাদিত হবে।'

'অবশ্যই।'

আবার নীরব সংকেত বিনিময় হল। হের বাডরাট জানতে চাইলেন। 'নব্বই দিনের মধ্যে আমাদের টাকা শোধ করে দিচ্ছেন তো?'

'জ্বি।'

হের বাডরাট কিছুক্ষণ শূন্যে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চাইলেন এলিজাবেথের দিকে। শেষে কলিগদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তাঁরা ইতিবাচক সংকেত দিলেন। 'আমি আমার দিক থেকে এ প্রস্তাবে রাজি আছি। আমি মনে করি না অতিরিক্ত সুদসহ টাকাটা ফেরত পেলে ব্যাঙ্কের কোনো ক্ষতি হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন একজন ব্যাংকার। 'আপনি যা ভালো মনে করেন জুলিয়াস—'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল এলিজাবেথ। নব্বই দিন সময় পেয়েছে ও।

এ সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত ওকে কাজে লাগাতে হবে।

পঁচিশ

এ যেন ঝড়ের চোখের মধ্যে পড়ে যাওয়া। জায়ারের কারখানা, গ্রিনল্যান্ডের গবেষণাগার, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার অফিস—পৃথিবীর চার কোণ থেকে হেডকোয়ার্টার্সের শত শত ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট এসে হাজির হতে লাগল এলিজাবেথের ডেস্কে। নতুন পণ্য বিক্রি, স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রজেকশন, অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন, গবেষণামূলক কর্মসূচির হাজারো রিপোর্ট।

নতুন ফ্যাক্টরি তৈরির সিদ্ধান্ত, পুরোনোগুলো বিক্রি, নির্বাহীদের ভাড়া কিংবা চাকরিচ্যুতি—সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হল এলিজাবেথকে। সব ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেল ও, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিতে হল ওকে। যেভাবে স্যাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বাবার সঙ্গে তিনবছর কাজ করার অভিজ্ঞতা বেশ কাজে লাগছে এলিজাবেথের। দেখল, ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশিই জানে কোম্পানি সম্পর্কে। এলিজাবেথ একসময় এটাকে রাজ্য ভাবত, এখন দেখছে এটা সাম্রাজ্য। প্রেসিডেন্টের অফিস সম্রাটের ঘর। ওর কাজিনদের দায়িত্বের এলাকা ভাগ করে দেয়া হলেও দেশের বাইরের কাজও তাদের করতে হয়। ফলে সারাক্ষণ দেশ-বিদেশ সফর করতে হচ্ছে তাদেরকে।

এলিজাবেথ শীঘ্র একটা সমস্যা ধরতে পারল। আর সেটা হল পুরুষশাসিত সমাজে একা ও এক সুন্দরী নারী। কেউ মুখের ওপর বলার সাহস পায়নি, তবে তাদের আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি বুঝিয়ে দিয়েছে যেহেতু ও কমবয়েসী এক তরুণী কাজেই এসব ব্যবসা-বাণিজ্য ওকে মানায় না। ওর উচিত বাড়িতে থাকা। রান্না করা কিংবা ঘুমানো। কঠিন বিষয়গুলো পুরুষদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত।

প্রতিদিন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রধানদের সঙ্গে এলিজাবেথের মিটিং থাকে। তবে সবাই বিদ্বেষপরায়ণ নয়, কেউ কেউ শিকারের ধান্ধায় থাকে। এক অপূর্ব সুন্দরী প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে আছে, পুরুষ-অহমবোধে ব্যাপারটা আঘাত করে খুব। তাদের মনের কথা খুব সহজে পড়া যায়। এ মেয়েকে বিছানায় নেয়া গেলে আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। এ যেন সার্ডিনিয়ার সেই ছেলেগুলোর প্রাপ্তবয়স্ক সংস্করণ।

কিন্তু এরা এলিজাবেথকে চিনতে ভুল করেছে। তারা ওর বুদ্ধিমত্তাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। এটা তাদের ভুল। তাদের সবচেয়ে বড় ভুল তারা এলিজাবেথের

শক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। সে একজন রোফ, বুড়ো স্যামুয়েল আর বাপের রক্ত বইছে এলিজাবেথের শরীরে, সে এদের সংকল্প আর শক্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে।

পুরুষরা যখন এলিজাবেথকে ব্যবহার করতে চায়, উল্টো তাদেরকেই ব্যবহার করে সে। সে পুরুষদেরকে কথাবলার সুযোগ দিয়ে নিজে শোনে। এবং শেখে।

প্রতিরাতে দুটো ভারী ব্রিফকেস বোঝাই করা রিপোর্ট নিয়ে বাড়ি ফেরে এলিজাবেথ। পড়ে। কখনও কখনও ভোর চারটা বেজে যায় কাজ শেষ হতে হতে।

এক সন্ধ্যায় এক ফটোগ্রাফার এলিজাবেথের একটা ছবি তুলল। অফিস থেকে সেক্রেটারিসহ বেরিয়ে আসছে। সেক্রেটারির হাতে দুটো ব্রিফকেস। পরদিন বিভিন্ন পত্রিকায় ওই ছবিটি ছাপা হল। নিচে ক্যাপশন : *কর্মঠ উত্তরাধিকারিণী।*

রাতারাতি আন্তর্জাতিক সেলেব্রিটিতে পরিণত হল এলিজাবেথ। এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী মাল্টিবিলিয়ন ডলার কোম্পানির মালিক— এ গল্প লুফে নিল পাঠক। এলিজাবেথ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং নিরহংকার—এ-ধরনের সেলেব্রিটি খুব কমই হয়। সাংবাদিকরা এলিজাবেথের সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে সে মানা করে না। এভাবে কোম্পানির ক্ষতিগ্রস্ত ভাবমূর্তি চাঙা করে তোলার চেষ্টা করে। তার কাজিনরা সপ্তাহে একদিন জুরিখে উড়ে আসে সাপ্তাহিক মিটিঙে অংশ নিতে। তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় পর্যবেক্ষণ করে এলিজাবেথ। ক্লু খুঁজে পেতে চায় এদের মধ্যে কে আছে সে-জন, বিস্ফোরণে যার মানুষ মেরে ফেলতে বুক কাঁপে না। যে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর কাছে গোপন তথ্য পাচার করে, ধ্বংস করে দিতে চায় রোফ অ্যান্ড সন্সকে। ওদের কাজিনদের মধ্যেই কেউ একজন হবে।

ইভো পালাজি। সর্বদা হাসিখুশি উষ্ণ একজন মানুষ।

অ্যালেক নিকলস। প্রকৃত একজন ভদ্রলোক। এলিজাবেথের প্রয়োজনে সব সময় পাশে আছেন।

চার্লস মার্টেল। ভিতু স্বভাবের। তবে ভিতু মানুষরা দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে হিংস্র হয়ে ওঠে।

ভালথার গাসনার। সুদর্শন, বাইরে বন্ধুবৎসল। কিন্তু ওর ভেতরে কী আছে? সে তার চেয়ে তেরো বছরের বড় অ্যানাকে বিয়ে করেছে। প্রেম, নাকি টাকার জন্য?

এলিজাবেথ এদের সঙ্গে যখন থাকে, তাদেরকে সে লক্ষ্য করে, কথা শোনে। চিলির বিস্ফোরণের ঘটনা বলে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চায়। কিন্তু কিছুই জানতে পারে না। দুর্বৃত্ত যেই হোক, অত্যন্ত চতুর সে। তবে একে ফাঁদে ফেলতে হবে। রিপোর্টে লেখা স্যামের কথা মনে পড়ে গেল এলিজাবেথের : *বাস্টার্ডটাকে ফাঁদে ফেলো।* এলিজাবেথকে একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।

এলিজাবেথের এখন বেশিরভাগ সময় কাটে উড়োজাহাজে। সে ডেস্কের ওপরের ড্রয়ারে পাসপোর্ট রেখে দিয়েছে। সপ্তাহে অন্তত একদিন কায়রো,

গুয়াতেমালা কিংবা টোকিও থেকে জরুরি ফোন আসে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আধডজন কর্মচারী নিয়ে প্লেনে চড়তে হয় এলিজাবেথকে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সামাল দিতে।

সে বোম্বে, পুয়ের্তো ভাল্লারাটার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারখানার ম্যানেজারদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে। এতে তারা খুশি হয়, স্বয়ং মালিককে কাছে পেয়ে বেড়ে যায় কাজের গতি।

এলিজাবেথ এমিল জোয়েপলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে। তার সঙ্গে সবসময় প্রাইভেট লাইনে কথা বলে। জোয়েপলি জানায় তার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে। এলিজাবেথ বলে জোয়েপলির যে-কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে যেন তাকে জানায়। ইচ্ছে করে তাগাদা দেয় আরও দ্রুত কাজ করার জন্য। কারণ ব্যাংকের বেঁধে দেয়া সময় ফুরিয়ে আসছে। তবে জোয়েপলিকে চাপ দিয়ে লাভ নেই। ধৈর্য ধরতে হবে। এলিজাবেথ জানে ব্যাংকের টাকা ফেরত দেয়ার সময়সীমার মধ্যে জোয়েপলির গবেষণা শেষ নাও হতে পারে। তবে তার একটা পরিকল্পনা আছে। সে জুলিয়াস বাডরাটকে নিয়ে একদিন ল্যাবরেটরিতে যাবে। বাডরাট নিজে সব ঘুরে দেখুক। তারপর ব্যাংক এলিজাবেথকে যতদিন সময় লাগবে, দেবে।

রিজ উইলিয়ামসের সঙ্গে আগের চেয়ে বেশি কাজ করছে এলিজাবেথ। অনেক সময় কাজ করতে করতে রাত গভীর হয়ে যায়। বেশিরভাগ সময় শুধু দুজনে থাকে, অফিসের প্রাইভেট ডাইনিং-রুমে ডিনার সারে অথবা এলিজাবেথের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে। এলিজাবেথ রিজের প্রতি তীব্র শারীরিক তৃষ্ণা অনুভব করে। রিজ করে কি না জানে না। করলেও আচরণে তার প্রকাশ নেই। বেশ কয়েকবার রিজকে কোম্পানির স্যাবোটাজ হওয়ার কথা বলতে চেয়েছে এলিজাবেথ। পারেনি। এখনও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সময় আসেনি। এলিজাবেথকে এ ব্যাপারে আরও জানতে হবে।

নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস বেড়েই চলেছে এলিজাবেথের। এক সেলস মিটিঙে তারা নতুন একটি হেয়ার-কন্ডিশনার নিয়ে বৈঠক করছিল। পণ্যটির বাজার পড়ে গেছে। এক সেলস নির্বাহী অভিযোগের সুরে বলল, 'ওষুধের দোকান থেকে আমাদের হেয়ার-কন্ডিশনার ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমাদের আরও বিজ্ঞাপন প্রচার করা দরকার।'

'এ পণ্যের জন্য আমাদের বিজ্ঞাপনের বাজেটের বেশি ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে', আপত্তি জানাল রিজ। 'অন্য কোনো চেষ্টা করতে হবে।'

এলিজাবেথ বলল, 'হেয়ার-কন্ডিশনার ওষুধের দোকান থেকে তুলে নাও।'

সবাই একসঙ্গে তাকাল ওর দিকে। 'কী!'

'এটা সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে', রিজের দিকে ফিরল এলিজাবেথ। 'আমাদের বিজ্ঞাপনী প্রচারণা চালিয়ে যাও। তবে কন্ডিশনার শুধু বিউটি সেলুনগুলোতে বিক্রির ব্যবস্থা করবে। এ জিনিস যেন সহজে হাতে পাওয়া না যায়। এ পণ্যের এরকম একটা ইমেজ দরকার।'

রিজ একমুহূর্ত ভেবে বলল, 'আইডিয়া মন্দ নয়। দেখি চেষ্টা করে।'

রাতারাতি বেড়ে গেল হেয়ার-কন্ডিশনারের বিক্রি।

রিজ প্রশংসার সুরে এলিজাবেথকে বলল, 'তোমার মুখটাই শুধু সুন্দর নয়, ঘটে বুদ্ধিও আছে।' হাসছে সে।

আমি তাহলে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছি! ভাবল এলিজাবেথ।

ছাব্বিশ

লন্ডন
শুক্রবার, নভেম্বর ২
বিকেল ৫টা

অ্যালেক নিকলস ক্লাবে একা বসে আছেন। স্টিম-বাথ নিচ্ছেন। এমন সময় বাষ্পে-ভরা ঘরের দরজা ঠেলে কোমরে তোয়ালে জড়ানো ঢুকল এক লোক। কাঠের বেঞ্চে, অ্যালেকের পাশে বসল সে। 'এখানে খুব গরম। তাই না, স্যার অ্যালেক?'

ঘুরলেন অ্যালেক। 'জন সুইনটন! আপনি এখানে ঢুকলেন কী করে?'

চোখ টিপল সুইনটন। 'শুনলাম আপনি নাকি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।' অ্যালেকের চোখের দিকে তাকাল সে।

'আপনি আমাকে আশা করেছিলেন, তাই না স্যার অ্যালেক?'

'না', জবাব দিলেন অ্যালেক। 'আমি আপনাকে বলেছি আমার আরও সময়ের দরকার।'

'আপনি এও বলেছেন আপনার কাজিন স্টক বিক্রি করবে এবং আপনি আমাদেরকে টাকা দিয়ে দেবেন।'

'ও — ও মত বদলে ফেলেছে।'

'ওর মত ফিরিয়ে আনা আপনার কর্তব্য, তাই না?'

'আমি চেষ্টা করছি— কিন্তু।'

'কোনো কিন্তু নয়', জন সুইনটন সরে এল অ্যালেকের পাশে, তাকে একপাশে সরে যেতে বাধ্য করল। 'আমরা আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে চাই না। কারণ পার্লামেন্টে আপনার মতো লোকের আমাদের দরকার আছে। তবে এরও একটা সীমা আছে।' সে অ্যালেকের দিকে ঝুঁকল। তিনি ওর কাছ থেকে সরে বসলেন। 'আমরা আপনার একটা উপকার করেছি। এখন আমাদেরকে সেই উপকার ফিরিয়ে দেয়ার সময় এসেছে। আমাদেরকে ড্রাগসের একটা চালান দিয়ে দিলেই চলবে।'

'না, এ অসম্ভব', বললেন অ্যালেক। 'আমি পারব না। কোনো উপায় নেই।'

অ্যালেক দেখলেন তাকে ঠেলতে ঠেলতে বেঞ্চের একেবারে কিনারে নিয়ে আসা হয়েছে, পাশেই বড় একটা গামলা বোঝাই গরম পাথর। 'সাবধান', বললেন

অ্যালেক। 'আমি—' সুইনটন অ্যালেকের হাত চেপে ধরল, টেনে নামাল গামলার উপর। অ্যালেক চামড়ায় উত্তাপ টের পেলেন। 'না!' পরমুহূর্তে তার হাত ঠেসে ধরা হল গরম পাথরের মধ্যে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি, গড়াগড়ি খেতে লাগলেন মেঝেতে। সুইনটন তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। আমরা আপনার ওপর লক্ষ্য রাখব।'

সাতাশ

বার্লিন
শনিবার, নভেম্বর ৩
সন্ধ্যা ৬-০০

অ্যানা রোফ গাসনার জানে না কতদিন সে আর এসব সহ্য করতে পারবে। নিজের বাড়িতে বন্দি সে। শুধু সপ্তাহে একদিন কাজের বুয়াটা এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে, জামা-কাপড় কেচে দিয়ে যায়। অ্যানা আর বাচ্চারা একদম একা, ভালথারের দয়ার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বাচ্চাদের ওপর নিজের ঘৃণা এখন আর চেপে রাখে না ভালথার। বাচ্চাদের ঘুমপাড়ানি গানও শোনাতে পারে না অ্যানা। গাঁক গাঁক করে চেঁচায় ভালথার। বাচ্চাদের সামনেই বলে, 'এগুলোর কবল থেকে রেহাই চাই আমি।' আজ এমন বিশ্রী ব্যবহার করল ভালথার অ্যানার সঙ্গে, আর সইতে পারল না মেয়েটা, অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে অ্যানা দেখল নিজের বিছানায় শুয়ে আছে সে। বিছানার পাশে রাখা ঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধ্যা ছ'টা। বাড়িটা নীরব। অস্বাভাবিক নীরব। প্রথমেই বাচ্চাদের কথা মনে পড়ল ওর। আতঙ্কের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। কাঁপতে কাঁপতে নামল বিছানা থেকে, টলতে টলতে দরজার দিকে পা বাড়াল। বাইরে থেকে বন্ধ। দরজায় কান পাতল ও। বাচ্চাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই।

এমনভাবে পা কাঁপছে যে ফোনের দিকে হেঁটে এগোতে রীতিমতো কষ্ট হল অ্যানার। নীরবে প্রার্থনা করল ও, তারপর ফোন তুলল। পরিচিত ডায়ালিং টোন শুনতে পেল। ইতস্তত করছে অ্যানা, ভয় পাচ্ছে ফোন করার কথা ভালথার জানতে পারলে না-জানি কী দশা করবে ওর। আর কিছু ভাবতে চাইল না অ্যানা, ১১০-এ ডায়াল করতে লাগল। হাত এমন কাঁপছে, ভুল নাম্বারে ফোন করে ফেলল ও। আবারও একই কাজ করল। ফোঁপাতে শুরু করল অ্যানা। হাতে সময় খুবই কম। কাঁপুনি বন্ধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে আবার রিং করল ও। এবার অলৌকিকভাবে একটা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল : 'থানা থেকে বলছি।'

একমুহূর্ত কথা জোগাল না অ্যানার মুখে। কণ্ঠটা একই কথা পুনরাবৃত্তি করল। এবার আর্তনাদ করে উঠল অ্যানা। 'Ja, Bitte! ich bih in Grosser gefahr. Bitte schiken sie jeamqden.'

এমন সময় ভালথার উদয় হল ওর সামনে। টান মেরে হাত থেকে কেড়ে নিল রিসিভার, ধাক্কা মেরে অ্যানাকে ফেলে দিল বিছানায়। তারপর মেঝেতে আছড়ে ফেলল ফোন, দেয়াল থেকে একটানে ছিঁড়ে আনল তার, শেষে ঘুরল অ্যানার দিকে।

'বাচ্চারা', ফিসফিস করল অ্যানা। 'তুমি ওদের কী করেছ?'

জবাব দিল না ভালথার।

গাসনার এস্টেট ওয়ানসিতে দক্ষিণ-পশ্চিম বার্লিনের অভিজাত এক এলাকায়। বার্লিন ক্রিমিনালপোলিজির সেন্ট্রাল ডিভিশনে অ্যানার ফোনটা ধরেছিল ডিটেকটিভ পল ল্যাঞ্চ। আতঙ্কিত অ্যানার ফোন কোত্থেকে এসেছে তা অটোমেটিক হোল্ড সিস্টেম ঘেঁটে বের করতে তার অল্প সময় লাগল। দেখল ফোনটি এসেছে ভালথার গাসনারের বাড়ি থেকে, জার্মানির অন্যতম বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান রোফ অ্যান্ড সন্সের জার্মান শাখার প্রধান ভালথার গাসনারের ঠিকানা ওটা। সে তখুনি গাড়ি নিয়ে চলে এল প্রাসাদোপম বাড়িটিতে। তিনতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল ল্যাঞ্চ। ডোরবেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগল।

আশ্চর্য সুনসান বাড়ি। বাড়ির পেছনদিকে একবার চক্কর দেবে কিনা ভাবছে ল্যাঞ্চ, এমন সময় খুলে গেল সদর-দরজা, দোরগোড়ায় মধ্যবয়স্কা এক নারী। বিষণ্ন চেহারা। পরনে কোঁচকানো ড্রেসিং গাউন। মহিলাকে হাউসকিপার ভেবে আইডি কার্ড দেখাল ল্যাঞ্চ। 'আমি মিসেস ভালথার গাসনারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্লিজ তাকে বলুন ডিটেকটিভ ল্যাঞ্চ এসেছে।'

'আমিই মিসেস গাসনার', বলল মহিলা।

বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা করল ল্যাঞ্চ। একে মোটেই এ-বাড়ির গৃহকর্ত্রীর মতো লাগছে না।

'আমি— আমরা একটু আগে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে একটা ফোন পেয়েছি', বলল সে।

মহিলা দেখছে ওকে, চেহারা ভাবলেশহীন। ল্যাঞ্চের মনে হল কোথাও একটা ভজকট আছে।

'আপনিই কি ফোনটা করেছিলেন, মিসেস গাসনার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ', জবাব দিল মহিলা, 'ভুল করে।'

মহিলার কণ্ঠে নিরুত্তাপ স্বরটা কেমন জানি শোনাল ল্যাঞ্চের কানে। আধঘণ্টা আগের তীব্র আর্তনাদের কথা মনে পড়ল ওর।

'শুধু আমাদের রেকর্ডের স্বার্থে জানতে চাইছি কী ধরনের ভুল ছিল ওটা?'

ইতস্তত করল মহিলা, 'ইয়ে মানে ভেবেছিলাম আমার কিছু গহনা চুরি হয়েছে। পরে অবশ্য ওগুলো খুঁজে পেয়েছি।'

'আচ্ছা', বলল ল্যাঞ্চ। অথচ ইমার্জেন্সি নাম্বারটা শুধু খুন, ধর্ষণ, নির্যাতনের কথা জানাবার জন্য। ওর ইচ্ছে করল একবার বাড়ির ভেতরটা ঘুরে দেখতে। মহিলা কিছু

একটা লুকোচ্ছে। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ‘ধন্যবাদ, মিসেস ভালথার। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।’

ওর মুখের সামনে ঠকাস করে বন্ধ করে দেয়া হল দরজা। ল্যাঞ্চ ধীরগতিতে ফিরে এল নিজের গাড়িতে। চলল অফিসে।

দরজার দিকে পেছন ফিরে ঘুরল অ্যানা।

মাথা ঝাঁকাল ভালথার। মৃদু গলায় বলল, ‘তুমি চমৎকার দেখিয়েছ, অ্যানা। এখন উপরে চলো।’

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ভালথার। ড্রেসিং গাউনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ঝাঁ চকচকে একজোড়া কাঁচি বের করল অ্যানা, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ভালথারের পিঠে।

আটাশ

রোম
রোববার ৪ নভেম্বর
দুপুর

সিমোনেটা আর তাদের তিন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে ভিলা ডি এস্টেটে ঘুরে বেড়ানোর জন্য এটা একটা চমৎকার দিন : ভাবল ইভো পালাজ্জি। অপূর্ব সুন্দর ট্রিভোলি গার্ডেনে স্ত্রীর হাত জড়িয়ে ধরে হাঁটছে সে। বাচ্চারা আগে আগে ঝর্না লক্ষ্য করে ছুটেছে। ভিলা ডি এস্টেট রোম থেকে সামান্য দূরে, স্যাবিন পাহাড়ের চূড়োয়। এর চুড়োয় দাঁড়িয়ে নিচের ঝলমলে ঝর্না দেখতে খুব ভালো লাগে ইভোর। একেকটা ঝর্না একেক ডিজাইনের। এ গার্ডেনের নির্মাতা পিরো লিগোরিওর কথা ভাবছে ইভো। তিনি কি জানতেন একদিন লাখ লাখ পর্যটক আসবে তার এ বাগান দেখতে?

ইভো ডোনাটেলা এবং তার তিন ছেলেকে নিয়ে আগেও একবার এখানে এসেছে। খুব মজা করেছিল ওরা। ওদের কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল ইভোর। অ্যাপার্টমেন্টে বিকেলের সেই ভয়ংকর ঘটনার পর ডোনাটেলার সঙ্গে কথা হয়নি ইভোর, দেখা হওয়া দূরে থাক। ডোনাটেলা নিশ্চয় ওর বিরহে কাতর। থাক্ কাতর থাক্। ইভো যেমন কষ্ট পাচ্ছে সেও তেমনি কষ্ট পাক। ও যেন শুনতে পেল ডোনাটেলা তার ছেলেদেরকে ডাকছে, 'এদিকে এসো, বাচ্চারা।'

এত পরিষ্কার কণ্ঠ যেন বাস্তবে সত্যি ডাকছে। ইভো শুনতে পেল ডোনাটেলা বলছে, 'আরেকটু জোরে, ফ্রান্সেসকো।' ঘুরল ইভো এবং ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ডোনাটেলা তার পেছনে। তিন ছেলেকে নিয়ে আসছে। ওকে দেখতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সে সিমোনেটাকে বলল, 'তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাব। জলদি চলো।'

পর্যটকদের একে-তাকে ধাক্কা মেরে আগে-আগে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ছুটল ইভো। একবার পেছন ফিরে দেখল ডোনাটেলা তার ছেলেদেরকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে। বাচ্চাগুলো তাকে দেখে ফেললেই কম্ম সাবাড়, শুধু একবার 'বাবা' বলে ডাক দিলেই হল!

সিমোনেটা আর মেয়েদেরকে নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটল সে। ওদেরকে একবারও থামতে দিল না।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল সিমোনেটা। 'এত তাড়া কিসের?'

'একটা মজার জিনিস দেখাব', হাসিমুখে বলল ইভো। 'গেলেই দেখতে পাবে।'

আরেকবার ঝুঁকি নিয়ে পেছন ফিরল সে। ডোনাটেলা আর বাচ্চাদেরকে দেখা যাচ্ছে না। সামনে একটা গোলকধাঁধা, একসার সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে, আরেক সার নেমে গেছে নিচে। ইভো উপরে যেতে মনস্থ করল।

'চলে এসো', মেয়েদেরকে ডাক দিল ইভো। 'যে আগে ওপরে উঠতে পারবে তার জন্য পুরস্কার আছে।'

'ইভো, আমার পা আর চলছে না।' বলল সিমোনেটা। 'একটু বিশ্রাম নিই?'

'বিশ্রাম?' আহত হওয়ার ভান করল ইভো। 'তাহলে তো মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

সিমোনেটার হাত ধরে ওকে প্রায় টেনেহিঁচড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ইভো। মেয়েগুলো আগে আগে ছুটেছে। ইভো হাঁপিয়ে উঠেছে। আমি এখন হার্টঅ্যাটাক হয়ে মরে গেলেই ভালো হয়। হারামজাদী মাগীর জন্য একদণ্ড শান্তিতে থাকার জো নেই। মাগীকে খুন করব আমি।

ইভো কল্পনায় দেখতে পেল ডোনাটেলাকে বিছানায় ধাক্কা মেরে ফেলে ওর ওপর চড়াও হয়েছে। টান মেরে ছিঁড়ে ফেলেছে পাতলা নাইটি। ওর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে ইভো। এত জোরে কোমর দিয়ে ধাক্কা মারছে যন্ত্রণায় ডাক ছেড়ে কাঁদছে ডোনাটেলা। ওকে রেহাই দিতে কাতর অনুরোধ করছে। কিন্তু ইভো ওকে ছাড়ছে না। ভাবনাটা রক্ত গরম করে তুলল। টের পেল পুরুষাঙ্গ ফুঁসে উঠেছে।

'এখন একটু জিরিয়ে নিই?' অনুনয় করল সিমোনেটা।

'না! এই তো চলে এসেছি।'

ওপরের লেভেলে চলে এসেছে ওরা। দ্রুত একবার চারপাশে চোখ বুলাল ইভো। ডোনাটেলা বা বাচ্চাদেরকে কোথাও দেখতে পেল না।

'আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল সিমোনেটা।

'দেখতে পাবে', হিস্টিরিয়া রোগীর মতো ইভো চেঁচাল। 'এসো' গেটের দিকে ছুটল সে।

বড়মেয়েটা, ইসাবেলা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি চলে যাচ্ছি, পাপা? এইমাত্র তো এলাম।'

'আমরা এর চেয়েও ভালো জায়গায় যাচ্ছি।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ইভো। পেছন ফিরে তাকাল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ডোনাটেলা তার সন্তানদের নিয়ে।

'জলদি! মেয়েরা!'

একমুহূর্ত পর ভিলা ডি এস্টেটের গেট দিয়ে সপরিবারে বেরিয়ে এল ইভো। হনহন করে ছুটল গাড়ির দিকে।

'তোমাকে এরকম করতে আগে কখনও দেখিনি', হাঁপাচ্ছে সিমোনেটা।

'আমি আগে কখনও এরকম করিওনি', স্বীকার করল ইভো। এত জোরে সে গাড়ি ছোটাল যেন ভূতে তাড়া করেছে।

'ইভো।'

সিমোনেটার হাতে চাপড় দিল ইভো। 'এবার সবাই রিল্যাক্স করো। আমি—আমি তোমাদেরকে হাসলারে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি।'

খেলা শেষ। ডোনাটেলাকে যেভাবে হোক টাকা জোগাড় করে দিতেই হবে। ওকে একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। যে-কোনো উপায়।

উনত্রিশ

প্যারিস
সোমবার, নভেম্বর ৫
সন্ধ্যা ৬টা

চার্লস মার্টেল ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারল ঝামেলা হয়ে গেছে কোথাও। হেলেন অপেক্ষা করছিল ওর জন্য, সঙ্গে পিয়েরে রিচার্ড। সেই জুয়েলার যাকে চুরি-করা গহনার নকল বানাতে দিয়েছিল চার্লস। স্তম্ভিত চার্লস দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

'ভেতরে এসো, চার্লস', বলল হেলেন। ওর কণ্ঠের শীতলভাব জমিয়ে দিল চার্লসকে। 'আমার ধারণা মি. রিচার্ডকে তুমি চেনো।' চার্লস বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জুয়েলারকে ভয়ানক বিব্রত লাগছে, বোঝা যায় অস্বস্তিতে ভুগছে সে।

'বসো, চার্লস।' আদেশ এল। বসল চার্লস।

হেল বলল, 'তুমি আমার গহনা চুরি করেছ। সেগুলোর নকল করে দিয়েছেন মি. রিচার্ড। তোমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হবে।'

আতঙ্কিত হয়ে চার্লস লক্ষ্য করল সে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে। এ কাজ শেষবার করেছে শৈশবে। লজ্জায় রাঙা হল মুখ। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল।

হেল সব জানে। কীভাবে জানতে পারল সেটা এখন আর বিষয় নয়। ওর কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা পাওয়া যাবে না। হেলেন জেনে ফেলেছে ও গহনা চুরি করেছে। কিন্তু কীজন্য কাজটা করেছে সেটা সম্ভবত এখনও জানে না। হেলেনকে চার্লসের মতো আর কেউ চেনে না। ও এখন চার্লসকে ধ্বংস করে ফেলবে। প্যারিসের রাস্তায় ভিখিরির মতো ছুড়ে ফেলবে।

'তুমি কি ভেবেছিলে এরকম বোকার মতো কাজ করে পার পেয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল হেলেন।

চুপ হয়ে রইল চার্লস। ওর প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু নিচের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না।

'আমি মি. রিচার্ডকে জিজ্ঞেস করে সব শুনেছি। তুমি গহনা চুরি করে যে টাকা পেয়েছ তার রশিদের ফটোকপি আছে আমার কাছে। এর জন্য তোমাকে আমি কুড়ি বছরের জেলের ঘানি টানাতে পারি।' বিরতি দিল সে, তারপর যোগ করল— 'অবশ্য যদি কাজটা করতে ইচ্ছে হয় আমার।'

হেলেনের প্রতিটি কথা চার্লসের ভেতরে আতঙ্কের বোধটাকে বাড়িয়ে তুলছে। বিপজ্জনক এই মহিলার দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস পাচ্ছে না ও।

হেল ঘুরল জুয়েলারের দিকে। 'আপনি এসব কথা কাউকে বলবেন না।'

'অবশ্যই ম্যাম। অবশ্যই। অবশ্যই।' তোতলাচ্ছে লোকটা। 'আমি কী এখন— '

মাথা ঝাঁকাল হেলেন। পালিয়ে বাঁচল পিয়েরে রিচার্ড। হেলেন তার চলে যাওয়া দেখল। তারপর ঘুরল স্বামীর দিকে। ওর ভয়টাকে টের পাচ্ছে হেলেন। সেই সঙ্গে গন্ধ পাচ্ছে অন্য কিছুর। প্রস্রাব। হাসল হেলেন। ভয়ের চোটে হিসু করে দিয়েছে চার্লস। ওকে ভালো শিক্ষা দেয়া গেছে। চার্লসের সঙ্গে বিয়েটা তৃপ্তি দিয়েছে ওকে। চার্লসকে সে ভেঙে ফেলেছে। তারপর নিজের মতো গড়ে তুলেছে। চার্লস রোফ অ্যান্ড সন্সের জন্য যা করেছে মন্দ নয়। হেলেন তার স্বামীর সাহায্যে কোম্পানির ছোট একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সে একজন রোফ। আগেকার বিয়েগুলো ওকে অনেক টাকা এনে দিয়েছে। তবে টাকার ব্যাপারে তার আগ্রহ নেই। সে কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কোম্পানির স্টক বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে সে কথা বলেছে। তারা রাজিও হয়েছে। তবে প্রথমে বাধা ছিলেন স্যাম রোফ, এখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এলিজাবেথ। কিন্তু হেলেন যা চায় তা পাবার জন্য এলিজাবেথ বা অন্য কাউকে সে পথের কাঁটা হয়ে থাকতে দেবে না। চার্লস ওর ইচ্ছে পূরণ করবে। কোনো ঝামেলা হলে তার দায়ভার চার্লসকেই বইতে হবে। তবে গহনা চুরির জন্য চার্লসের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

হেল স্বামীকে লক্ষ্য করছে। বলল, 'কেউ কোনোকিছু আমার কাছ থেকে চুরি করতে পারে না, চার্লস। কেউ না। তুমি শেষ, যদি না আমি তোমাকে রক্ষা করি।'

আতঙ্কিত চার্লস চুপচাপ বসে রইল। মুখে রা নেই। হেলেন বলল, 'তুমি কি চাও আমি তোমাকে বাঁচাই, চার্লস?'

'হ্যাঁ', কর্কশ গলায় বলল চার্লস। হেলেন ওর স্কার্ট খুলতে শুরু করেছে। চোখে শয়তানি। চার্লস ভাবল : 'ওহ্, মাইগড। এখন না।'

'তাহলে আমার কথা শোনো। রোফ অ্যান্ড সন্স আমার কোম্পানি, আমি এর কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট চাই।'

করুণ চেহারা নিয়ে হেলেনের দিকে তাকাল চার্লস।

'তুমি জানো এলিজাবেথ স্টক বিক্রি করবে না।' হেলেন ব্লাউস আর প্যান্টি খুলে ফেলল। সম্পূর্ণ নগ্ন। চমৎকার দেহবল্লরী তার। কামনায় শক্ত হয়ে গেছে স্তনের বোঁটা। 'তাহলে ওর একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। নয়তো কুড়ি বছর জেলের ঘানি টানবে। তবে ভেবো না। কী করতে হবে আমি বলে দেব তোমাকে। তবে আগে এখানে এসো, চার্লস।'

ত্রিশ

ওইদিন সকাল দশটায় এলিজাবেথের ব্যক্তিগত ফোন বেজে উঠল। ফোন করেছে এমিল জোয়েপলি। তার ফোন পেয়ে সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দিল এলিজাবেথ। গেল জোয়েপলির ল্যাবরেটরিতে। জোয়েপলি এলিজাবেথকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

'গত রাতে আমি চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলো করেছি। কাজ হচ্ছে। আর তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে ওষুধটা লোকের ওপর প্রয়োগ করতে পারব। আশা করি সফল হব।'

'এমিল, বিষয়টি নিয়ে কিন্তু কারও সঙ্গে আলোচনা করা যাবে না।' সতর্ক করে দিল এলিজাবেথ।

মাথা ঝাঁকাল এমিল জোয়েপলি । 'করব না, মিস রোফ। আমি একা কাজ করছি। এবং খুব সাবধানে।'

বিকেলটা কাটল বোর্ড মিটিঙের ব্যস্ততায়। ভালথারকে দেখা গেল না মিটিঙে। চার্লস আবার স্টক বিক্রির প্রসঙ্গ তুলল। এলিজাবেথ দৃঢ়তার সঙ্গে ভেটো দিল। এলিজাবেথ ওদেরকে সন্ধ্যায় ডিনারে দাওয়াত দিল। ডিনার শেষে বোর্ডের পরিচালকরা ট্রেন এবং প্লেন ধরে যে-যার বাড়িতে ফিরে গেলেন। এরপর রিজ ঢুকল অফিসে। এলিজাবেথ তখন কেটের সঙ্গে কাজ করছে। 'ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু হাত লাগাই,' হালকা গলায় বলল রিজ।

বোর্ড মিটিঙে হাজির ছিল না রিজ। বলেছিল কী জরুরি কাজ আছে। ব্যাখ্যা করেনি সে। তাকে আর কিছু জিজ্ঞেসও করেনি এলিজাবেথ। ওরা একসঙ্গে বসে কাজ করতে লাগল। দ্রুত কাগজপত্রে চোখ বোলাচ্ছে রিজ, বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ভুল ধরিয়ে দিল। তারপর সিধে হল, হাত উপরের দিকে তুলে আড়মোড়া ভাঙল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। 'বাপরে! মাঝরাত হয়ে গেছে। আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কাল সকালে এসে বাকি এগ্রিমেন্টগুলো চেক করে দেব।'

এলিজাবেথ ভাবল অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কোনো সুন্দরীর সঙ্গে কি না। পরক্ষণে নিজেকে শাসাল। রিজ উইলিয়ামসের ব্যক্তিগত জীবন একান্তই তার নিজের।

'দুঃখিত', বলল এলিজাবেথ। 'বুঝতে পারিনি এত রাত হয়ে গেছে। তুমি চলে যাও। আমি আর কেট মিলে বাকি কাজ শেষ করতে পারব।'

মাথা দোলাল রিজ। 'কাল সকালে দেখা হবে।'

'গুড নাইট, কেট।'

'গুড নাইট, মি. উইলিয়ামস।'

এলিজাবেথ রিজকে চলে যেতে দেখল। তারপর জোর করে মন দিল কাজে। কিন্তু একটু পরেই রিজের কথা মনে পড়তে লাগল। ওকে এমিল জোয়েপলির নতুন ড্রাগ সম্পর্কে বলতে খুব ইচ্ছে করছে। থাক, পরে বলা যাবে : ভাবল এলিজাবেথ।

রাত একটার দিকে শেষ হল কাজ। কেট আরলিং জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু, মিস রোফ?'

'না। আজকের মতো এটুকুই। ধন্যবাদ কেট। কাল অফিসে একটু দেরিতে এলেও চলবে।'

উঠে দাঁড়াল এলিজাবেথ। অনেকক্ষণ বসে থেকে খিঁচ ধরে গেছে শরীরে।

'ধন্যবাদ। কাল বিকেলের মধ্যে আপনার জন্য আমি সব কাগজপত্র টাইপ করে রাখব।'

'বেশ।'

এলিজাবেথ কোট আর পার্স নিল, তারপর কেটকে নিয়ে এগোল দরজার দিকে। করিডোর পার হয়ে ব্যক্তিগত এক্সপ্রেস লিফটের দিকে হাঁটা দিল। লিফটের দরজা খোলা। লিফটে ঢুকে পড়ল ওরা। এলিজাবেথ লবি-বাটনের দিকে হাত বাড়িয়েছে, শুনতে পেল ফোন বাজছে অফিসে।

'আমি দেখছি, মিস রোফ,' বলল কেট আরলিং। 'আপনি যান'। সে লিফট থেকে বেরিয়ে এল।

নিচতলায় লবির ডিউটিতে থাকা নাইটগার্ড এলিভেটর কন্ট্রোল বোর্ডের উপরে লাল আলো জ্বলতে দেখে চোখ তুলে চাইল। প্রাইভেট লিফট নেমে আসার সংকেত। তার মানে মিস রোফ এখন নিচে নামবেন। তার শোফার কিনারে একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঢুলছে। 'বস্ আসছেন' —ঘোষণা করল গার্ড।

আড়মোড়া ভাঙল শোফার, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

হঠাৎ অ্যালার্ম বেলের বিকট শব্দে লবির শান্ত পরিবেশ ভেঙে খানখান হয়ে গেল। গার্ড দেখল লাল আলোটা ভয়ানক গতিতে সংখ্যা বদলাচ্ছে, বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসছে লিফট। ওটা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

'ওহ্ যিশু।' গুঙিয়ে উঠল গার্ড। সে বোর্ডের একটা প্যানেল এক টানে খুলে ফেলল। সেফটি ব্রেক চালু করার জন্য ইমার্জেন্সি সুইচ ধরে টান দিল। কিন্তু লাল আলোর পতন থামছে না।

শোফার একলাফে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে চলে এল। তাকাল গার্ডের দিকে, 'কী হয়েছে?'

'ভাগো!' চেঁচিয়ে উঠল গার্ড। লিফট ভেঙে পড়ছে।

লিফটের সারির সামনে থেকে একছুটে সরে গেল ওরা। লবি লিফটের পতনের কারণে কাঁপতে শুরু করেছে। গার্ড ভাবল : ঈশ্বর উনি যেন ভেতরে না থাকেন। লিফট লবি থেকে নিচে নেমে যাওয়ার সময় ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে এল।

একমুহূর্ত পর হুড়মুড় করে কিছু ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হল। বিল্ডিং এমনভাবে কেঁপে উঠল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

একত্রিশ

শিফেন্ডের ফিউনেরাল পার্লার জনাকীর্ণ। পাথর আর মার্বেলের তৈরি পুরোনো আদলের একটা ভবন এটা। ভিতরে প্রিপারেশন রুম এবং দাহন-চুল্লি আছে। বড় চ্যাপেলের সামনের দুই সারি দখল করে আছেন রোফ অ্যান্ড সন্সের দুই ডজন নির্বাহী এবং কর্মকর্তা। পেছনের সারিতে বসেছেন বন্ধুবর্গ, কম্যুনিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সংবাদমাধ্যমের লোকজন, সবশেষ সারিতে বসেছে ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরানাং। ভাবছে এ মৃত্যু অযৌক্তিক। মানুষ যখন শীর্ষে উঠে যায়, অনেক কিছু দেয়ার থাকে, এ সময় মরণ এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কফিনটি মেহগনি কাঠের, ফুল দিয়ে ঢাকা। পাদ্রি স্তোত্র পাঠ শুরু করলেন। ম্যাক্স হোরনাং সেদিকে তেমন মনোযোগ দিল না। তার চোখ চ্যাপেলে।

'ঈশ্বর জীবন দান করেন। ঈশ্বরই জীবন ছিনিয়ে নিয়ে যান।' পাদ্রির স্তোত্রপাঠ শেষ হল। লোকজন আসন ছেড়ে সিধে হল, পা বাড়াল দরজার দিকে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ম্যাক্স। এক মহিলা এবং পুরুষ তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'মিস এলিজাবেথ রোফ? আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাং এলিজাবেথ রোফ এবং রিজ উইলিয়ামসের সঙ্গে ফিউনেরাল পার্লারের অপর একটি বুথে বসে আছে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে কফিনটি একটি ধূসর শবযানে নামানো হচ্ছে। এলিজাবেথ অন্যদিকে তাকাল। ওর চোখ জ্বালা করছে।

'এসবের মানে কী?' অসন্তোষ প্রকাশ করল রিজ। 'মিস রোফ পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তো।'

ডিটেকটিভ ম্যাক্স বলল, 'আমি কিছু জিনিস চেক করতে চাই।'

'পরে করলে হয় না? মিস রোফ খুব—'

এলিজাবেথ রিজের হাতে হাত রাখল। 'ঠিক আছে। যদি কোনো সাহায্য করতে পারি—' সে ম্যাক্সের দিকে ঘুরল। 'আপনি কী জানতে চান ডিটেকটিভ হোরানাং?'

ম্যাক্স স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল এলিজাবেথের দিকে। জীবনে প্রথমবারের মতো কথার খেই হারিয়ে ফেলল। মেয়েরা তার কাছে ভিনগ্রহের প্রাণীর মতো অচেনা। এদেরকে বুঝে উঠতে পারে না সে। কিন্তু এলিজাবেথকে দেখে মনে হচ্ছে এর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেশা যায়। এ ব্যাপারটিই ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। জোর করে এলিজাবেথের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাল সে যাতে মনোযোগ দিতে পারে। 'রাত জেগে কাজ করার অভ্যাস আছে আপনার, মিস রোফ?'

'প্রায়ই,' বলল এলিজাবেথ। 'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ জাগেন?'

'এটা কাজের ওপর নির্ভর করে। কখনও দশটা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে মাঝরাত হয়ে যায়। কিংবা তারও বেশি।'

'তার মানে এটা কাজের একটা ধরন? আপনার আশপাশের লোকজন এ ব্যাপারটা জানে তাহলে?'

এ প্রশ্নে বিস্মিত দেখাল এলিজাবেথকে। 'আমার ধারণা তাই।'

'লিফট ধসে পড়ার রাতে আপনি আর মি. উইলিয়ামস রাত জেগে কাজ করছিলেন?'

'জ্বি।'

'কিন্তু একসঙ্গে বেরোননি?'

রিজ বলল, 'আমি আগে বেরিয়েছি। আমার একটা কাজ ছিল।'

ম্যাক্স তাকে একনজর দেখল, ফিরল এলিজাবেথের দিকে।

'মি. উইলিয়ামস চলে যাবার কতক্ষণ পরে আপনি বেরিয়েছেন?'

'ঘণ্টাখানেক পর।'

'আপনি এবং কেট একসঙ্গে?'

'হ্যাঁ। আমরা কোট গায়ে চড়িয়ে হল ঘরে চলে আসি।' কণ্ঠ জড়িয়ে এল এলিজাবেথের। 'লি-লিফট অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য।'

বিশেষ এক্সপ্রেস লিফট।

'তারপর কী হল?'

'আমরা ভেতরে ঢুকলাম। অফিসে ফোন বেজে উঠল। কেট আরলিং বলল, 'আমি ধরছি।' সে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। বিদেশ থেকে আমার একটা ফোন আসার কথা ছিল। বললাম 'আমি ধরব।' বিরতি দিল এলিজাবেথ, চোখ ভরে উঠেছে অশ্রুতে। 'আমি লিফট থেকে নেমে পড়লাম। কেট জানতে চাইল অপেক্ষা করবে কি না। আমি বললাম না, তুমি চলে যাও। সে লবির বাটন টিপে দিল। আমি অফিসের দিকে পা বাড়ালাম। দরজা খুলছি, এমন সময় শুনলাম— শুনতে পেলাম আর্তনাদ, এরপর—' আর কিছু বলতে পারল না এলিজাবেথ।

রিজ ফিরল ম্যাক্স হোরনাং-এর দিকে, রাগে গনগনে মুখ। 'যথেষ্ট হয়েছে। এসব কিসের জন্য দরকার বলবেন কি?'

এটা একটা হত্যাপ্রচেষ্টা। ভাবছে ম্যাক্স। কেউ খুন করতে চেয়েছে এলিজাবেথ রোফকে। সে গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় কোম্পানি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে যা যা জেনেছে মনে করার চেষ্টা করল। বিরাট কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে রোফ অ্যান্ড সন্সকে নিয়ে। স্যাম রোফের মতো অভিজ্ঞ মাউন্টেন ক্লাইম্বার পাহাড় চড়তে গিয়ে মারা গেছেন। এলিজাবেথ সার্ডিনিয়ার গাড়ি দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। লিফটে ফাঁদ পেতে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ ভয়ংকর খেলাগুলো খেলছে। রিজ বলল, 'আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছি—'

ম্যাক্স তাকাল তার দিকে। অস্পষ্ট গলায় বলল, 'আ— এটা পুলিশ প্রসিডিউর, মি. উইলিয়ামস। জাস্ট রুটিন।' সে উঠে দাঁড়াল। 'এক্সকিউজ মি।'

ওর জরুরি কিছু কাজ আছে।

বত্রিশ

চিফ ইন্সপেক্টর অটো স্কিমড ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনা-এর বস। রোফ অ্যান্ড সন্সের লিফট দুর্ঘটনার তদন্তের আদেশ তার কাছ থেকেই পেয়েছে ম্যাক্স। বস্‌কে রিপোর্ট দিল ম্যাক্স। 'লিফট ক্যাবল ড্রাম ছিঁড়ে পড়েছে। ভেঙে পড়ার সময় সেফটি কন্ট্রোল নষ্ট ছিল। কেউ—'

'আমি রিপোর্ট দেখেছি, হোরনাং। স্বাভাবিকভাবে ছিঁড়ে পড়েছে তার।'

'না, চিফ। আমি ক্যাবল ড্রাম পরীক্ষা করে দেখেছি। ওটার আরও পাঁচ-ছয় বছরেও কিছু হওয়ার কথা না।'

ভুরু কুঁচকে গেলে চিফ ইন্সপেক্টরের। 'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'কেউ ইচ্ছে করে নষ্ট করে রেখেছে লিফট।'

'কেউ কেন তা করবে?'

'আমি সেটাই দেখতে চাই।'

'রোফ অ্যান্ড সন্সে আবার যেতে চাইছ?'

ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাং সরল বিস্ময়ে তাকাল চিফ ইন্সপেক্টরের দিকে। 'না স্যার। আমি চ্যামনিক্সে যেতে চাই।'

জেনেভার চল্লিশ মাইল দক্ষিণপূর্বে চ্যামনিক্স। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৪০০ ফুট উঁচুতে Haute Savoie'র ফ্রেঞ্চ ডিপার্টমেন্ট। মন্ট ব্লাঙ্ক পাহাড় এবং আগুইল রুজ রেঞ্জের মাঝখানে ওটা, মনোমুগ্ধকর একটা জায়গা।

তবে চ্যামনিক্স স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেও শ্বাসরুদ্ধকর এ সৌন্দর্য ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাংকে আকৃষ্ট করতে পারল না। সে জীর্ণ চেহারার কার্ডবোর্ডের একটি সুটকেস নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে হাজির হয়ে গেল স্থানীয় পুলিশ থানায়, শহরের কেন্দ্রে ছোটখাটো একটি ভবনে। ফরাসি সার্জেন্টের সঙ্গে ফরাসিভাষায় কথা বলে তাকে রীতিমতো চমকে দিল ম্যাক্স। নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল দুমাস আগে চ্যামনিক্সে স্যাম রোফ নামে এক পর্বতারোহীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করতে এসেছে। সার্জেন্ট তাকে Societe Chamniadre de socours en montegue নামে মাউন্টেন রেসক্যু প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল। এ প্রতিষ্ঠান ম্যাক্সকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

Societe Chamoniadre de secours-এর দায়িত্বে আছে সুঠামদেহী এক তরুণ। সে জানতে চাইল ম্যাক্সকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে।

ম্যাক্স নিজের আইডি কার্ড দেখিয়ে বলল, 'আমি স্যাম রোফ নামে এক লোকের মৃত্যুরহস্য তদন্ত করতে এসেছি।'

ডেস্কের পেছনের লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ও, আচ্ছা, আমি মি. রোফকে খুব পছন্দ করতাম। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছিল ওটা।'

'আপনি ঘটনা ঘটতে দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল তরুণ। 'না। ডিসট্রেস সিগনাল পাবার পরপর আমি আমার রেসক্যু দল নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যাই। তবে তখন করার কিছুই ছিল না। একটা গহিন খাদে পড়ে গিয়েছিলেন রোফ। তার লাশ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'কীভাবে ঘটল ঘটনা?'

'দলে চারজন পর্বতারোহী ছিলেন। গাইড এবং মি. রোফ ছিলেন সবার শেষে। মি. রোফ সম্ভবত জমাটবাঁধা হিমবাহ বাইতে গিয়ে পিছলে পড়ে যান।'

ম্যাক্স বলল, 'আমি একটু গাইডের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'মি. রোফের রেগুলার গাইড ওইদিন তার সঙ্গে ছিল না।'

চোখ কোঁচকাল ম্যাক্স। 'আচ্ছা! কেন ছিল না?'

'যদ্দূর মনে পড়ে সে অসুস্থ ছিল। তার জায়গায় আরেক গাইড ছিল।'

'তার নাম কী?'

'এক মিনিট। নামটা দেখে আসি।'

লোকটা ভেতরের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পর একটুকরো কাগজ হাতে উদয় হল। 'গাইডের নাম হ্যান্স বার্গম্যান।'

'একে কোথায় পাব?'

'সে এখানকার স্থানীয় কেউ নয়,' কাগজে চোখ বোলাল লোকটা। 'লেসগেটস নামে একটা গ্রাম থেকে এসেছে। এখান থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে গ্রামটা।'

ম্যাক্স চ্যামনিক্স ছেড়ে যাওয়ার আগে ক্লাইন শেডিগ হোটেলের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রুম ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলল। 'মি রোফ যখন এখানে ছিলেন তোমার কি সে-সময় ডিউটি ছিল?'

'জ্বি,' জবাব দিল ক্লার্ক। 'অ্যাক্সিডেন্টটা ভয়ংকর ছিল।'

'মি রোফ হোটেলে একা উঠেছিলেন?'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক। 'না, তার সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন।'

আশ্চর্য হল ম্যাক্স। 'বন্ধু?'

'জ্বি, মি রোফ দুজনের জন্য রিজার্ভেশন নেন।'

'বন্ধুর নামটা বলতে পারবে?'

'অবশ্যই।' বলল ক্লার্ক। ডেস্কের নিচ থেকে বড়সড় একটা লেজার বের করল সে। পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল। একটা পাতায় এসে থেমে গেল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এই তো নামটা পেয়ে গেছি...'

সবচেয়ে সস্তা ভাড়ার ভক্সওয়াগেনে লেসগেটস পৌঁছুতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল ম্যাক্সের। এটা ঠিক গ্রামের পর্যায়েও পড়ে না। অল্প ক'টা দোকান, একটা ছোট কুটির। একটা মুদি দোকান এবং একটা পেট্রোলপাম্প।

ম্যাক্স কুটিরের সামনে গাড়ি থামাল। ভেতরে ঢুকল। পাঁচ-ছ'জন লোক খোলা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। আড্ডায় ব্যস্ত। ম্যাক্সকে দেখে থেমে গেল আড্ডা।

'মাফ করবেন,' বলল ম্যাক্স, 'আমি হের হ্যান্স বার্গম্যানকে খুঁজছি।'

'কে?'

'হ্যান্স বার্গম্যান। গাইড। এ গাঁয়ে থাকে শুনেছি।'

মুখে বয়সের বলিরেখা পড়া এক বৃদ্ধা ফায়ারপ্লেসে একগাদা থুতু ছিটিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে কেউ মশকরা করেছে, সাহেব। লেসগেটসে জন্ম আমার। আমি কস্মিনকালেও হ্যান্স বার্গম্যানের নাম শুনিনি।'

তেত্রিশ

এক সপ্তাহ আগে, কেট আরলিং-এর মৃত্যুর পর আজ অফিসে এসেছে এলিজাবেথ। ওর দ্বিতীয় সেক্রেটারি হেনরিয়েট ইতিমধ্যে ই-মেইলগুলো সাজিয়ে রেখেছে তার ডেস্কের ওপর। এলিজাবেথ ওগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল। চিঠিপত্রের স্তূপের নিচে বড়সড় মুখবন্ধ একটি খাম, তাতে লেখা 'এলিজাবেথ রোফ—ব্যক্তিগত।' এলিজাবেথ লেটার-ওপেনার দিয়ে খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল। ভেতর থেকে বের করে আনল ৮ × ১০ সাইজের একটি ছবি। একটি মঙ্গোলীয় শিশুর ক্লোজআপ, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। ছবির সঙ্গে একটি চিরকুটে রঙিন খড়ি দিয়ে লেখা :

এ আমার ছেলে জন। তোমার ওষুধ খেয়ে তার এই দশা। আমি তোমাকে খুন করব।

চিরকুট এবং ছবিটি ফেলে দিল এলিজাবেথ, ওর হাত কাঁপছে। হেনরিয়েট ভেতরে ঢুকল হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে।

'এগুলোতে সই করতে হবে, মিস।' এলিজাবেথের চেহারা দেখে থমকে গেল সে। 'কী হয়েছে?'

এলিজাবেথ বলল, 'প্লিজ মি. উইলিয়ামসকে এখানে আসতে বলো।' ছবির দিকে আবার তাকাল ও। রোফ অ্যান্ড সন্স এমন ভয়ংকর ঘটনার জন্য দায়ী হতে পারে না।

'এটা আমাদেরই দোষ,' বলল রিজ। 'কিছু ওষুধে ভুল লেবেল লাগানো হয়েছিল। বেশিরভাগই আমরা তুলে নিতে পেরেছি, তবে—' থেমে গেল ও।

'এ ঘটনা কবে ঘটেছে?'

'বছর-চারেক আগে।'

'কত জন এতে আক্রান্ত হয়েছে?'

'শ-খানেক,' এলিজাবেথের চেহারার ভাব লক্ষ্য করে দ্রুত যোগ করল রিজ, 'তাদের সকলকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। লিজ, আমরা অত্যন্ত সাবধানে কাজ করি। কিন্তু মানুষ তো। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়।'

এলিজাবেথ বাচ্চাটার ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভয়ংকর!

‘চিঠিটা তোমাকে ওদের দেখানো উচিত হয়নি।’ ঘন কালো চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিল রিজ। ‘তবে এটার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আমাদের রয়েছে।’

‘কী?’

‘এফডিএ আমাদের অ্যারোসল স্প্রের বিরুদ্ধে নোটিশ দিয়েছে। দুবছরের মধ্যে অ্যারোসল উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।’

‘তাতে আমরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হব?’

‘অনেক। সারাবিশ্বে আধডজন কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা আমাদের অন্যতম লাভজনক একটি বিভাগ হারাব।’

এমিল জোয়েপলির কথা মনে পড়ল এলিজাবেথের। জিজ্ঞেস করল, ‘আর কিছু?’

‘আজকের খবরের কাগজ পড়েছ?’

‘না।’

‘বেলজিয়ামে এক মন্ত্রীর স্ত্রী, মাদাম ভ্যান ডেন লো বেনেক্সান সেবন করেছেন।’

‘ওটা তো আমাদের ওষুধ?’

‘হ্যাঁ, একটা অ্যান্টি-হিস্টামিন। লেবেলে- পরিষ্কার লেখা আছে হাইপারটেনশনের রোগীর এ ওষুধ ব্যবহার নিষেধ। কিন্তু উনি তা গ্রাহ্য করেননি।’

এলিজাবেথ টের পেল ওর শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠছে।

‘তাঁর কী হয়েছে?’

রিজ বলল, ‘উনি কোমায় চলে গেছেন। সম্ভবত বাঁচবেন না। খবরের কাগজে উঠেছে এটা আমাদের ওষুধ। সারাবিশ্বে এ ওষুধ ক্যান্সেলের অর্ডার চলে যাচ্ছে। এফডিএ বলেছে তারা তদন্ত শুরু করবে। এতে কমপক্ষে একবছর সময় লাগবে। ততদিন আমরা ওষুধ বিক্রি চালিয়ে যেতে পারব।’

এলিজাবেথ বলল, ‘এ ওষুধ বাজার থেকে তুলে ফেলো। এক্ষুনি। আমি চাই না এর দ্বারা আর কেউ আক্রান্ত হোক।’

রাগ হল রিজের। প্রাণপণে ক্রোধ দমন করে বলল, ‘ঠিক আছে। কিন্তু এতে কোম্পানির কত ক্ষতি হবে শুনবে?’

‘না।’ বলল এলিজাবেথ।

মাথা ঝাঁকাল রিজ। ‘এতক্ষণ ভালো খবর শুনেছ। এবার একটা খারাপ খবর শোনো। ব্যাংকাররা তোমার সঙ্গে বৈঠক করতে চায়। তারা তাদের লোন ফেরত চাইছে।’

একা অফিসে বসে আছে এলিজাবেথ। মঙ্গোলয়েড বাচ্চাটির কথা ভাবছে, ভাবছে কোমায় চলে যাওয়া মহিলার কথা। রোফ অ্যান্ড সন্সের ওষুধ খেয়ে তাদের এই

দশা। এজন্য নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে ওর। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে এলিজাবেথের। এই প্রথমবার সন্দেহ হল ও সত্যি এত ভার বইতে পারবে কি না। চেয়ার ঘুরিয়ে দেয়ালে টাঙানো বুড়ো স্যামুয়েলের ছবির দিকে তাকাল। মনে পড়ল অনেক বাধাবিঘ্ন সইতে হয়েছে স্যামুয়েলকে, হতাশার সাগর পাড়ি দিতে হয়েছে। তবু তিনি পেরেছেন। এলিজাবেথকেও পারতে হবে। কারণ সে একজন রোফ।

ছবিটা একদিকে হেলে আছে। ওটাকে খাড়া করার জন্য চেয়ার ছাড়ল এলিজাবেথ। সিধে করতে গিয়ে হুকটা খুলে এল দেয়াল থেকে। ছবিটা পড়ে গেল মেঝেতে। তবে এলিজাবেথ ওদিকে তাকাল না পর্যন্ত। ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যেখানে ছবিটা টাঙানো হয়েছিল সেদিকে। দেয়ালের সঙ্গে টেপ দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে খুদে একটি মাইক্রোফোন।

ভোর চারটা। এমিল জোয়েপলি আবার রাত জেগে কাজ শুরু করেছে। এলিজাবেথ রোফ তাকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে না দিলেও জোয়েপলি জানে তার এ প্রকল্প কোম্পানির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করতে চাইছে। রোফ অ্যান্ড সন্স নিয়ে ঝামেলা চলছে শুনেছে জোয়েপলি। সে কোম্পানিকে সাহায্য করতে চায়। কোম্পানি তাকে ভালো বেতন দিচ্ছে, কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। স্যাম রোফকে পছন্দ করত সে। তার মেয়েকেও পছন্দ করে। এলিজাবেথ জানে না জোয়েপলি তাকে কী উপহার দিতে চলেছে। নিজের ছোট ডেস্কে ঝুঁকে কাজ করছে সে। গবেষণার শেষপর্যায়ের পরীক্ষানিরীক্ষা । যা আশা করেছিল তার চেয়ে ভালো ফল পাওয়া গেছে। কাজে এমন মনোযোগ, গবেষণাগারের খাঁচায় বন্দি প্রাণীগুলোর গায়ের কটুগন্ধ সম্পর্কেও যেন সচেতন নয়।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল গার্ড সেপ নোলান। রাতের শিফটে কাজ করতে সে মোটেই পছন্দ করে না। গবেষণাগারটির মধ্যে গা-ছমছমে একটা ব্যাপার আছে। প্রাণীগুলোর গায়ের গন্ধে বমি আসে। গবেষণাগারের কাজে আত্মাহুতি দেয়া প্রাণীদের আত্মা যেন বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। সেপ নোলানের তাই মনে হয়। সবাই বাড়ি গেছে। শুধু ওই পাগলা বিজ্ঞানীটা খাঁচাবন্দি খরগোশ, বেড়াল আর হ্যামস্টার নিয়ে কাজে ব্যস্ত।

'আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন, ডক?' জিজ্ঞেস করল নোলান।

মুখ তুলে চাইল জোয়েপলি, নোলানের উপস্থিতি এইমাত্র টের পেয়েছে। 'কি?'

'আপনি আরও কিছুক্ষণ থাকলে আপনার জন্য স্যান্ডউইচ নিয়ে আসি। আমার খিদে পেয়েছে।'

জোয়েপলি বলল, 'শুধু কফি, প্লিজ।' আবার ডুব দিল কাজে।

নোলান বলল, 'আমি দরজা বন্ধ করে যাচ্ছি। ফিরে আসব এক্ষুনি।'

জোয়েপলি তার কথা শুনতেও পেল না।

দশ মিনিট পর ল্যাবরেটরির দরজা খুলে গেল। একটি কণ্ঠ বলল, 'তুমি এখনও কাজ করছ, এমিল।'

জোয়েপলি তাকাল। সামনের মানুষটিকে দেখে ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল। 'জ্বি, স্যার।'

'ফাউন্টেন অব ইয়ুথ প্রজেক্ট। টপ সিক্রেট। তাই না?'

ইতস্তত করল এমিল। মিস রোফ বলেছিলেন এ প্রজেক্টের কথা আর কেউ জানে না। তবে এ মানুষটি নিশ্চয় তাদের মধ্যে পড়েন না। ইনিই এমিলকে এ কোম্পানিতে চাকরি দিয়েছেন।

এমিল হাসল। 'জ্বি, স্যার। টপ সিক্রেট।'

'বেশ গোপন থাকাই ভালো। কেমন চলছে কাজ?'

'চমৎকার, স্যার।'

আগন্তুক খরগোশের একটা খাঁচার সামনে হেঁটে গেলেন, পেছন পেছন জোয়েপলি। 'আপনাকে কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে?'

হাসলেন তিনি। 'না, আমি ব্যাপারটা জানি, এমিল।' ঘুরতে যাচ্ছেন, ধাক্কা লাগল খালি একটা বাটিতে। পড়ে গেল ওটা মেঝেতে। 'স্যরি।'

'ঠিক আছে, স্যার। আমি তুলছি।' এমিল জোয়েপলি বাটি তুলে নেয়ার জন্য ঝুঁকল। মনে হল তার মাথাটা যেন বিস্ফোরিত হল লাল রক্তের বন্যার মধ্যে। দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল এলিজাবেথের। চোখভরা ঘুম নিয়ে উঠে বসল বিছানায়। তাকাল ছোট টেবিলে রাখা ডিজিটাল ঘড়ির দিকে। সকাল পাঁচটা। হাতড়ে হুক থেকে ফোন ছুটিয়ে আনল ও। একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ ভেসে এল, 'মিস রোফ? প্ল্যান্ট থেকে সিকিউরিটি গার্ড বলছি। একটা ল্যাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল এলিজাবেথ। 'কারও কিছু হয়নি তো?'

'জ্বি, ম্যাম। একজন বিজ্ঞানী পুড়ে মারা গেছেন।'

এলিজাবেথকে তার নাম বলার দরকার হল না।

চৌত্রিশ

ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাং ভাবছে। টাইপরাইটারের খটাখট, লোকের উচ্চকিত কণ্ঠ, টেলিফোনের আওয়াজ কোনোকিছুই তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না। কারণ সে এসব কিছু দেখছে না, শুনছেও না। সে রোফ অ্যান্ড সন্সের কথা ভাবছে। বুড়ো স্যামুয়েল এ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা, এর নিয়ন্ত্রণ গোটা পরিবারের মধ্যেই রেখে দিয়েছেন। এটা একটা বিপজ্জনক পরিকল্পনা। ইতালীয় ইনস্যুরেন্স কোম্পানি টোনটিনের কথা মনে পড়ে গেল হোরনাং-এর। ব্যাংকার লরেনজো টোনটিন ১৬৯৫ সালে এ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। টোনটিনের প্রতিটি সদস্য সমান পরিমাণ টাকা ব্যাংকে রাখতেন। একজন সদস্য মারা গেলে তার শেয়ার পেতেন জীবিত সদস্যরা। অন্যান্য সদস্যদের ধ্বংস করার শক্তিশালী একটা অনুপ্রেরণা কাজ করত টোনটিন কোম্পানিতে, রোফ অ্যান্ড সন্সের মতো। সবার কোটি কোটি টাকার শেয়ার আছে, কিন্তু তা চাইলেই বিক্রি করতে পারছে না কেউ। ম্যাক্স শুনেছে স্যাম রোফ শেয়ার বিক্রি করতে রাজি হননি। তিনি মারা গেছেন। এলিজাবেথ রোফও শেয়ার বিক্রি করতে রাজি নয়। দুবার অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে সে। অনেক বেশি দুর্ঘটনা। ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাং-এর দুর্ঘটনায় বিশ্বাস নেই। হোরনাং তার বস্ চিফ ইন্সপেক্টর স্কিমডকে স্যাম রোফের দুর্ঘটনার ব্যাপারে রিপোর্ট দিয়েছে। নিজের সন্দেহের কথা বলেছে। রোফ অ্যান্ড সন্সের ভেতরে বড় ধরনের কোনো সমস্যা চলছে। কেউ হয়তো ভেবেছিল স্যাম রোফকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিলে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বস্ বলেছেন এ ব্যাপারে আরও খোঁজখবর নিতে।

চেয়ার ছেড়ে উঠল ম্যাক্স হোরনাং। করিডোর ধরে এগোচ্ছে, করোনার দৌড়ে এল তার দিকে। 'হোরনাং, তোমাকে আমার একটু দরকার।'

চোখ পিটপিট করল ম্যাক্স, 'কী ব্যাপার?'

'জল-পুলিশ নদী থেকে একটা মেয়ের লাশ উদ্ধার করেছে। একবার দেখবে?'

ঢোক গিলল ম্যাক্স, 'তোমার ইচ্ছে।'

এ-কাজটা সে মোটেই উপভোগ করে না। কিন্তু এটা তার ডিউটি।

মর্গের ঠাণ্ডায় ধাতব ড্রয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে নগ্ন মেয়েটা। সোনালি চুল। বয়স উনিশ-কুড়ি। ফুলে গেছে শরীর। গলায় একটা লাল রিবন বাঁধা।

'মৃত্যুর আগে মেয়েটা যৌনমিলন করেছিল প্রমাণ পেয়েছি। তারপর তাকে গলা টিপে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়।' বলল করোনার, 'ফুসফুসে পানি ঢোকেনি। ওর কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাইনি আমরা। একে আগে কখনও দেখেছ?'

মেয়েটার চেহারা দেখল ম্যাক্স। মাথা নাড়ল, 'না।'

সে বাস ধরতে ছুটল। এয়ারপোর্টে যাবে।

পঁয়ত্রিশ

সার্ভিনিয়ার কোস্টা এসমেরেলডা বিমানবন্দরে নামল গোয়েন্দা ম্যাক্স হোরনাং। সবচেয়ে সস্তায় একটা ৫০০ ফিয়াট ভাড়া করে ওলবিয়ায় চলল। চলে এল শহরের কেন্দ্রস্থলে, থানায়। ভবনের মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা : QUESTURA DI SASSARI COMMISARIATO DI POLIZIA OLBIA. ভেতরে ঢুকল ম্যাক্স। নিজের আইডি কার্ড দেখাল এক সার্জেন্টকে। একটু পরে তাকে চিফ অব পুলিশ লুইগি ফেরারোর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

লুইগি ফেরারো ওর সঙ্গে হাত মেলালেন। ম্যাক্সকে দেখে খুশি হতে পারেননি। ছোটখাটো মানুষটিকে মোটেই গোয়েন্দার মতো লাগে না। হোরনাং-এর আইডি কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ম্যাক্স ইতালিয়ান ভাষায় ব্যাখ্যা শুরু করল। চিফ ওকে বাধা দিলেন। বললেন, 'আপনি ইংরেজি জানেন?'

'অবশ্যই', বলল ম্যাক্স।

'তাহলে ইংরেজিতে বলুন।'

ম্যাক্স আবার শুরু করল। চিফ ফেরারো বললেন, 'আপনি ভুল করছেন, সিনর। খামোকা নষ্ট করছেন সময়। আমার মেকানিকরা ইতিমধ্যে পরীক্ষা করেছে গাড়িটা। সবাই একমত যে ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

ম্যাক্স বলল, 'কিন্তু আমি তো গাড়িটা এখনও দেখিনি।'

ফেরারো বললেন, 'ওটাকে বিক্রির জন্য পাবলিক গ্যারেজে রাখা হয়েছে। আমি একজন লোক দিচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

ডিটেকটিভ ব্রুনো কামপাংগাকে দেয়া হল ম্যাক্সের সঙ্গে। 'আমরা ও গাড়ি চেক করে দেখেছি', বলল কামপাংগা। 'ওটা দুর্ঘটনা ছিল।'

'না', বলল ম্যাক্স।

জিপটা গ্যারেজের এককোনায় রাখা হয়েছে। সামনের অংশটা এখনও তোবড়ানো, গায়ে ছাল লেগে আছে।

ম্যাক্স জিপটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। 'ব্রেক কীভাবে নষ্ট করা হল?'

মেকানিক বলল, 'আপনিও একই কথা বলছেন?' স্পষ্ট বিরক্তি তার গলায়। 'আমি পঁচিশ বছর ধরে মেকানিকের কাজ করছি, সিনর। জিপটাকে নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। ফ্যাক্টরি থেকে বেরুবার সময় শেষ এর গায়ে হাত লাগানো হয়।'

‘কেউ এর ব্রেক ফেল করে রেখেছিল’, বলল ম্যাক্স।

‘কীভাবে?’

‘আমি এখনও জানি না কীভাবে। তবে জানব।’ দৃঢ়গলায় বলল ম্যাক্স। শেষবারের মতো তাকাল জিপের দিকে। বেরিয়ে এল গ্যারেজ ছেড়ে।

ওই দিন দুটো কাজ সারল ম্যাক্স হোরনাং। একটা ওলবিয়ার বাইরে, অন্যটা পাহাড়ে। তারপর শেষ বিকেলের প্লেনে ফিরে গেল জুরিখে। ইকোনমি ক্লাসে।

ছত্রিশ

রোফ অ্যান্ড সন্সের সিকিউরিটি ফোর্সের প্রধান এলিজাবেথকে বলল : 'ঘটনাটা খুব দ্রুত ঘটে যায়, মিস রোফ। আমাদের করার কিছু ছিল না। দমকল বাহিনী হাজির হওয়ার আগেই ল্যাবরেটরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।'

ওরা এমিল জোয়েপলির পোড়া লাশ পেয়েছে। জানার কোনো উপায় রইল না বিস্ফোরণের আগে তার ফর্মুলা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কি না।

এলিজাবেথ জানতে চাইল, 'ডেভেলপমেন্ট ভবনে দিনরাত চব্বিশঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা আছে, না?'

'জ্বি ম্যাম, আমরা—'

'আপনি আমাদের সিকিউরিটি বিভাগের দায়িত্বে কতদিন ধরে আছেন?'

'পাঁচ বছর। আমি—'

'আপনাকে বরখাস্ত করা হল।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কী মনে করে আর বলল না। 'জ্বি ম্যাম।'

'আপনাদের কর্মচারীর সংখ্যা কত?'

'পঁয়ষট্টি।'

'পঁয়ষট্টি! আর তারা এমিল জোয়েপলিকে রক্ষা করতে পারল না। ওদেরকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি।' বলল এলিজাবেথ। 'এর মধ্যে সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

লোকটা একমুহূর্তের জন্য তাকাল এলিজাবেথের দিকে।

'মিস রোফ, আপনি কি কাজটা ঠিক করছেন?'

এমিল জোয়েপলির কথা ভাবল এলিজাবেথ, তার চুরি হয়ে যাওয়া অমূল্য ফর্মুলার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তার অফিসে কেউ লুকিয়ে মাইক্রোফোন রেখেছে তার কথা রেকর্ড করার জন্য।

এলিজাবেথ বলল, 'বেরিয়ে যান।'

সারাটা সকাল ও চেষ্টা করল মন থেকে এমিল জোয়েপলির পোড়া লাশের ছবিটাকে মুছে ফেলতে। ফর্মুলা হারানোর কারণে কোম্পানিকে কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তা না-ভাবার চেষ্টা করল। প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো কোম্পানি এখন ওটা

পেটেন্ট করতে পারে এবং এলিজাবেথের কিছুই করার থাকবে না। এটা একটা জঙ্গল। প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন টের পাবে তোমার দুর্বলতা, তোমাকে খুন করার জন্য এগিয়ে আসবে তারা। কিন্তু কোনো প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী এ-কাজ করছে না। কাছের মানুষদের কেউ করছে।

এলিজাবেথ একটি পেশাদার সিকিউরিটি ফোর্সের ব্যবস্থা করল। অচেনা লোকদের মধ্যেই বরং নিরাপদ থাকবে ও।

রিজ উইলিয়ামস অফিসে এসে লক্ষ্য করল ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে এলিজাবেথকে। মেয়েটা আর কত সহ্য করতে পারবে : ভাবল ও। এলিজাবেথের হাত ধরে নরম গলায় জানতে চাইল, 'তোমার জন্য কী করতে পারি?'

সবকিছু, : মনে-মনে বলল এলিজাবেথ। রিজকে সাংঘাতিক দরকার ওর। দরকার তার শক্তি, সাহায্য এবং ভালোবাসা। চোখে চোখ রাখল দুজনে, এলিজাবেথের ইচ্ছে করল রিজের বাহুর মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। ওকে সব কথা খুলে বলে। রিজ জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন নিয়ে কোনো ফোন পাওনি?'

'কিসের প্রতিবেদন?'

'তুমি পড়োনি ওটা?'

'না।'

রিজ তার অফিস থেকে একটা কপি আনিয়ে নিল। প্রতিবেদনে রোফ অ্যান্ড সন্সের সাম্প্রতিক ঝামেলা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে কোম্পানি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ কাউকে দরকার। এলিজাবেথ খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখল। 'এতে কতটা ক্ষতি হবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিজ। 'ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। ওরা মাত্র রিপোর্টিং শুরু করেছে। আমরা আমাদের বাজার হারাতে শুরু করেছি। আমরা—'

বেজে উঠল ইন্টারকম। সুইচ টিপল এলিজাবেথ। 'বলো?'

'হের জুলিয়াস বাডরাট দুই নম্বর লাইনে আছেন, মিস রোফ। তিনি বলছেন ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

রিজের দিকে তাকাল এলিজাবেথ। ব্যাংকারদের সঙ্গে বৈঠক এতদিন ধরে বাতিল করে দিয়ে আসছিল সে।

'লাইন দাও।' ফোন তুলল এলিজাবেথ। 'গুডমর্নিং, হের বাডরাট।'

'গুড মর্নিং,' বাডরাটের কথা কর্কশ এবং ভাঙা শোনাল।

'আপনি বিকেলে ফ্রি আছেন?'

'ওয়েল। আমি—'

'বেশ, তাহলে চারটার সময় বসি?'

ইতস্তত করল এলিজাবেথ। 'জ্বি, চারটায়।'

খুকখুক কেশে গলা পরিষ্কার করলেন হের বাডরাট। 'মি. জোয়েপলির কথা শুনে আমি খুব দুঃখিত।' জোয়েপলির নাম কিন্তু খবরের কাগজে আসেনি।

এলিজাবেথ আস্তে ফোন নামিয়ে রাখল। দেখল রিজ লক্ষ্য করছে ওকে।

'হাঙর রক্তের গন্ধ পেয়েছে,' বলল রিজ।

দুপুরে প্রচুর ফোন এল। স্যার আলেক ফোন করে জানালেন *ফিনানসিয়াল টাইমস* রোফ অ্যান্ড সন্সকে হেডলাইন করে প্রতিবেদন ছেপেছে। তিনি একের-পর-এক ক্যান্সেলের অর্ডার পাচ্ছেন।

ইভো ফোন করে বলল, 'কারিশমা, তোমার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে।' তারপর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সে। এক ইতালিয়ান মন্ত্রীকে ঘুষ নেয়ার অপরাধে পুলিশ কিছুক্ষণ আগে তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করেছে। মন্ত্রী ইতালি থেকে টাকা পাচার করতে যাচ্ছিল। পুলিশ জানতে পেরেছে টাকাটা রোফ অ্যান্ড সন্সের। কোম্পানি মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়েছিল যাতে ইতালিতে ব্যবসা করা যায়।

চার্লস প্যারিস থেকে মহাউদ্বেগ নিয়ে জানাল ফরাসি সংবাদপত্র রোফ অ্যান্ড সন্সের দুর্নাম করছে। সে মিনতি জানাল সম্মান থাকতে থাকতে কোম্পানি বিক্রি করে দিতে। 'আমাদের কাস্টমাররা আস্থা হারিয়ে ফেলছে,' বলল সে, 'আর তাদেরকে ছাড়া কোম্পানি থাকবে না।'

এলিজাবেথ ফোন, ব্যাংকার, তার কাজিন এবং প্রেস নিয়ে ভাবল। খুব দ্রুত সবকিছু ঘটছে। কেউ এসব ঘটাচ্ছে। ওকে দেখতে হবে কে সে।

এলিজাবেথ ওর সুইজারল্যান্ডের স্কুলজীবনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মারিয়া মার্টিনেল্লিকে ফোন করল। মারিয়া এখন মডেল, মিলানের টনি নামের এক ইতালিয়ান সংবাদপত্রের মালিককে সে বিয়ে করবে শুনেছে এলিজাবেথ। কুশল বিনিময়ের পর এলিজাবেথ বলল, 'আমার একটা কাজ করে দেবে, মারিয়া?'

'বলো।'

এক ঘণ্টার মধ্যে ফোন করল মারিয়া। 'তুমি যা জানতে চেয়েছ সে তথ্য আমি জোগাড় করেছি। যে ব্যাংকার ইতালি থেকে টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। টনি বলেছে এক লোক বর্ডার-পুলিশকে ঘুষ দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।'

'লোকটার নাম জানো?'

'ইভো পালাজি।'

কাঁটায় কাঁটায় চারটার সময় এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করলেন হের জুলিয়াস বাডরাট। সরাসরি বললেন : 'বোর্ডের ডিরেকটররা রোফ অ্যান্ড সন্সের কাছ থেকে তাদের লোন ফেরত চাইছে।'

'কিন্তু আমাকে তো নব্বই দিন সময় দেয়া হয়েছিল।' বলল এলিজাবেথ।

'দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা অনুভব করতে পারছি ঘটনা আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। আপনাকে জানানো দরকার আপনি অন্য যেসব ব্যাংকের সঙ্গে কাজ করছেন তারাও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

ব্যাংকের সাহায্য ছাড়া কোম্পানিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়।

'আপনাকে খারাপ খবরগুলো দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত, মিস রোফ। কিন্তু ভাবলাম ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কথাগুলো বলা দরকার।'

'আপনি জানেন রোফ অ্যান্ড সন্স এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী কোম্পানি।'

মাথা দোলালেন বাডরাট। 'জানি।'

'কিন্তু তারপরও আপনারা সময় দিতে চাইছেন না।'

হের বাডরাট একমুহূর্তের জন্য তাকালেন ওর দিকে, এরপর বললেন, 'ব্যাংক মনে করে আপনার সমস্যা সমাধানযোগ্য, মিস রোফ। কিন্তু—' ইতস্তত করছেন তিনি।

'কিন্তু আপনাদের ধারণা সমাধান করার কেউ নেই, তাই না?'

'জ্বি, আমাদের তাই ধারণা', সিধে হতে শুরু করলেন তিনি।

'অন্য কেউ যদি রোফ অ্যান্ড সন্সের প্রেসিডেন্ট হয়, তাহলে?'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমরা এ সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেছি। তবে বোর্ডের বর্তমান সদস্যদের কেউ এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে আমাদের মনে হয়নি।'

এলিজাবেথ বলল, 'আমি রিজ উইলিয়ামসের কথা ভাবছি।'

সাঁইত্রিশ

টেমস মেরিন পুলিশ ডিভিশনের কনস্টেবল টমাস হিলার এ-মুহূর্তে নানা সমস্যায় আছে। তার ঘুম পাচ্ছে, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট, কামার্ত এবং ভিজে চুপচপে।

তার ঘুম পাচ্ছে কারণ তার প্রেমিকা ফ্লো কাল সারারাত তাকে জাগিয়ে রেখে ঝগড়া করেছে। ঘুমাতে দেয়নি। আর ঝগড়ার কারণে ডিউটিতে যেতে দেরি হয়েছে বলে খাওয়ার সময় পায়নি। সে কামার্ত কারণ তার প্রেমিকা তাকে শরীর স্পর্শ করতে দেয়নি। আর ভিজে চুপচুপে হয়ে থাকার কারণ তেত্রিশ ফুট লম্বা এই পুলিশ-বোট তৈরি করা হয়েছে কাজ করার জন্য, আরাম করতে নয়। বৃষ্টির ঝাপটায় হুইল হাউজে দাঁড়ানো টমাস হিলার ভিজে ঝড়ো কাক হয়ে গেছে। এসব দিনে কিছু করার বা দেখার থাকে না।

টেমস ডিভিশন ডাটফোর্ড ক্রিক থেকে স্টেইনস ব্রিজ পর্যন্ত চুয়াল্লিশ মাইল নদী-এলাকায় টহল দিচ্ছে। কনস্টেবল হিলার টহল দিতে পছন্দই করে। তবে এরকম পরিস্থিতিতে নয়। গোল্লায় যাক নারীজাতি। ফ্লো-কে বিছানায় কল্পনা করল সে। ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে, বড় পাছাজোড়া ওপর-নিচ করছে আর চিৎকার দিচ্ছে।

ঘড়ি দেখল হিলার। ডিউটি শেষ হতে আরও আধঘণ্টা বাকি। ওয়াটারলুর জেটির দিকে এগোচ্ছে বোট। হিলারের এখন সমস্যা হল কোন্‌টা আগে করবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া : ঘুমাবে, খাবে, নাকি ফ্লো-র ওপর হামলে পড়বে। হয়তো একসঙ্গে তিনটা কাজই করবে : ভাবল সে। ঘুম তাড়াতে চোখ ঘষল হিলার। বৃষ্টির ধূসর চাদরে ঢাকা পড়া নদীর দিকে তাকাল।

মনে হল ওটা আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়েছে। বড় একটা সাদা মাছ, পেট বের করে ভাসছে। প্রথম দর্শনে হিলারের তাই মনে হল। স্টার বোর্ড থেকে দশ গজ দূরে। হাঁক ছাড়ল হিলার : 'সার্জেন্ট, স্টারবোর্ড থেকে কুড়ি ডিগ্রি দূরে একটা মাছ দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে হাঙর।'

একশো অক্ষশক্তি সম্পন্ন ডিজেল ইঞ্জিনের ছন্দ হঠাৎ বদলে গেল, বোটের গতি মন্থর হয়ে এল। সার্জেন্ট গাসাকিন এসে পাশে দাঁড়াল।

'কোথায় ওটা?'

‘ওই তো।’

টহল বোট সাদা মাছটার দিকে এগিয়ে গেল। সার্চলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল এবার, বোর ঠিক নিচে ওটা। বিস্ফারিত চোখে ওদিকে তাকিয়ে থাকল দুজনে। মাছ নয়, সাদা শরীরটা এক স্বর্ণকেশীর।

লাশটা নগ্ন। ফুলে থাকা ঘাড়ে শুধু একটা লাল রিবন বাঁধা।

আটত্রিশ

ম্যাক্স হোরনাং কম্পিউটার ব্যবহারে একজন জিনিয়াস। সে কনসোল বোর্ডের সামনে বসে যন্ত্রটাকে হেলায় খেলিয়ে চলে। কম্পিউটারের ভাষা তার জন্য কোনো ব্যাপার নয়, কারণ ম্যাক্স প্রতিটি ভাষাই জানে। সে কম্পিউটার নিয়ে বসেছে রোফ অ্যান্ড সন্সের অতি উচ্চপদস্থ ডিরেক্টরদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। এরা সকলেই এলিজাবেথ রোফের আত্মীয়স্বজন।

ম্যাক্স সার্ডিনিয়া গিয়েছিল। এলিজাবেথ যে-গাড়ি নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, তদন্ত করে জেনেছে কেউ ওটার ব্রেক ফেল করে রেখে এলিজাবেথকে হত্যার চেষ্টা করে। ম্যাক্সের সন্দেহ, এলিজাবেথের বাবাকেও কেউ খুন করেছে। সে খুনি বা খুনিদের ধরতে চায়। তার সন্দেহ রোফ অ্যান্ড সন্সকে ঘিরে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে কোম্পানির উপরমহলের কেউ। ষড়যন্ত্রকারীকে ধরতে পারলেই রহস্যের অনেক সুরাহা হয়ে যাবে বলে ডিটেকটিভের বিশ্বাস।

সে লন্ডনে এসে প্রথমেই স্যার অ্যালেক গিনেস সম্পর্কে তথ্য বের করল কম্পিউটার ঘেঁটে। জানল স্যার অ্যালেক একটি বেন্টলি এবং একটি মরিসের মালিক। তিনি একজন এক্সপার্ট মেকানিকও। গাড়ি মেরামতির কাজ নিজেই করেন। কম্পিউটার ম্যাক্সকে তথ্য দিল স্যার অ্যালেক তার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করছেন। কেন? লন্ডনে ম্যাক্সের বন্ধুর অভাব নেই। দুদিনের মধ্যে সে জেনে ফেলল স্যার অ্যালেক সোহার একটি ক্লাবের মালিক টম মাইকেলের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছেন। পুলিশ কম্পিউটার সাহায্য নিয়ে জানা গেল টড মাইকেলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। তবে প্রমাণের অভাবে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যায়নি। সোহোতে গেল ম্যাক্স। নানা জনকে প্রশ্ন করে জানল স্যার অ্যালেক নিকলস জুয়া খেলেন না, তবে তার স্ত্রী খেলে।

ম্যাক্সের কাজ শেষ। তার কোনো সন্দেহ নেই স্যার অ্যালেক ব্লাকমেইলের শিকার। তার প্রচুর অপরিশোধিত বিল রয়েছে। তার অনেক টাকা দরকার। অ্যালেকের মিলিয়ন ডলারের স্টক রয়েছে, তা বিক্রি করতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। স্যাম রোফ অ্যালেকের পথের কাঁটা ছিলেন, এখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এলিজাবেথ রোফ। স্যার অ্যালেক নিকলসকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করার একটা কারণ পাওয়া গেল।

ম্যাক্স রিজ উইলিয়ামসের ব্যাপারে কম্পিউটার থেকে তথ্য জোগাড় করল। তবে সন্দেহজনক কিছু পেল না। রিজ উইলিয়ামসের বয়স ৩৪, জন্ম ওয়েলসে, অবিবাহিত। সে রোফ অ্যান্ড সন্সের একজন নির্বাহী। বাৎসরিক বেতন আটত্রিশ হাজার ডলার, সেইসঙ্গে বোনাসও আছে। লন্ডনের একটি সেভিংস অ্যাকাউন্টে তার নামে পঁচিশ হাজার পাউন্ড আছে, একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আছে আটশো পাউন্ড। জুরিখে একটি সেফ ডিপোজিট বক্স আছে, তাতে কী আছে জানাতে পারল না কম্পিউটার, সে ক্রেডিটকার্ডে মূল্য পরিশোধ করে। বেশিরভাগ জিনিসপত্র কিনেছে মহিলাদের জন্য। রিজ উইলিয়ামসের কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। রোফ অ্যান্ড সন্সে নয় বছর ধরে সে কাজ করছে।

তথ্য পেয়ে সন্তুষ্ট হল না ম্যাক্স। মনে পড়ল সে যখন এলিজাবেথকে জেরা করছিল, ওই সময় রিজ কীভাবে ফুঁসে উঠেছিল। রিজ কাকে রক্ষা করতে চাইছে? এলিজাবেথ রোফকে? নাকি নিজেকে?

ওই দিন সন্ধ্যা ছ'টায় ম্যাক্স আলিটাশিয়ার ইকোনমি ফ্লাইট ধরে রোমের উদ্দেশে উড়াল দিল। রোমে তার বন্ধুর কম্পিউটার নিয়ে বসে গেল ইভো পালাজ্জি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্য। গত দশবছর ধরে ইভো তার দুই সংসার নিয়ে গোপনে যাপন করছিল। কিন্তু ম্যাক্স হোরনাং জেনে ফেলল তার দ্বিতীয় স্ত্রীর খবর। জানল দ্বিতীয় স্ত্রী ডোনাটেলা স্পোলিনির গর্ভের তিন কন্যাকে স্বীকৃতি দেয়নি ইভো। এদেরকে গোপনে পড়ালেখা করাচ্ছে সে। ইভোর প্রথম স্ত্রী সিমোনেটা যে একবার তার স্বামীকে ছুরি নিয়ে খুন করতে যাচ্ছিল তাও অজানা রইল না ম্যাক্সের কাছে কম্পিউটার ঘেঁটে। সে জানল ডোনাটেলা ভয়ানক বদরাগী। ম্যাক্সের মনে প্রশ্ন জাগল : ডোনাটেলা আর ইভোর মধ্যে কি কিছু ঘটেছে? সে কি ইভোর কাণ্ড ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখিয়েছে? এ কারণেই কি ইভো হঠাৎ করে ব্যাংকের কাছে বড় অঙ্কের লোন চেয়েছে? কিন্তু ইভো কতদিন তার এই গোপন সংসারের কথা গোপন রাখতে পারবে? ইভো টাকার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠলে তার দ্বারা কী করা সম্ভব?

ম্যাক্স কম্পিউটার বন্ধ করল। যা জানার জেনে গেছে। এয়ার ফ্রান্সের দুপুরের ফ্লাইটে সে প্যারিস গেল।

প্যারিস পৌঁছে চার্লস এবং হেলেন রোফ মার্টেলের খোঁজখবর নিতে লাগল ম্যাক্স। জেনে ফেলল চার্লস আঙুরের ব্যবসায় প্রচুর টাকা খাটিয়েছিল। কিন্তু এত টাকা কোথায় পেল সে? নকল গহনা প্রস্তুতকারী পিয়েরে রিচার্ডের কথা জানল ম্যাক্স খোঁজ

নিয়ে। জানল হেলেনের গহনা এখান থেকে নকল করত চার্লস। দুই মিলিয়ন ফ্রাঁ সে তাহলে বৌর চুরি-করা গহনা বন্ধক রেখে জোগাড় করেছে! বেপরোয়া হয়ে সে আর কী কাজ করেছে? স্ত্রীর হুকুমের দাস চার্লস ভয়ানক কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে পারে বলে বিশ্বাস হল না ম্যাক্সের। তাকে হেলেন সম্পর্কে একটা তথ্য দিল কম্পিউটার। হেলেন একজন পর্বতারোহী। সে সম্প্রতি পর্বতারোহণের জন্য ৩৬ এ-সাইজের জুতো কিনেছে। মনে পড়ল স্যাম রোফ পাহাড় বাইতে গিয়ে নিহত হয়েছেন।

উনচল্লিশ

প্যারিসের একটি নির্জন রাস্তা রু আরেমেনগদ। রাস্তার দুধারে ঢালু ছাদওয়ালা একতলা-দোতলা বাড়ি। এ রাস্তার সবচেয়ে উঁচু ভবনটির নাম্বার ২৬। আটতলা কাচ, ইস্পাত আর পাথর দিয়ে মোড়ানো। এটা ইন্টারপোলের সদর দপ্তর। এখানে আন্তর্জাতিক অপরাধীদের ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাং বেজমেন্টের প্রকাণ্ড শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কম্পিউটারে তথ্যর জন্য চোখ বোলাচ্ছে। ইন্টারপোলের এক সদস্য এসে বলল, 'উপরতলায় স্নাফ ফিল্ম চালাচ্ছে। দেখবে?'

ম্যাক্স মুখ তুলে চাইল। 'স্নাফ ফিল্ম কী জিনিস?'

'গেলেই দেখতে পাবে।'

তিনতলায় বড় একটি স্ক্রিনিং রুমে দুই ডজন নারী-পুরুষ বসে আছে। এরা কেউ ইন্টারপোলের সদস্য, কেউ এসেছে সুরেত থেকে, কেউবা সাদা পোশাকের গোয়েন্দা। কয়েকজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশও আছে।

ম্যাক্স ভেতরে ঢুকে দেখল ঘরের দেয়ালে টাঙানো কালো পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে ইন্টারপোলের সেক্রেটারির এক সহকারী, রেনে আলমেদিন কথা বলছে। সে পেছনের সারির একটা আসন দখল করল।

রেনে আলমেদিন বলছে '...গত বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা স্নাফ ফিল্মের গুজব শুনে আসছি। এসব পর্নো ছবিতে ক্যামেরার সামনেই ভিক্টিমকে হত্যা করা হয়। তবে এরকম কোনো ছবির অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণও পাওয়া যায়নি। এর কারণটা অবশ্যই পরিস্কার। কারণ এসব ছবি পাবলিকের জন্য তৈরি করা হয় না। শুধু বড়লোকদের বিকৃত কাম চরিতার্থ করতে এসব ছবি বানানো হয়।' রেনে আলমেদিন চোখ থেকে চশমা খুলল। 'কয়েক দিন আগেও আমরা এসব ছবির অস্তিত্ব গুজব বলেই ভাবতাম। তবে সে ধারণা বদলে গেছে। আপনারা এখন সত্যিকারের একটি স্নাফ ফিল্মের ফুটেজ দেখতে পাবেন।' দর্শক নড়েচড়ে বসল। 'দিন দুই আগে অ্যাটাচি কেস হাতে এক লোক প্যারিসের রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির নিচে চাপা পড়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায় সে। লোকটার পরিচয় জানা যায়নি। সুরেত তার অ্যাটাচি কেস থেকে এই ফিল্মের রিলটা উদ্ধার

করে এবং ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেয়। ওখানে ডেভেলপ করা হয় ছবি।' রেনে ইঙ্গিত করল। ম্লান হয়ে এল বাতির আলো। শুরু হল ছবি।

সোনালি চুলের মেয়েটির বয়স আঠারোর বেশি হবে না কিছুতেই। এত সুন্দরী একটি মেয়ে এমন বিকৃত যৌনতায় মেতে উঠতে পারে, এ ছবি না-দেখলে বিশ্বাস হত না ম্যাক্সের। তার সঙ্গীর গায়ে একগোছাও লোম নেই। ক্যামেরা খুব কাছ থেকে লোকটার প্রকাণ্ড লিঙ্গকে ফোকাস করল। মেয়েটির দুই ঊরুর ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। এবার ক্লোজআপে মেয়েটির মুখ ধরল ক্যামেরা। একে আগে কখনও কোথাও দেখেনি ম্যাক্স হোরনাং। তার চোখ আটকে গেল মেয়েটির গলায় বাঁধা লাল রিবনে। কী যেন মনে পড়তে পড়তেও পড়ছে না। লাল রিবন! এর আগে কোথায় দেখেছে সে? পর্দার মেয়েটির যৌন উত্তেজনা যখন চরমে, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে রাগমোচন হতে চলেছে তার, এমন সময় লোকটার দুই হাত চেপে ধরল তার গলা। চাপ দিতে লাগল। মেয়েটির চেহারা থেকে কামোত্তেজনা উধাও হয়ে গেল, ফুটল নির্জলা আতঙ্ক। রক্ষা পাবার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল সে। কিন্তু লোকটা এমন জোরে চেপে ধরে আছে তাকে, কিছুতেই ছুটে যেতে পারল না। মেয়েটির রেতঃপাত হচ্ছে, একই সঙ্গে মৃত্যু ঘটল তার। আবারও ক্লোজআপে তার মুখ দেখাল ক্যামেরা। ছবি শেষ। জ্বলে উঠল ঘরের আলো। আর তখন মনে পড়ে গেল ম্যাক্সের এ মেয়েটির লাশই জুরিখের নদী থেকে তুলে আনা হয়েছিল।

এরপর ইন্টারপোল গোটা ইউরোপে তার পাঠাল স্বর্ণকশী কোনো তরুণীর লাশের সন্ধান পেলে সদর দপ্তরে জানাবার জন্য। টেলিগ্রাম এল একই রকম : হত্যাকাণ্ড ঘটেছে জুরিখ, লন্ডন, রোম, পর্তুগাল, হামবুর্গ এবং প্যারিসে।

রেনে আলমেদিন ম্যাক্সকে বলল, 'বর্ণনা খাপে খাপ মিলে গেছে। সকল ভিকটিমই স্বর্ণকেশী, তরুণী, প্রত্যেককে যৌনমিলনের সময় গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিটি লাশের গলায় লাল রিবন বাঁধা ছিল। আমরা এক গণহত্যাকারীর সন্ধান করছি। এমন একজন যার পাসপোর্ট আছে এবং যে নিজের বিমানে ঘুরে বেড়ানোর সামর্থ্য রাখে অথবা পয়সা খরচ করতে পরোয়া করে না।'

সাদা পোশাকের এক লোক অফিসে ঢুকে বলল, 'একটা ভালো খবর পাওয়া গেছে। ছবিটার ফিল্ম তৈরি হয়েছে ব্রাসেলসের একটা ছোট আউট ফিটে। তারা এ ফিল্ম যাদের কাছে বিক্রি করেছে সেসব খদ্দেরের একটা তালিকা আমরা পেয়ে যাব।'

ম্যাক্স বলল, 'তালিকাটা পেলে আমাকে একবার দেখিয়ো।'

'অবশ্যই।' বলল রেনে আলমেদিন। ম্যাক্স হোরনাংকে লক্ষ্য করছে সে। ছোটখাটো মানুষটাকে গোয়েন্দা বলে মনেই হয় না। অথচ এ-ই স্বর্ণকেশী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে স্নাফ ছবির যোগসূত্র আবিষ্কার করেছে।

'তোমার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রয়ে গেল,' বলল রেনে।

তার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল ম্যাক হোরনাং। 'কিসের জন্য?'

চল্লিশ

রোফ অ্যান্ড সন্সের বোর্ডের পরিচালকদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার শেষপ্রান্তে পৌঁছেছে ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাং। সর্বশেষ সে গেল বার্লিনে। তার বন্ধুরা কম্পিউটার নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ম্যাক্স নিক্সডর্ফ কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলল। এতে বিশেষ কার্ড না-ঢোকালে কম্পিউটার সাড়া দেয় না। সে আলিয়ানজ এবং স্কুফার বিখ্যাত কম্পিউটারগুলোর সঙ্গেও কথা বলল। গেল ওয়েজবাডেনে বান্ডেস ক্রিমিনালামান্টে জার্মানিতে সকল অপরাধীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে।

'তোমার জন্য আমরা কী করতে পারি?' জানতে চাইল তারা।

'ভালথার গাসনার সম্পর্কে আমাকে বলো।'

বলল। পরিষ্কার বর্ণনা দিয়ে গেল ভালথারের গোটা জীবন সম্পর্কে। ম্যাক্স এখন ভালথারের রুচি, প্রিয় মদ, খাবার, হোটেল ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে জানে। ভালথার একজন তরুণ স্কি-ইন্সট্রাকটর যে নারীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত এবং তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক কোটিপতি নারীকে বিয়ে করেছে।

একটা বিষয় কৌতূহলী করে তুলল ম্যাক্সকে। ড. হেইসেনের নামে দুশো মার্কের একটা বাতিল চেক। চেকের গায়ে লেখা 'ফর কনসালটেশন'। কী ধরনের কনসালটেশন? ডুসেলডর্ফের ড্রেসডেনার ব্যাংক থেকে ভাঙানো হয়েছে চেকটা। পনেরো মিনিট পর ব্যাংকের শাখা-ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলল ম্যাক্স। হ্যাঁ, ম্যানেজার অবশ্যই ড. হেইসেনকে চেনে। তিনি ব্যাংকের একজন মূল্যবান গ্রাহক।

'কী ধরনের ডাক্তার তিনি?'

'সাইকিয়াট্রিস্ট।'

ডুসেলডর্ফে ড. হেইসেনেকে এবার ফোন করল ম্যাক্স। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন তার রোগীদের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে পারবেন না। আর এসব ব্যাপার ফোনে বলার প্রশ্নই নেই। খটাস করে ফোন রেখে দিলেন তিনি।

কম্পিউটারের সামনে বসল ম্যাক্স। 'আমাকে ড. হেইসেন সম্পর্কে বলো', বলল সে।

তিন ঘণ্টা পর ম্যাক্স আবার ফোন করল ড. হেইসেনকে।

'আপনাকে তো একটু আগেই বললাম', ধমকের সুর হেইসেনের কণ্ঠে, 'আমার কোনও রোগী সম্পর্কে তথ্য পেতে হলে আইনি অনুমতি নিয়ে আমার অফিসে আসতে হবে।'

'এ মুহূর্তে ডুসেলডর্ফে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়', ব্যাখ্যা করল ম্যাক্স।

'সে আপনার ব্যাপার। আর কিছু? আমি ব্যস্ত আছি।'

'আমি জানি আপনি ব্যস্ত মানুষ। আমার সামনে আপনার গত পাঁচবছরের ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্ট রয়েছে।'

'তো?'

ম্যাক্স বলল, 'ডক্টর, আমি আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না। কিন্তু আপনি অবৈধভাবে আপনার আয়ের পঁচিশ শতাংশ অর্থ হজম করেছেন। আপনি চ্যালেঞ্জ করলে আমি আপনার ফাইল জার্মান ইনকামট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাব এবং তাদেরকে বলে দেব কোথায় কী খুঁজতে হবে। ওরা মিউনিখে আপনার সেফ ডিপোজিট বক্স থেকে শুরু করতে পারে কিংবা বাসলেতে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও খোঁজ নিতে পারে।'

অনেকক্ষণ নীরব রইল ও পাশ, তারপর জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর, 'আপনি কে বলছিলেন?'

'ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাং, সুইস ক্রিমিনাল পোলিজাই।'

আবার বিরতি। ডাক্তার নরম গলায় জানতে চাইলেন, 'আপনি আসলে কী জানতে চাইছেন?'

ম্যাক্স বলল তাকে।

ডক্টর হেইসেন একবার কথা শুরু করলে তাকে থামানো মুশকিল। হ্যাঁ, ভালথার গাসনারের কথা মনে আছে তাঁর। লোকটা কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। নিজের নাম বলতে চায়নি। ভান করেছে বন্ধুর সমস্যা নিয়ে কথা বলতে এসেছে। 'আর এ-ব্যাপারটাই আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়।' বললেন ড. হেইসেন। 'অনেক লোকই তাঁদের নিজেদের সমস্যার কথা বলতে ভয় পায়।'

'কী-ধরনের সমস্যা?'

'সে বলল তার বন্ধু নাকি সিজোফ্রেনিক এবং আত্মহত্যাপ্রবণ। তাকে থামানো না-গেলে কাউকে খুন করে বসবে। লোকটা জানতে চেয়েছিল এ রোগের কোনো চিকিৎসা আছে কি না। বলল সে তার বন্ধুকে পাগলাগারদে রাখতে পারবে না।'

'আপনি তাকে কী বললেন?'

'বললাম তার বন্ধুকে আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জানতে হবে তার মানসিক অসুস্থতার ধরনটা কী এবং আধুনিক ওষুধ তার কাজে আসবে কিনা, না কি অন্য কোনো সাইকিয়াট্রিকের কাছে যেতে হবে, অথবা থেরাপি নেয়ার দরকার হবে কি না।

'তারপর কী হল?'

'কিছু না, লোকটার চেহারাও আর দেখিনি আমি। তাকে সাহায্য করার ইচ্ছে ছিল আমার। তাকে খুব বিধ্বস্ত লাগছিল।'

ম্যাক্স বলল, 'ডাক্তার, আপনি বললেন সে আপনাকে তার নাম বলতে চায়নি। তারপরও সে আপনাকে নিজের নাম দস্তখত করা চেক দিল কেন?'

ব্যাখ্যা করলেন হেইসেন। 'টাকা আনতে ভুলে গিয়েছিল সে। শেষে চেক লিখে দিয়েছে। তখন তার নামটা জানতে পারি আমি। আর কিছু জানতে চান, স্যার?'

'না।'

পরদিন ভোরে জুরিখ ফিরে এল ম্যাক্স। তার টেবিলে একটা টেলিটাইপ। ইন্টারপোল থেকে পাঠিয়েছে। স্নাফ হত্যা ছবির ক্রেতাদের নামের তালিকা।

তালিকায় আটজনের নাম রয়েছে।

এরমধ্যে একটি রোফ অ্যান্ড সন্স।

চিফ ইন্সপেক্টর স্কিমডকে রিপোর্ট দিল ম্যাক্স। বলল, 'ওদের পাঁচজনের কেউ লিফটের দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন। আর কাজটা করার সুযোগ প্রত্যেকেরই রয়েছে। লিফট ভেঙে পড়ার দিন জুরিখে সকলে বোর্ড মিটিঙে ছিলেন। তাদের কেউ একজন গাড়ি দুর্ঘটনার সময় সার্ডিনিয়ায় হাজির থাকতে পারেন।'

চিফ ইন্সপেক্টর ভুরু কোঁচকালেন। 'তুমি পাঁচজন সন্দেহভাজনের কথা বললে। এলিজাবেথ ছাড়া বোর্ডের সদস্য চারজন। বাকি সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি কে?'

ম্যাক্স জবাব দিল, 'স্যাম রোফ চ্যামনিক্সে খুন হওয়ার দিন যে-লোকটি সঙ্গে ছিল সে, রিজ উইলিয়ামস।'

একচল্লিশ

মিসেস রিজ উইলিয়ামস।

বিশ্বাস হচ্ছে না এলিজাবেথের। পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব লাগছে। এ যেন শৈশবের স্বপ্নপূরণ। এলিজাবেথের মনে পড়ল কৈশোরে কতবার সে এক্সারসাইজ খাতায় 'মিসেস রিজ উইলিয়ামস' নামটি লিখেছে। আঙুলে পরা বিয়ের আংটির দিকে তাকাল ও।

রিজ জানতে চাইল, 'হাসছ কেন?' বিলাসবহুল বোয়িং ৭০৭-৩২০-এর একটি আরামকেদারায় বসেছে সে এলিজাবেথের পাশে। আটলান্টিক মহাসাগরের পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে ওরা, ডিনার করছে ইরানি ক্যাভিয়ার এবং বরফঠাণ্ডা ডম পেরিগনন দিয়ে। ব্যাপারটা এমন স্বপ্নের মতো লাগছে, হেসে উঠল এলিজাবেথ।

রিজ হাসল। 'আমি কি কিছু বলেছি?'

মাথা নাড়ল এলিজাবেথ। তাকাল রিজের দিকে। কী সুদর্শন ও। ওর স্বামী। আমি খুব সুখী।

রিজ বুঝতে পারবে না ও কতটা সুখী। কীভাবে সে রিজকে ব্যাখ্যা করবে বিয়েটা তার কাছে কতটা অর্থবহ। রিজ বুঝবে না। কারণ এটা ওর কাছে বিয়ে নয়, ব্যবসার প্রস্তাব। কিন্তু ও রিজকে ভালোবাসে। ওর সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাতে চায়। ওর সন্তানের মা হতে চায়। এলিজাবেথ আবার তাকাল রিজের দিকে। ভাবল : আগে আমাকে ছোট একটা সমস্যার সমাধান করতে হবে। ওকে আমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াতে হবে।

এলিজাবেথ রিজকে প্রস্তাব দিয়েছিল জুলিয়াস বাডরাটের সঙ্গে বৈঠকের পর। ব্যাংকার চলে যাওয়ার পর এলিজাবেথ সাবধানে ওর চুল গোছগাছ করল। ঢুকল রিজের অফিসে। গভীর দম নিয়ে বলল, 'রিজ, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

রিজের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখল এলিজাবেথ। সে কিছু বলার আগে এলিজাবেথ দ্রুত ব্যাখ্যা করল, 'এটা পুরো একটা ব্যবসায়িক চুক্তি হবে। ব্যাংক আমাদের লোনের সময় বাড়াতে রাজি যদি তুমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে রোফ অ্যান্ড সন্সের হাল ধরো। আর এটা একমাত্র সম্ভব—'গলা অস্পষ্ট শোনাল এলিজাবেথের—

'যদি পরিবারের কোনো সদস্যকে বিয়ে করো। আ-আমি ছাড়া পরিবারে বিবাহযোগ্য আর কেউ নেই।'

লজ্জায় রাঙা হল এলিজাবেথের মুখ। রিজের দিকে তাকাতে পারছে না।

'তবে এটা সত্যিকারের বিয়ে হবে না অবশ্য', বলল এলিজাবেথ।

'এক অর্থে তাই— তবে যখন-তখন তুমি আমার কাছে আসতে পারবে।'

রিজ দেখছে ওকে। কিছু বলছে না। এলিজাবেথ চাইছে ও কিছু বলুক।

'রিজ—'

'দুঃখিত। তুমি আমাকে ভয়ানক চমকে দিয়েছ।' হাসল রিজ। 'প্রতিদিন তো আর কোনো পুরুষ এরকম কোনো সুন্দরী মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পায় না। ঠিক আছে। আমি রাজি।'

এলিজাবেথের মাথা থেকে বিরাট ওজনের পাথর নেমে গেল। এবার ও শত্রুপক্ষকে চেনার সময় পাবে। রিজকে সঙ্গে নিয়ে ভয়ংকর ঘটনাগুলো আর ঘটতে দেবে না। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেয়া দরকার।

'তুমি কোম্পানির প্রেসিডেন্ট থাকবে', বলল এলিজাবেথ। 'কিন্তু স্টকের ভোটিং কন্ট্রোল থাকবে আমার হাতে।'

ভুরু কুঁচকে গেল রিজের। 'আমি যদি কোম্পানি চালাই—'

'তুমিই চালাবে', তাকে আশ্বস্ত করল এলিজাবেথ। 'কিন্তু স্টক নিয়ন্ত্রণ— আমার নামে থাকবে। ওটা বিক্রি করা যাবে না।'

'আচ্ছা।'

ওর চেহারায় অসন্তোষ দেখতে পেল এলিজাবেথ। রিজ প্রেসিডেন্ট হলে কোম্পানি অন্য কারও হাতে চলে যাওয়ার ভয় থাকবে না। রিজ শক্তহাতে হাল ধরতে পারবে। এলিজাবেথ কোম্পানি পাবলিক করে ফেলবে, যে-যার শেয়ার বিক্রিরও সুযোগ পাবেন। কিন্তু কোম্পানি ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে কে মেতে উঠেছে না-জানা পর্যন্ত এলিজাবেথ এ-ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে না। রিজকে সব খুলে বলার তাগিদ অনুভব করল সে। কিন্তু এখনও সময় আসেনি। শুধু বলল, 'স্টকের ব্যাপারটা ছাড়া আর সবকিছু তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।'

রিজ অনেকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। শেষে বলল, 'তুমি কবে বিয়ে করতে চাও?'

'যত দ্রুত সম্ভব।'

বিয়েতে অ্যানা আর ভালথার বাদে সবাই এল। জুরিখে বিশাল এক পার্টি দিল এলিজাবেথ। তার আত্মীয়স্বজন সকলেই এ বিয়েতে খুশি। তবে এলিজাবেথের নিজেকে প্রতারক বলে মনে হচ্ছে। ও তো আসলে বিয়ে করছে না, বিয়েটাকে সে ব্যবসায়িক প্রস্তাবে নিয়ে গেছে।

বিয়ের পরদিনই বোর্ড মিটিং হল। রিজ উইলিয়ামসকে সর্বসম্মতিক্রমে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হল। সেই সাথে রোফ অ্যান্ড সন্সের চিফ অপারেটিং অফিসারের দায়িত্বও পেল রিজ। সবার মনের প্রশ্নটা তুলল চার্লস। 'তুমি এখন কোম্পানি চালাচ্ছ। আমরা কি স্টক বিক্রি করতে পারব?'

এলিজাবেথ ঘরের মধ্যে হঠাৎ উত্তেজনা টের পেল।

'স্টক নিয়ন্ত্রণ এলিজাবেথের হাতে', রিজ বলল তাদেরকে। 'এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার তার।'

সবক'টা মাথা ঘুরে গেল এলিজাবেথের দিকে।

'আমরা স্টক বিক্রি করছি না', ঘোষণা করল এলিজাবেথ।

এলিজাবেথ আর রিজ একা হওয়ার পর সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রিওতে হানিমুন করতে যাবে?'

এলিজাবেথ ওর দিকে তাকাল। ব্যথায় মুচড়ে উঠল বুক।

হালকা গলায় যোগ করল রিজ, 'ওখানে আমাদের ম্যানেজার চাকরি ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে। ব্যাপারটা ফয়সালা করতে আমি ওখানে যাব। বৌ সঙ্গে নিয়ে না গেলে খারাপ দেখায়।'

মাথা দোলাল এলিজাবেথ, 'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।' তুমি একটা বোকা : নিজেকে বলল ও। ওটা তোমার বুদ্ধি। এটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, বিয়ে নয়। রিজের কাছ থেকে কিছু আশা করার অধিকার তোমার নেই। ওর ভেতর থেকে তবু কে যেন বলে উঠল : কে জানে কী ঘটবে!

গ্যালিও বিমানবন্দরে নামল ওরা। আবহাওয়া আশ্চর্য উষ্ণ। এলিজাবেথ বুঝতে পারল রিওডি জেনিরোতে এখন গ্রীষ্মকাল। একটা মার্সিডিজ ৬০০ অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। বছর কুড়ির রোগা-পাতলা এক তরুণ গাড়ির শোফার। গাড়িতে চড়ার পর রিজ জিজ্ঞেস করল, 'লুইস কই?'

'লুইস অসুস্থ, মি. উইলিয়ামস। আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব।'

'লুইসকে বোলো আমি দোয়া করেছি ও যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।'

রিয়ারভিউ মিররে ওদেরকে দেখল ড্রাইভার। বলল, 'বলব।'

আধঘণ্টা পর কোপাকানা সাগরসৈকতের প্রশস্ত, টাইলস বাঁধানো এভিন্যুতে চলে এল ওরা। থামল আধুনিক প্রিন্সেস সুগারলোফ হোটেলের সামনে। ওদের লাগেজ নিয়ে গেল একজন। ওদেরকে নিয়ে আসা হল প্রকাণ্ড একটি সুইটে। এতে চার বেডরুম, সুন্দর একটি লিভিংরুম। একটি রান্নাঘর এবং উপকূলের দিকে মুখ ফেরানো টেরেস রয়েছে। সুইটে রুপোর ফুলদানিতে ফুল, শ্যাম্পেন, হুইস্কি আর চকোলেটের অভাব নেই। ম্যানেজার নিজে ওদের সুইটে নিয়ে গেল।

'আপনাদের কোনোকিছু দরকার হলে শুধু আওয়াজ দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজে চলে আসব।' বো করে চলে গেল সে।

'ওরা খুব বন্ধুবৎসল', বলল এলিজাবেথ।

হেসে উঠল রিজ। 'তা তো হবেই। কারণ তুমি এ হোটেলের মালিক।'

গালে রঙ ধরল এলিজাবেথের, 'ওহ্। আ-আমি জানতাম না।'

'খিদে পেয়েছে?'

'আ-না, ধন্যবাদ।' বলল এলিজাবেথ।

'ওয়াইন চলবে?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

নিজের কানেই তার কণ্ঠ আড়ষ্ট এবং অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে। এলিজাবেথ বুঝতে পারছে না কীরকম আচরণ তার করা উচিত কিংবা রিজের কাছ থেকে সে কী আশা করছে। হঠাৎ ওকে অচেনা লাগছে। এলিজাবেথ এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন। ওরা হোটেলের হানিমুন সুইটে আছে, রাত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই বিছানায় যাওয়ার সময় হবে।

এলিজাবেথ লক্ষ্য করছে রিজকে। শ্যাম্পেনের বোতল খুলছে। প্রতিটি কাজ এমন মসৃণভাবে আস্থার সঙ্গে করে যে মনে হয় এ মানুষটি জানে সে কী চায় এবং কীভাবে তা পেতে হবে। ও কী চায়?

শ্যাম্পেনের গ্লাস এলিজাবেথের হাতে ধরিয়ে দিল রিজ। নিজের গ্লাসটা ওর গ্লাসের গায়ে মৃদু ঠুকল। 'শুরুর জন্য।' বলল রিজ।

'শুরুর জন্য', প্রতিধ্বনি তুলল এলিজাবেথ। এবং শেষের জন্যও : মনে-মনে বলল ও কথাটা।

পান করতে লাগল ওরা।

ফোন বেজে উঠল। রিজ উঠে গিয়ে ফোন ধরল। ফিরে এল একটু বাদেই। এলিজাবেথকে বলল, 'রাত হচ্ছে। ঘুমাবে না?'

'যাব', দুর্বল গলা এলিজাবেথের। ঘুরল ও, চলল বেডরুমের দিকে। এখানে ওদের লাগেজ এনে রাখা হয়েছে। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড ডাবল বেড। বিছানা ঝেড়েটেড়ে রেখে গেছে এক মহিলা। সুটকেস খুলে এলিজাবেথের সিল্কের নাইটগাউন রেখেছে একপাশে, বিছানার অন্যপাশে পুরুষদের নীল পাজামা। একমুহূর্ত ইতস্তত করল এলিজাবেথ। তারপর কাপড় খুলতে লাগল। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় হেঁটে গেল ড্রেসিংরুমের বড় আয়নার সামনে। সাবধানে তুলল মেকআপ। মাথায় জড়াল টার্কিশ তোয়ালে। ঢুকল বাথরুমে। গোসল করল। গায়ে সাবান ঘষল। উষ্ণ সাবান পানি ওর দুই বুকের খাঁজ বেয়ে পেট হয়ে উরুসন্ধিতে নামল। যেন ভেজা আঙুলের আদর।

রিজের কথা মন থেকে জোর করে দূর করতে চাইল এলিজাবেথ। কিন্তু ওর কথাই মনে পড়ল বারবার। পনেরো বছর বয়স থেকে রিজের আদর পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে ওর শরীর। তীব্র খিদেয় অস্থির ও। শাওয়ার থেকে নামল এলিজাবেথ, নরম তোয়ালে দিয়ে মুছল গা, পাতলা সিল্কের নাইটগাউন পরল। আলগা হয়ে পড়ে থাকতে দিল কেশ, তারপর উঠে পড়ল বিছানায়। শুয়ে অপেক্ষা করছে। ভারছে এরপর কী ঘটবে, বিছানায় কেমন হবে রিজ। টের পেল পাঁজরের গায়ে ধড়াস ধড়াস বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। একটা শব্দ হল। মুখ তুলে চাইল এলিজাবেথ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রিজ। ফুল ড্রেসড।

'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।' বলল সে।

উঠে বসল এলিজাবেথ। 'কো-কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'ব্যবসায়িক একটা সমস্যার সমাধান করতে।' চলে গেল সে।

সারারাত জেগে থাকল এলিজাবেথ। ভাবল রিজের কথা। ভোররাতের দিকে ফিরল রিজ। ওর পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুমের ভান করল এলিজাবেথ। টের পেল বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করছে রিজ। ঘুরল সে। চলে গেল পাশের ঘরে।

এর কয়েক মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল এলিজাবেথ।

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল ওর। টেরেসে বসে নাস্তা করল ওরা। রিজকে হাসিখুশি, প্রাণবন্ত লাগছে। এলিজাবেথকে বলছে উৎসবের সময় কীভাবে এ-শহরের চেহারা পাল্টে যায়। কিন্তু কাল রাতে কোথায় গিয়েছিল সে-ব্যাপারে কিছু বলল না। এলিজাবেথও জানতে চাইল না।

রিওর বাইরে রোফ অ্যান্ড সন্সের ফ্যাক্টরিতে প্ল্যান্ট ম্যানেজার সিনর টুমাসের অফিসে বসে আছে রিজ এবং এলিজাবেথ। ম্যানেজার মধ্যবয়সী, ব্যাঙের মতো চেহারা, দরদর করে ঘামছে।

রিজকে বলছে সে, 'আপনি নিশ্চয় জানেন রোফ অ্যান্ড সন্স আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়। এটা আমার পরিবার। এখানে এলে মনে হয় বাড়িতেই আছি। আমি এখানেই থাকতে চাই।' ভুরুর ঘাম মুছল সে। 'কিন্তু অন্য একটি কোম্পানি থেকে এর চেয়ে ভালো অফার পেয়েছি আমি। আমার সংসারের কথাও ভাবতে হয়। আমার কথা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।'

রিজ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা, ম্যানেজারের সামনে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে রেখেছে। 'অবশ্যই রবার্টো আমি জানি এ কোম্পানি তোমার কাছে কী। অনেক বছর ধরে এখানে আছ তুমি। তবু মানুষকে তার পরিবার আর সংসার নিয়ে ভাবতে হয়।'

‘ধন্যবাদ’, কৃতজ্ঞ গলায় বলল রবার্টো। ‘আমি জানতাম আপনি আমার সমস্যা বুঝতে পারবেন।’

‘তোমার সঙ্গে আমাদের কী চুক্তি ছিল?’

কাঁধ ঝাঁকাল টুমাস। ‘স্রেফ একটুকরো কাগজ। ওটা আমরা ছিঁড়ে ফেলতে পারি, না? মানুষের মনেই যদি শান্তি না থাকে চাকরি করে কী হবে?’

সায় দিল রিজ। ‘এ ব্যাপারে কথা বলার জন্যই আমরা এখানে এসেছি, রবার্টো—তোমার মনে শান্তি আনার জন্য।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টুমাস। ‘কিন্তু হায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। অন্য কোম্পানিতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা।’

‘ওরা কি জানে তুমি জেলে যাচ্ছ?’ আলাপের সুরে প্রশ্ন করল রিজ।

চমকে গেল টুমাস। ‘জেলে?’

রিজ বলল, ‘মার্কিন সরকার তার দেশের বাইরে ব্যবসারত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে হুকুম দিয়েছে গত দশবছরে যেসব বিদেশীকে ঘুষ দেয়া হয়েছে তাদের একটা তালিকা করার জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ, রবার্টো। এখানে কয়েকটি আইন ভেঙেছ তুমি। তোমাকে আমরা পরিবারের একজন বিশ্বস্ত সদস্য হিসেবে এখানে এনেছিলাম প্রটেকশন দিতে। কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে আর থাকতে না চাইলে প্রটেকশনও পাবে না।’

রবার্টোর মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। ‘কি—কিন্তু আমি যা করেছি সবই কোম্পানির জন্য।’ প্রতিবাদ করল সে। ‘আমি শুধু আদেশ পালন করেছি মাত্র।’

সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রিজ। ‘অবশ্যই। এটা তুমি সরকারের কাছে আদালতে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে।’ সিধে হল ও। এলিজাবেথকে বলল, ‘চলো।’

‘এক মিনিট।’ চেঁচিয়ে উঠল রবার্টো। ‘আমাকে এরকম বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আপনারা এভাবে চলে যেতে পারেন না।’

রিজ বলল, ‘তুমি আসলে নিজেই জানো না কী বলছ। তুমিই বরং আমাদের ফেলে চলে যেতে চাইছ।’

টুমাস আবার ভুরুর ঘাম মুছল। দাঁত দিয়ে অনবরত ঠোঁট কামড়াচ্ছে। জানালার সামনে হেঁটে গেল সে। তাকাল বাইরে। অনেকক্ষণ পর এদিকে না-ঘুরেই সে বলল, ‘আমি যদি কোম্পানি ছেড়ে চলে না যাই—আমাকে প্রটেকশন দেয়া হবে?’

‘সর্বতোভাবে’, তাকে আশ্বস্ত করল রিজ।

মার্সিডিজে ওরা। সেই রোগাপাতলা শোফার গাড়ি চালাচ্ছে। ফিরে চলেছে শহরে। এলিজাবেথ ঘোষণার সুরে বলল, ‘তুমি লোকটাকে ব্ল্যাকমেইল করলে।’

মাথা দোলাল রিজ। 'ওকে আমরা হারাতে পারি না। সে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে যাচ্ছিল। আমাদের ব্যবসা সম্পর্কে প্রচুর জানে লোকটা। আমাদেরকে বিক্রি করে দিত।'

এলিজাবেথ রিজের দিকে তাকিয়ে ভাবল : ওর কাছ থেকে আমার এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি রয়ে গেছে।

সে রাতে ওরা মিরান্ডারে ডিনার করল। এলিজাবেথ ভাবল এবার হোটেলে ফিরবে। কিন্তু রিজ প্রস্তাব দিল, 'চলো, তোমাকে রিওর রাতের জীবন দেখাব।'

নাইটক্লাবে গেল ওরা। মনে হল রিজ সব চেনে। যেখানেই গেল আসরের মধ্যমণি হয়ে থাকল সে। এলিজাবেথ রিজের সঙ্গে একা থাকতে চাইলেও পারল না। প্রতিটি নাইটক্লাবে রিজের প্রচুর বন্ধুবান্ধব। সবাই ওর সঙ্গে কথা বলতে এল, কুশল বিনিময় করল।

চতুর্থ নাইটক্লাবেও রিজকে ঘিরে থাকল আধডজন বন্ধুবান্ধব। এলিজাবেথ ভাবল যথেষ্ট হয়েছে। রিজ এক স্প্যানিশ সুন্দরীর সঙ্গে কথা বলছে, এলিজাবেথ সরাসরি গিয়ে বলল, 'মাফ করবেন। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এখনও নাচার সুযোগ পাইনি। আমরা এখন নাচব।'

রিজ একঝলক তাকাল এলিজাবেথের দিকে, তারপর চেয়ার ছেড়ে সিধে হল। 'আমার বৌকে বোধ হয় একটু বেশিই অবহেলা করে ফেললাম', হালকা গলায় বলল সে অন্যদেরকে। এলিজাবেথের হাত ধরে নিয়ে এল ডান্স-ফ্লোরে। এলিজাবেথের শরীর শক্ত। রিজ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি রেগে আছ।'

ঠিকই ধরেছে রিজ। তবে এলিজাবেথের রাগটা রিজের ওপর নয়, নিজের ওপর। কারণ ও নিজেই এই আইন তৈরি করেছে। আর রিজ এ আইন ভাঙবে না বলে আপসেট হয়ে আছে এলিজাবেথ। রিজ কী ভাবছে জানে না এলিজাবেথ। বিয়ের চুক্তিটা কী সে সম্মান জানাতে মেনে চলছে নাকি এলিজাবেথের প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই? এলিজাবেথকে এ-প্রশ্নের জবাব জানতেই হবে।

রিজ বলল, 'দুঃখিত, লিজ। এরা আমাদের ব্যবসার স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কথা না-বললেই নয়।'

রিজ তাহলে এলিজাবেথের বেদনা বুঝতে পারছে। ওর শরীরের স্পর্শ পাচ্ছে সে নিজের শরীরে। রিজ কি জানে ওকে কীরকম কামনা করছে এলিজাবেথ?

চোখ বুজল ও। শরীর চেপে ধরল রিজের গায়ে। শুধু সংগীতের মূর্ছনা ছাড়া আর ওরা দুজন। রিজের বাহুতে বাঁধা পড়ে সারাজীবন সে এভাবে নাচতে পারবে। এলিজাবেথ টের পেল রিজের পৌরুষ ফুঁসে উঠেছে। ওর নরম উরুতে ধাক্কা

দিচ্ছে। চোখ খুলল এলিজাবেথ। রিজের চোখে এমন দৃষ্টি আগে কখনও দেখেনি ও। কথা বলল রিজ, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ, 'হোটেলে চলো।'

রিজ ওকে জড়িয়ে ধরে লিমুজিনে চড়ল। শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে এলিজাবেথের। আর তর সইছে না। ওকে পাঁজাকোলা করে বেডরুমে ঢুকল রিজ। ত্রস্ত হাতে কাপড় খুলতে গিয়ে ভুল হয়ে যাচ্ছে। নগ্ন হল ওরা। জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে। একে অপরকে আবিষ্কার করছে ওরা। এলিজাবেথ চুমু খেতে শুরু করল। ওর জিভ রিজের সমস্ত শরীরে আদর বোলাল। এরপর রিজ তার জিভ ব্যবহার করল। ঠোঁট, গাল, গলা, বুক, পেট, নাভি ছুঁয়ে উষ্ণ, খরখরে জিভ নেমে এল উরুসন্ধিতে। দুই পা ফাঁক করে ধরল। রসে ভিজে চপচপে এলিজাবেথের যোনি। জিভ ঢুকিয়ে সে রসের স্বাদ নিল রিজ। তীব্র সুখে, আনন্দে চিৎকার দিল এলিজাবেথ। এরপর ওর ওপর উঠে এল রিজ। এলিজাবেথ টের পেল লৌহকঠিন একটা মাংসখণ্ড ওর শরীরের ভেতরে ঢুকছে। একদম ভেতরে ঢুকে গেল ওটা। ছন্দোবদ্ধ গতিতে কোমর নাড়াচ্ছে রিজ। নিচ থেকে নিতম্ব তুলে সাড়া দিতে লাগল এলিজাবেথ। প্রথমে আস্তে তারপর দ্রুত হয়ে উঠল গতি। একটা সময় সবকিছু যেন চলে গেল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল অবশেষে। শান্ত হয়ে এল পৃথিবী। এবং স্থির।

পাশাপাশি শুয়ে থাকল ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রেখে। তৃপ্ত এবং সুখী এলিজাবেথ মনে-মনে বলল : *মিসেস রিজ উইলিয়ামস।*

বিয়াল্লিশ

'মাফ করবেন, মিসেস উইলিয়ামস', ইন্টারকমে ভেসে এল হেনরিয়েটের কণ্ঠ, 'ডিটেকটিভ হোরনাং আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। বলছেন খুব জরুরি।'

এলিজাবেথ রিজের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। ওরা গতকাল সন্ধ্যায় মাত্র রিও ডি জেনিরো থেকে জুরিখে ফিরেছে। অফিসে এসেছে কয়েক মিনিট আগে। ওদের হানিমুন চমৎকার হয়েছে। সমস্ত শঙ্কা আর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে রিওতে।

রিজ কাঁধ ঝাঁকাল, 'লোকটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। দেখি তো কী এমন জরুরি ব্যাপার।'

ম্যাক্স হোরনাং আসার পর এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন?'

খেজুরে আলাপ করতে আসেনি ম্যাক্স। সরাসরি বলল, 'কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে।' দেখল এলিজাবেথের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

রিজ বলল, 'এসব কী বলছেন!'

ম্যাক্স এলিজাবেথের দিকে তাকিয়েই আছে। 'ইতিমধ্যে দুবার আপনার জানের ওপর হামলা হয়েছে। সম্ভবত আরও হবে।'

কথা জড়িয়ে গেল এলিজাবেথের— 'আমি— আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন।'

'না, ম্যাম। লিফট ক্রাশ করা হয়েছিল আপনাকে হত্যা করার জন্য।' নীরবে বিস্ফারিত চোখে গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছে এলিজাবেথ। 'জিপটাও তাই।'

এলিজাবেথ বলল, 'আপনি ভুল করছেন। ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। জিপে কিছু করা হয়নি। সার্ডিনিয়ার পুলিশ ওটা পরীক্ষা করে দেখেছে।'

'না।'

'আমি ওদেরকে কাজটা করতে দেখেছি', গোঁ ধরে রইল এলিজাবেথ।

'না, ম্যাম। আপনি একটা জিপ পরীক্ষা করতে দেখেছেন। ওটা আপনার গাড়ি ছিল না।'

দুজনেই এখন অবাক-চোখে তাকিয়ে আছে ম্যাক্সের দিকে। গোয়েন্দা বলে চলল, 'আপনার গাড়ি ওই গ্যারেজে ছিলই না। আমি ওটাকে ওলবিয়ার একটা জাঙ্কইয়ার্ডে পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়েছি। মাস্টার সিলিন্ডার ধরে রাখা বোল্টটাকে আলগা করে রাখা হয়, ব্রেক ফ্লুইড ফেলে দেয়া হয়। এ-কারণে আপনার ব্রেক কাজ

করেনি। বামের ফ্রন্ট ফেন্ডার এখনও দোমড়ানো এবং গাছের ছাল লেগে আছে ওটার গায়ে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ওই গাড়িটাই আপনার।'

দুঃস্বপ্নটা ফিরে এল আবার। ওকে নাগপাশের মতো জড়িয়ে ধরল। পাহাড়ের দৃশ্যটা মনে পড়তে শিউরে উঠল গা।

রিজ বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না ...। কীভাবে একটা—'

ম্যাক্স ফিরল রিজের দিকে। 'সবগুলো জিপের চেহারাই একরকম। আর এ সুযোগটাই ওরা কাজে লাগিয়েছে। পাহাড় থেকে উনি পড়ে না-যাওয়ার কারণে ওদেরকে উপস্থিতবুদ্ধিতে কাজ সারতে হয়েছে। ওরা কাউকে জিপটি পরীক্ষা করে দেখতে দেয়নি। ওরা আশা করেছিল জিপটি সাগরের তলায় গিয়ে পড়ে থাকবে। ওরা মিস রোফকে ওখানেই হয়তো শেষ করে দিত, কিন্তু এক মেইনটেন্যান্স ক্রু হঠাৎ চলে আসায় পারেনি। ওই লোক মিস রোফকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওরা পুলিশ আসার আগে আরেকটা জিপ জোগাড় করে ওটাকে খানিকটা দুরমুজ করে নেয়।'

রিজ জিজ্ঞেস করল, "আপনি 'ওরা' বলছেন কেন?"

'যেই এটার সঙ্গে থাকুক তাকে অন্য কেউ সাহায্য করেছে।'

'কে—কে আমাকে খুন করতে চাইবে?' প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

'যে লোক আপনার বাবাকে খুন করেছে।'

এলিজাবেথের হঠাৎ মনে হল এসব অবাস্তব, কিছুই ঘটছে না। পুরোটাই একটা দুঃস্বপ্ন। চলে যাবে।

'আপনার বাবা খুন হয়েছেন।' বলে চলল ম্যাক্স। 'এক ছদ্মবেশী গাইড তাকে হত্যা করেছে। আপনার বাবা চ্যামনিক্সে একা যাননি। কেউ তার সঙ্গে ছিল।'

এলিজাবেথ যখন কথা বলল ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ, 'কে?'

ম্যাক্স তাকাল রিজের দিকে। 'আপনার স্বামী।'

শব্দগুলো প্রতিধ্বনি তুলল কানে। যেন অনেক দূর থেকে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। ভয় হল জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কি না।

'লিজ', বলল রিজ, 'স্যামের মৃত্যুর সময় আমি তার সঙ্গে ছিলাম না।'

'আপনি চ্যামনিক্সে তার সঙ্গে ছিলেন, মি. উইলিয়মস', বলল ম্যাক্স।

'তা ঠিক', এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলছে রিজ। 'তবে স্যাম পাহাড়ে চড়ার আগে আমি চলে আসি।'

ওর দিকে ঘুরল এলিজাবেথ। 'তুমি আমাকে বলোনি কেন?'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল রিজ যেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। 'আমি ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারিনি। গত বছর থেকে কেউ রোফ অ্যান্ড সন্সকে স্যাবোটাজ করছে। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে কাজটা করা হচ্ছে, যেন মনে হয় দুর্ঘটনা। তবে আমি একটা প্যাটার্ন দেখতে পাই। আমি স্যামের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিই তদন্তের জন্য বাইরের কোনো এজেন্সি ভাড়া করব।'

এলিজাবেথ জানে রিজ এরপর কী বলবে। একই সঙ্গে স্বস্তি এবং অপরাধবোধে জর্জরিত হল সে। রিজ রিপোর্ট সম্পর্কে পুরোটাই জানে। এলিজাবেথের উচিত ছিল নিজের মধ্যে ভয় চেপে না-রেখে ওকে বিশ্বাস করে সব কথা বলা।

ম্যাক্স হোরনাং-এর দিকে ফিরল রিজ, 'স্যাম রোফ একটা রিপোর্ট পান যাতে আমার সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। তিনি আমাকে তার সঙ্গে চ্যামনিক্সে যেতে অনুরোধ করেন। আমরা এসব ঘটনার জন্য কে দায়ী জানা না-পর্যন্ত ব্যাপারটা দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিই।' গলার স্বর কর্কশ শোনাল রিজের। 'তবে ওটা গোপন রাখা সম্ভব হয়নি। স্যাম খুন হয়ে যায়, কারণ কেউ জেনে গিয়েছিল আমরা তাকে ধরে ফেলব। রিপোর্টটা হারিয়ে গেছে।'

'আমার কাছে ওটা ছিল', বলল এলিজাবেথ। রিজ বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। এলিজাবেথ গোয়েন্দাকে বলল, 'রিপোর্টে ইঙ্গিত করছে রোফ অ্যান্ড সন্সের কেউ এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সবারই তো শেয়ার আছে কোম্পানিতে। তারা এটাকে ধ্বংস করতে চাইবে কেন?'

ব্যাখ্যা করল ম্যাক্স। 'তারা কোম্পানি ধ্বংস করতে চাইছে না, মিসেস উইলিয়ামস। তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে ব্যাংক উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের লোন ফেরত চাইতে শুরু করে। তারা আপনার বাবাকে চাপ দিয়েছিল স্টক বিক্রি করে কোম্পানি পাবলিকে রূপান্তর ঘটাতে। যেই এর পেছনে থাকুক সে যা চেয়েছে তা এখনও পায়নি। তাই আপনার জীবন বিপন্ন।'

'সেক্ষেত্রে ওর জন্য পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা করুন', বলল রিজ।

চোখ পিটপিট করল ম্যাক্স, ভাবলেশশূন্য গলায় বলল, 'এ নিয়ে আমি ভাবছি না মি. উইলিয়ামস। আপনাকে বিয়ে করার পর থেকে উনি আমাদের নজরবন্দির বাইরে নন। ওনাকে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ-পাহারায় রাখা হচ্ছে।'

তেতাল্লিশ

বার্লিন
সোমবার, ১ ডিসেম্বর
সকাল ১০টা

অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে। গত চার সপ্তাহ ধরে ব্যথাটা সয়ে আসছে সে। ডাক্তার কিছু বড়ি দিয়ে গেছেন। কিন্তু ভালথার গাসনার খেতে সাহস করেনি। সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হচ্ছে ওকে, অ্যানা আবার ওর ওপর হামলা চালিয়ে বসে কি না।

'আপনার সোজা হাসপাতালে যাওয়া উচিত, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে আপনার—' বলেছিলেন ডাক্তার।

'না।' বলেছে ভালথার। ছুরিকাঘাত থেকে সৃষ্ট ক্ষতের ঘটনার কথা পুলিশকে জানাতে হয়। এজন্যই ভালথার কোম্পানির ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছিল। জানত ডাক্তার এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবেন না। অন্তত এ-মুহূর্তে বাড়িতে পুলিশের আগমন ঘটুক চায় না ভালথার। ডাক্তার পিঠে হাঁ হয়ে থাকা ক্ষত নীরবে সেলাই করে দিয়েছেন। কাজ শেষে জানতে চেয়েছেন, 'বাড়িতে একজন নার্স পাঠিয়ে দেব, মি. গাসনার?'

'না। আমার— আমার স্ত্রীই সেবা করতে পারবে।'

এসব একমাস আগের ঘটনা। ভালথার তার সেক্রেটারিকে ফোন করে বলে দিয়েছে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং বাড়িতেই থাকবে।

সেই ভয়ংকর মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেল ভালথারের।

ঠিক সময়ে অ্যানার হাত ধরে ফেলেছিল সে। নইলে কাঁচির ফলা ওর কলজে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিত। তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারাবার মতো দশা হয়েছিল ভালথারের। তবু অ্যানাকে টেনেহিঁচড়ে তার বেডরুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দিতে পেরেছে। সারাক্ষণ চিৎকার করছিল অ্যানা, 'তুমি আমার বাচ্চাদের কী করেছ?'

ভালথার অ্যানাকে বেডরুমে আটকে রাখার পর থেকে নিজেই রান্না করে। খাবারের ট্রে নিয়ে তালা খুলে ঢোকে অ্যানার ঘরে। এককোণে গুটিশুটি মেরে থাকা অ্যানা ফিসফিস করে বলে, 'তুমি আমার বাচ্চাদের কী করেছ?'

দোতলার মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে ফ্রাউ মেন্ডলার। দিনের বেলা কাজে আসে সে। এ বাড়িতে এ নিয়ে দ্বিতীয় দিন এল। এখানে কাজ করতে ভালো লাগে না তার। গত বুধবার সে মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে, হের গাসনার সারাক্ষণ ওকে চোখে চোখে রেখেছে। যেন মেন্ডলার কিছু চুরি করবে। দোতলার ঘর ঝাঁট দিতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিল সে, বাধা দিয়েছে গাসনার। তার মজুরি চুকিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। ভীত প্রাণীর মতো আচরণ করছিল সে।

আজ লোকটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বাড়িটি অস্বাভাবিক নীরব। সে কয়েকটা বেডরুম ঝাঁট দিল। কিন্তু একটা বেডরুমের দরজা ধাক্কা মেরে দেখল ভেতর থেকে বন্ধ। আবার হাতল ঘোরাল ও। ভেতর থেকে ফিসফিস করল একটা নারী কণ্ঠ, 'কে?'

ফ্রাউ মেন্ডলার ঝাঁকি খেয়ে নব থেকে সরিয়ে আনল হাত।

'কে ওখানে?'

'আমি মেন্ডলার। আপনাদের কাজের বুয়া। আপনার বেডরুম পরিষ্কার করব?'

'পারবে না। আমাকে এখানে আটকে রেখেছে।' কণ্ঠটা এখন উচ্চকিত, মৃগীরোগীর মতো। 'বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও, প্লিজ। পুলিশে খবর দাও। বলো আমার স্বামী আমার বাচ্চাদেরকে খুন করেছে। ও আমাকেও খুন করবে। জলদি। ও এখানে চলে আসার আগেই ভেগে যাও।'

একটা হাত সবেগে ঘুরিয়ে দিল ফ্রাউ মেন্ডলারকে। তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে হের গাসনার। মরা মানুষের মতো সাদা মুখ।

'এখানে ঘুরঘুর করছ কেন?' গর্জে উঠল সে। জোরে চেপে ধরে রাখায় হাতে খুব লাগছে মেন্ডলারের।

'আ-আমি ঘুরঘুর করছি না।' বলল সে। 'আজ আমার ঘর পরিষ্কার করার দিন। আমার এজেন্সি—'

'আমি এজেন্সিকে বলে দিয়েছি আমার কাউকে লাগবে না।'

ও কি এজেন্সিকে সত্যি ফোন করেছিল? করার কথা ছিল কিন্তু অসুস্থতার জন্য সম্ভবত ফোন করা হয়নি। ফ্রাউ মেন্ডলার গাসনারকে দেখছে। তার চোখের দৃষ্টি ভয় পাইয়ে দিল ওকে।

গাসনার বলল, 'এখান থেকে চলে যাও। আর কখনও আসবে না।'

জুরিখে ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাং ইন্টারপোলের সদর দপ্তর থেকে পাঠানো টেলিটাইপ পড়ছে। ওতে লেখা : রোফ অ্যান্ড সন্সের হয়ে স্নাফ ফিল্মের স্টক যে কিনেছিল সে আর কোম্পানির সঙ্গে নেই। তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। পেলে জানানো হবে।

প্যারিসে পুলিশ সিন নদী থেকে উনিশ-কুড়ি বয়সের এক স্বর্ণকেশীর নগ্ন লাশ উদ্ধার করল। তার গলায় লাল একটি রিবন বাঁধা।

জুরিখে এলিজাবেথ উইলিয়ামসের জন্য চব্বিশঘণ্টা পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হল।

চুয়াল্লিশ

সাদা আলো জ্বলে উঠল। রিজের প্রাইভেট লাইনের সংকেত। মাত্র চার-পাঁচজন ওর এ নাম্বারটা জানে। ফোন তুলল রিজ। 'হ্যালো।'

'গুড মর্নিং ডার্লিং', খসখসে একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'আমাকে ডার্লিং বলবে না।'

হেসে উঠল নারী। 'তুমি নিশ্চয় বলবে না এলিজাবেথ ইতিমধ্যে তোমাকে পোষা ঘোড়া বানিয়ে দিয়েছে!'

'তুমি কী চাও?' জিজ্ঞেস করল রিজ।

'আজ বিকেলে তোমাকে দেখতে চাই।'

'সম্ভব না।'

'আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়ো না, রিজ। আমি কি জুরিখে আসব নাকি–?'

'না। আমি চাই না তুমি এখানে আসো।' ইতস্তত করল ও। 'আমিই তোমার ওখানে যাচ্ছি।'

'তা-ই ভালো। আমাদের সেই আগের জায়গা, শেরি।'

ফোন রেখে দিল হেলেন রোফ-মার্টেল।

রিজ আস্তে নামিয়ে রাখল রিসিভার। ভাবছে। হেলেনের সঙ্গে ওর দৈহিক সম্পর্ক আছে। সেক্সি মেয়েদেরকে বিছানায় নিয়ে যেতে আপত্তি নেই রিজের। কিন্তু একবারই যথেষ্ট। অথচ হেলেনকে সহজে সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রচণ্ড কামুকী সে। চার্লসের সঙ্গ তার আর ভালো লাগছে না। রিজকে এখন তার চাই। বিয়ের আগে যা হয়েছে হয়েছে। এখন আর ওসবের মধ্যে থাকতে চায় না রিজ। হেলেনকে এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে। আর এজন্যই প্যারিসে যাওয়াটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হলেও ওকে যেতে হবে।

এলিজাবেথের অফিসে ঢুকল রিজ। তাকে দেখে উজ্জ্বল হল এলিজাবেথের চেহারা। ওকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার কথাই ভাবছিলাম। চলো বাড়ি যাই। খেলব।'

মুচকি হাসল রিজ। 'তুমি দিন দিন সেক্স ম্যানিয়াক হয়ে উঠছ।'

ওকে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরল এলিজাবেথ। 'জানি। সেক্স ম্যানিয়াক হওয়া দারুণ, না?'

'কিন্তু আমার বিকেলে কাজ আছে লিজ, প্যারিসে যেতে হবে।'

হতাশা গোপন করার চেষ্টা করল এলিজাবেথ। 'তোমার সঙ্গে যাই?'

'দরকার নেই। এটা সামান্য একটা ব্যবসায়িক সমস্যা। আমি রাতের মধ্যেই ফিরে আসব। একসঙ্গে গভীর রাতে সাপার খাব।'

লেফট ব্যাঙ্কের পরিচিত ছোট একটা হোটেলে ঢুকল রিজ। ডাইনিংরুমে ওর জন্য অপেক্ষা করছে হেলেন। ওকে কখনও দেরি করে আসতে দেখেনি রিজ। মহিলা সুসংগঠিত, দক্ষ, অপূর্ব রূপসী, বুদ্ধিমতী এবং দুর্দান্ত খেলুড়ে। কিন্তু ওর মধ্যে আবেগ বলে কিছু নেই। আছে নিষ্ঠুরতা। তার নিষ্ঠুরতা শিকার হতে অনেককেই দেখেছে রিজ। নিজের শিকার হওয়ার কোনো খায়েশ নেই।

হেলেন বলল, 'তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে, ডার্লিং। বিয়ে করে চেহারা আরও খুলেছে। এলিজাবেথ বিছানায় তোমার ঠিকমতো যত্ন নেয় তো?'

হাসল রিজ। 'এটা তোমার দেখার বিষয় নয়।'

এগিয়ে এল হেলেন, ওর হাত ধরল। 'এটা অবশ্যই আমাদের বিষয়, শেরি।'

হাত নিয়ে খেলা শুরু করে দিল হেলেন। ওর সঙ্গে বিছানার স্মৃতি মনে পড়ে গেল রিজের। বাঘিনী একটা। বুনো, দক্ষ এবং কোনোভাবেই যাকে তৃপ্ত করা যায় না। হাত টেনে নিল রিজ।

শীতল দেখাল হেলেনের চাউনি। বলল, 'বলো তো, রিজ, রোফ অ্যান্ড সন্সের প্রেসিডেন্ট হতে কেমন লাগবে?'

রিজ ভুলেই গিয়েছিল এ নারী কী প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং লোভী। হেলেন কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। একবার বলেছিল, 'তুমি আর আমি, রিজ। স্যাম নামের পথের কাঁটাটা দূর হলে আমরা দুজনে মিলে কোম্পানি চালাতে পারব।'

এমনকি প্রেম করার সময়ও অনর্গল বকে যেত হেলেন, 'এটা আমার কোম্পানি, ডার্লিং। স্যামুয়েল রোফের রক্ত বইছে আমার শরীরে। এটা আমার। আমি এটা চাই।' তারপর শীৎকার দিয়ে উঠত, 'ফাক মি, রিজ।'

ক্ষমতার কথা শুনলেই কামোত্তেজিত হয়ে ওঠে হেলেন।

'তুমি আমাকে ডেকেছ কেন?' জানতে চাইল রিজ।

'তোমাকে নিয়ে একটা প্ল্যান করার সময় এসেছে।'

'কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না।'

ক্রূর হাসল হেলেন। 'তোমাকে আমি খুব ভালো করে চিনি, ডার্লিং। তুমি আমার মতোই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তুমি এতদিন ধরে স্যামের ছায়া হয়ে থেকেছ কেন যখন কয়েক ডজন কোম্পানি থেকে তোমার জন্য লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে? কারণ তুমি জানো একদিন তুমি রোফ অ্যান্ড সন্সের মালিক হবে।'

'স্যামকে পছন্দ করতাম বলে তার সঙ্গে থাকতাম।'

খিকখিক হাসল হেলেন। 'অবশ্যই শেরি। এখন তুমি তার ছোট্ট, সুন্দরী মেয়েটাকে বিয়ে করেছ।' পার্স থেকে একশলা কালো সিগার বের করে প্লাটিনাম লাইটারে জ্বেলে নিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'চার্লস বলল এলিজাবেথ স্টক নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। বিক্রি করবে না।'

'ঠিকই শুনেছ, হেলেন।'

'ব্যাপারটা অবশ্য তোমার ওপর নির্ভর করে। ওর যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তুমি ওর জায়গায় বসতে পারবে।'

রিজ দীর্ঘক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে থাকল হেলেনের দিকে।

পঁয়তাল্লিশ

ওলগিয়াটার বাড়িতে ইভো পালাজ্জি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করতে গিয়ে ভয়ংকর একটা দৃশ্য দেখে ফেলল। ড্রাইভওয়ে দিয়ে ডোনাটেলা তার তিন ছেলেকে নিয়ে আসছে। সিমোনেটা দোতলায়, ভাতঘুম দিচ্ছে। দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে এল ইভো, চলল তার দ্বিতীয় পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এমন রাগ উঠেছে মাথায় যে ডোনাটেলাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এই মহিলার প্রতি কত সদয় ছিল সে। অথচ এখন সে তার ক্যারিয়ার, সংসার এবং জীবন ধ্বংস করে দিতে চাইছে। এর আগে সিমোনেটা আর তিন মেয়েকে নিয়ে রোম থেকে কয়েক মাইল দূরের ভিলা ডিস্তে নামের জায়গায় পিকনিক করতে গিয়ে আরেকটু হলে ধরা খাচ্ছিল ইভো। কে জানত একই সময় ডোনাটেলাও তার বাচ্চাদের নিয়ে ওখানে হাজির হবে? অল্পের জন্য সেবার বেঁচে গেছে ইভো। একরকম পালিয়েই এসেছে ওখান থেকে। পিকনিক মাথায় উঠেছে। আর আজ ডোনাটেলাকে ল্যান্সিয়া ক্লাভিয়া থেকে নামতে দেখে আতঙ্কে জমে গেল সে। গাড়িটা ইভোই ডোনাটেলাকে কিনে দিয়েছে। মায়ের সঙ্গে ছেলেরাও নামল গাড়ি থেকে। বাপকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। ইভো মনে-মনে প্রার্থনা করল সিমোনেটা যেন ঘুম থেকে জেগে না ওঠে।

'আমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি', কঠিন গলায় বলল ডোনাটেলা। ছেলেদের দিকে ফিরল, 'চলো, বাচ্চারা।'

'না', আদেশ দিল ইভো।

'তুমি আমাকে ঠেকাবে কী করে? আজ দেখা করতে না পারলে কাল করব।'

কোণঠাসা হয়ে পড়ল ইভো। কোনও উপায় নেই। কিন্তু এতদিনের তিলতিল করে গড়ে-তোলা ক্যারিয়ার কাউকে ধ্বংস করতে দেবে না সে। নিজেকে সে ভদ্রলোক বলে মনে করে। কিন্তু সে যা করতে চাইছে মন সায় না দিলেও করতে হবে সিমোনেটা, ডোনাটেলা এবং তাদের সন্তানদের জন্য।

'তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে', প্রতিশ্রুতি দিল ইভো। 'আমাকে আর পাঁচটা দিন সময় দাও।'

ডোনাটেলা তার চোখে চোখ রাখল। 'পাঁচদিন।' বলল সে।

লন্ডনে হাউস অব কমন্সে গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিবেটে সাফল্যের সঙ্গে অংশ নিয়ে প্রচুর হাততালি পেয়ে খুশিমনে নিজের আসনে ফিরে আসছেন স্যার অ্যালেক নিকলস। এক অ্যাটেনডেন্ট এসে বলল, 'আপনার জন্য একটা খবর আছে, স্যার অ্যালেক।'

ঘুরলেন অ্যালেক, 'বলো?'

'জলদি বাসায় যান, স্যার। আপনার বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

অ্যালেক বাসায় পৌঁছে দেখলেন ওরা ভিভিয়ানকে ধরাধরি করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছে। ডাক্তার সঙ্গে আছেন। অ্যালেক নিজের গাড়ি থামার আগেই দরজা খুলে একছুটে বেরিয়ে এলেন। ভিভিয়ানের সাদা, অচেতন চেহারা একবার দেখে নিয়ে ফিরলেন ডাক্তারের দিকে। 'কী হয়েছে?'

ডাক্তার অসহায় ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'আমি জানি না, স্যার অ্যালেক। একজন ফোন করে বলল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি এখানে এসে দেখি লেডি নিকলস বেডরুমের মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর— তাঁর হাঁটু মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে গাঁথা।'

চোখ বুজলেন অ্যালেক। টের পেলেন বমি ঠেলে আসছে গলায়। অনেক কষ্টে ঠেকালেন।

'আমরা আমাদের পক্ষে যদ্দূর সম্ভব করব। তবে আপনার মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার। উনি আর হাঁটতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

দম বন্ধ হয়ে এল অ্যালেকের। পা বাড়ালেন অ্যাম্বুলেন্সের দিকে।

'ওনাকে হেভি সিডেশন দেয়া হয়েছে।' বললেন ডাক্তার। 'আপনাকে বোধহয় চিনতে পারবেন না।'

অ্যালেকের কানে যায়নি ডাক্তারের কথা। অ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়লেন তিনি বসলেন জাম্প সিটে। তাকালেন স্ত্রীর দিকে। টের পেলেন না পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কানে ঢুকল না সাইরেনের শব্দ, বুঝতে পারলেন না চলা শুরু করেছে অ্যাম্বুলেন্স। ভিভিয়ানের ঠাণ্ডা হাত ধরলেন তিনি।

চোখ খুলে গেল তার। 'অ্যালেক', ঘরঘরে গলা ভিভিয়ানেব।

অ্যালেকের চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। 'ওহ্, ডার্লিং আমার ডার্লিং...'

'দুজন লোক... মুখোশ পরা... আমাকে চেপে ধরল... আমার পা ভেঙে ফেলল... আমি আর নাচতে পারব না... আমি পঙ্গু হয়ে যাব; অ্যালেক... তারপরও কি তুমি আমাকে চাইবে?'

ভিভিয়ানের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন অ্যালেক। হতাশা এবং বেদনার অশ্রু ছাড়াও ওতে মিশে আছে অন্যরকম এক অনুভূতি, যে অনুভূতির কথা নিজের

কাছেও স্বীকার করার সাহস নেই তাঁর। একধরনের স্বস্তিবোধ করছেন তিনি। ভিভিয়ান পঙ্গু হয়ে গেলে তিনি ওর যত্ন নিতে পারবেন। ও আর কারও জন্য অ্যালেককে ছেড়ে যেতে পারবে না।

কিন্তু অ্যালেক জানেন ঘটনার শেষ এখানেই নয়।

তার সঙ্গে ওদের বোঝাপড়া আরও বাকি রয়ে গেছে। ওদের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে ওরা যা চাইছে তা দিয়ে দিতে হবে।

জলদি।

ছেচল্লিশ

ঠিক দুপুরবেলায় জুরিখের ক্রিমিনালপোলিজেই সদর দপ্তরে ফোনটা এল। ফোনে কথা বললেন চিফ ইন্সপেক্টর স্কিমড। ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাংকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'কাজ শেষ', বললেন তিনি ম্যাক্সকে। 'রোফ কেসের সমাধান হয়ে গেছে। ওরা খুনির খোঁজ পেয়েছে। এয়ারপোর্টে যাও। এখনই রওনা হলে প্লেনটা ধরতে পারবে।'

চোখ পিটপিট করল ম্যাক্স, 'আমি কোথায় যাচ্ছি?'

'বার্লিন।'

চিফ ইন্সপেক্টর স্কিমড এলিজাবেথ উইলিয়ামসকে ফোন করলেন।

'আপনাকে একটা ভালো খবর দেয়ার জন্য ফোন করলাম', বললেন তিনি। 'আপনার আর বডিগার্ডের দরকার হবে না। খুনি ধরা পড়েছে।'

শক্ত মুঠোতে ফোন চেপে ধরল এলিজাবেথ। অবশেষে ওর অকুতোভয় শত্রুর পরিচয় জানতে পারবে সে। কে সে?

'ভালথার গাসনার।'

অটোভ্যানে চড়ে ওয়ানসি অভিমুখে ছুটে চলেছে ওরা। পেছনের আসনে ম্যাক্স, তার পাশে মেজর ওয়েজম্যান এবং সামনের সিটে দুজন গোয়েন্দা। তারা টেম্পলহফ এয়ারপোর্ট থেকে ম্যাক্সকে নিয়ে এসেছে। গাড়ি চালাতে চালাতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল মেজর। 'ভালথার গাসনারের বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তবু আমাদের সাবধান থাকতে হবে। সে তার স্ত্রীকে জিম্মি করে রেখেছে।'

ম্যাক্স জিজ্ঞেস করল, 'ভালথার গাসনারকে খুনি বলে সন্দেহ হল কীভাবে?'

'আপনার কারণে। এজন্য আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি।'

বিস্মিত দেখাল ম্যাক্সকে। 'আমার কারণে?'

'আপনি এক সাইকিয়াট্রিস্টের কথা বলেছিলেন যার সঙ্গে ভালথারকে কথা বলতে দেখা গেছে। আমার কেমন সন্দেহ জাগল। গাসনারের চেহারার বর্ণনা পাঠালাম অন্যান্য মনো-চিকিৎসকদের কাছে। দেখলাম সে কমপক্ষে আধডজন

সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সাহায্যের জন্য গেছে। প্রতিবারই নাম পাল্টেছে। সে জানে সে কতটা অসুস্থ। কিছুদিন আগে তার স্ত্রী আমাদের কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন করেছিল। কিন্তু আমাদের এক লোক তদন্তে গেলে ভদ্রমহিলা তাকে ফিরিয়ে দেয়।'

মোড় ঘুরছে অটোভ্যান, ভালথার গাসনারের বাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। 'আজ সকালে মেন্ডলার নামে এক ঠিকে ঝির ফোন পাই আমরা। সে প্রতি সোমবার ভালথারের বাড়ি যায় ঘরদোর পরিষ্কার করতে। ওইদিনও গিয়েছিল। মিসেস গাসনারকে তার স্বামী বেডরুমে তালা মেরে রেখেছে। মেন্ডলার বন্ধ-দরজার ওপাশ দিয়ে কথা বলে মিসেস গাসনারের সঙ্গে। মিসেস গাসনার তাকে জানায় তার স্বামী তার দুই সন্তানকে হত্যা করেছে এবং তাকেও খুন করবে।'

চোখ পিটপিট করল ম্যাক্স। 'এ ঘটনা সোমবার ঘটেছে? আর আজ সকালে মহিলা আপনাকে ফোন করল?'

'ফ্রাউ মেন্ডলারের বিরুদ্ধে পুলিশের লম্বা রেকর্ড আছে। সে আমাদের কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিল। গতরাতে মহিলা তার বয়ফ্রেন্ডকে ঘটনা খুলে বলার পরে দুজনে মিলে আমাদেরকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নেয়।'

ওয়ানসিতে চলে এসেছে ওরা। গাসনার এস্টেট থেকে এক ব্লক দূরে একটি গাড়ির পেছনে। নিজেদের গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। জোর কদমে চলে এল মেজর ওয়েজম্যান এবং ম্যাক্সের সামনে। 'সে এখনও ঘরের মধ্যে আছে, মেজর। আমাদের লোক চারদিক ঘিরে রেখেছে।'

'ভদ্রমহিলা বেঁচে আছেন কি না জানো?'

ইতস্তত করল লোকটা। 'না, স্যার। সবগুলো জানালা বন্ধ।'

'ঠিক আছে। দ্রুত এবং নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে-যার জায়গায় চলে যাও।'

দ্রুত চলে গেল লোকটা। মেজর ওয়েজম্যান গাড়ি থেকে ছোট একটি ওয়াকিটকি বের করল। একটানা অর্ডার দিয়ে যেতে লাগল। ম্যাক্স শুনছে না। সে মেজর ওয়েজম্যানের কথাগুলো নিয়ে ভাবছে। একটি ব্যাপার ঠিক তার মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু মেজরকে জিজ্ঞেস করার এখন সময় নেই। লোকজন বাড়িটির দিকে এগুতে শুরু করেছে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়াল রেখে। মেজর ওয়েজম্যান ঘুরল ম্যাক্সের দিকে, 'আসছেন, হোরনাং?'

ম্যাক্সের মনে হল একদল সেনাবাহিনী বাগানে অনুপ্রবেশ করছে। এদের কারও কারও হাতে টেলিস্কোপ রাইফেল, পরনে আর্মারড ভেস্ট; অন্যদের হাতে ভোঁতা নাকের টিয়ার গ্যাস রাইফেল। মেজর ওয়েজম্যানের নির্দেশ পেয়ে টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড ছুড়ে মারা হল বাড়ির নিচের আর ওপরতলার জানালা লক্ষ্য করে। একই সময় গ্যাস-মুখোশ-পরা কয়েকজন সামনে এবং পেছনের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল। তাদের পেছন পেছন বন্দুক হাতে এল আরও কয়েকজন গোয়েন্দা।

ম্যাক্স আর মেজর ওয়েজম্যান একছুটে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। হলঘর কটুগন্ধ ধোঁয়ায় ভর্তি, তবে খোলা জানালা এবং দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়েও যাচ্ছে। দুই গোয়েন্দা হ্যান্ডকাফ-পরা ভালথারকে হলওয়েতে নিয়ে এল। তার পরনে রোব এবং পাজামা, শুকনো মুখে না-কামানো দাড়ি। চোখ ফোলা।

ভালথারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ম্যাক্স। এই প্রথম ওকে দেখছে।

মেজর ওয়েজম্যান বলল, 'আপনাকে গ্রেফতার করা হল, হের গাসনার। আপনার স্ত্রী কোথায়?'

ভালথার গাসনার কর্কশ গলায় বলল, 'সে এখানে নেই। সে চলে গেছে। আমি—'

ওপরতলায় দরজা ভাঙার শব্দ হল। একমুহূর্ত পর এক গোয়েন্দার গলা ভেসে এল, 'ওনাকে আমি পেয়েছি। ঘরে বন্দি ছিলেন।'

সিঁড়ির গোড়ায় অ্যানা গাসনারকে নিয়ে হাজির হল গোয়েন্দা। থরথর করে কাঁপছে সে, চুলগুলো আলুথালু, মুখে খামচির দাগ। ফোঁপাচ্ছে।

'ওহ্ থ্যাংক গড', বলল অ্যানা। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনারা এসে পড়েছেন।'

অ্যানাকে নিয়ে গোয়েন্দা নেমে এল নিচতলায়। স্বামীকে দেখে চিৎকার করে উঠল অ্যানা।

'সব ঠিক আছে, ফ্রাউ গাসনার।' নরম গলায় বলল মেজর। ও আপনার আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

'আমার বাচ্চারা', কাঁদছে অ্যানা। 'ও আমার বাচ্চাদের খুন করেছে।'

ম্যাক্স ভালথার গাসনারকে দেখছে। অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর দিকে। একদম ভেঙে পড়েছে লোকটা।

'অ্যানা, ওহ্ অ্যানা।' ফিসফিস করল ভালথার।

মেজর ওয়েজম্যান বলল, 'আপনি কথা না-বললেও পারেন অথবা একজন ল-ইয়ার নিয়োগ করতে পারেন। তবে আপনার ভালোর জন্যই আশা করি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন।'

ভালথার শুনছে না। 'তুমি পুলিশে খবর দিতে গেলে কেন, অ্যানা?' কাতর আর্তি ওর গলায়। 'কেন? আমরা দুজনে কি সুখী ছিলাম না?'

'বাচ্চারা মরে গেছে', আর্তনাদ করল অ্যানা। 'ওরা মরে গেছে।'

মেজর ওয়েজম্যান ভালথারের দিকে তাকাল, 'কথাটা কি সত্য?'

মাথা ঝাঁকাল ভালথার। পরাজিত লাগছে ওকে। 'হ্যাঁ.... ওরা মরে গেছে।'

'খুনি খুনি।' হিস্টিরিয়া রোগীর মতো আচরণ অ্যানার।

মেজর জিজ্ঞেস করল, 'লাশগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, দেখাবেন?'

ভালথার কাঁদছে, গাল বেয়ে জল পড়ছে। কথা বলতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল ওয়েজম্যান। 'কোথায় তারা?'

জবাব দিল ম্যাক্স, 'বাচ্চাদেরকে সেন্ট পলের গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে।'

ঘরের সবাই তাকাল তার দিকে। 'ওরা পাঁচবছর আগে, জন্মের সময় মারা যায়।'

'খুনি।' স্বামীকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল অ্যানা।

ওরা ঘুরল। দেখল উন্মাদের দৃষ্টি ঝিকিয়ে উঠেছে অ্যানার চোখে।

সাতচল্লিশ

সংক্ষিপ্ত গোধূলি মুছে দিয়ে ঝপ করে নেমে এল ঠাণ্ডা শীতের রাত। তুষার পড়ছে, বাতাসে ভেসে আসা মিহি তুষারকণায় ঢাকা পড়ছে নগরী। রোফ অ্যান্ড সন্সের নির্জন প্রশাসনিক ভবনের আলো-আঁধারে ম্লান হলদে চাঁদের আলোর মতো জ্বলছে।

অফিসে এলিজাবেথ একা। অপেক্ষা করছে রিজের জন্য। জেনেভা থেকে বৈঠক শেষ করে ফেরার কথা ওর। এলিজাবেথ মনে-মনে প্রার্থনা করল তাড়াতাড়ি যেন চলে আসে রিজ। ভবনের সবাই চলে গেছে। কাজে মন দিতে পারছে না। অস্থির লাগছে। ভালথারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ছে। ছেলেমানুষি চেহারার মানুষটা পাগল ছিল অ্যানার জন্য। হয়তো ভালোবাসার ভান করেছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এসব ভয়ংকর ঘটনার জন্য ভালথার দায়ী। অ্যানার কথা মনে পড়ল এলিজাবেথের। এলিজাবেথ বহুবার ফোন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কথা বলতে পারেনি। বার্লিনে যাবে এলিজাবেথ অ্যানাকে সান্ত্বনা দিতে।

এলিজাবেথকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলল ও। অ্যালেক। তার কণ্ঠ শুনে খুশি হল এলিজাবেথ।

'ভালথারের কথা শুনেছ?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যালেক।

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভয়ংকর। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'বিশ্বাস কোরো না, এলিজাবেথ।'

বুঝতে পারল না এলিজাবেথ। 'কী?'

'বলছি বিশ্বাস কোরো না। ভালথার নির্দোষ।'

'পুলিশ বলেছে—'

'ওরা ভুল করেছে। স্যাম আর আমি ভালথারকে প্রথমে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু ওর কোনো ত্রুটি খুঁজে পাইনি। আমরা যাকে খুঁজছি সে ও নয়।'

এলিজাবেথ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফোনের দিকে, উল্টোপাল্টা লাগছে সব। *আমরা যাকে খুঁজছি সে ও নয়।* ও বলল, 'আ-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছ।'

ইতস্তত গলায় বললেন অ্যালেক, 'এসব কথা ফোনে বলা ঠিক হচ্ছে না এলিজাবেথ। কিন্তু তোমার সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ পাইনি আমি।'

'কী নিয়ে কথা বলতে চেয়েছ?' জানতে চাইল এলিজাবেথ।

'গত বছর থেকে', বললেন অ্যালেক। 'কেউ কোম্পানিকে স্যাবোটাজ করছে। দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের একটা কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে, পেটেন্ট চুরি হয়ে যায়, বিপজ্জনক ওষুধে ভুল লেবেল লাগানো হয়। এখন সব কথা বলার সময় নেই। আমি স্যামকে বলেছিলাম বাইরের কোনো এজেন্সি ভাড়া করে দেখার জন্য এর পেছনে কে আছে। কারও সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব না ঠিক করেছিলাম দুজনে।'

পৃথিবী আর সময় যেন হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। অ্যালেকের কণ্ঠ শুনছে ও ফোনে কিন্তু মনে হচ্ছে রিজ যেন কথা বলছে। *গত বছর থেকে কেউ রোফ অ্যান্ড সন্সকে স্যাবোটাজ করছে। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে কাজটা করা হয়, যেন মনে হয় এগুলো দুর্ঘটনা। তবে আমি একটা প্যাটার্ন দেখতে পাই। আমি স্যামের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিই তদন্তের জন্য বাইরের কোনো এজেন্সি ভাড়া করব।*

অ্যালেক বলে চলেছেন, 'ওরা ওদের রিপোর্ট শেষ করে। স্যাম রিপোর্ট নিয়ে চ্যামনিক্সে যায়। আমরা বিষয়টি নিয়ে ফোনে কথা বলি।'

এলিজাবেথ রিজের গলা শুনতে পেল। *স্যাম বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে তার সঙ্গে চ্যামনিক্সে যেতে অনুরোধ করেন.... আমরা এসব ঘটনার জন্য কে দায়ী না জানা পর্যন্ত ব্যাপারটা দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিই।*

বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এলিজাবেথের। কথা বলার সময় কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। 'অ্যালেক, তুমি আর বাবা ছাড়া আর— আর কে জানত রিপোর্টের ব্যাপারে?'

'কেউ না। স্যাম বলত যে-ই অপরাধী হোক সে কোম্পানির খুব উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা।'

উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা! আর রিজ বলেনি সে বাবার সঙ্গে চ্যামনিক্সে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে শব্দগুলো বেরিয়ে এল এলিজাবেথের গলা থেকে,

'বাবা কি রিজকে এসব বলেছিলেন?'

'না। কেন?' *একমাত্র রিজই জানে রিপোর্টে কী ছিল। সে ওটা চুরি করেছে। আর চ্যামনিক্সে যাওয়ার তার একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে— স্যামকে হত্যা করার জন্য।'*

অ্যালেক কী বলছেন মাথায় ঢুকছে না এলিজাবেথের। কানের মধ্যে যেন বজ্রপাত হচ্ছে। রিসিভারটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল, মাথা ঘুরছে বনবন করে। জিপ অ্যাক্সিডেন্টের আগে রিজকে সে ম্যাসেজ পাঠিয়েছিল সার্ডিনিয়া যাচ্ছে। লিফট ক্রাশের দিন রিজ বোর্ড মিটিঙে হাজির ছিল না। কিন্তু রিজ আর কেট যখন অফিসে

একা, সে চলে এসেছিল কাজ করার অজুহাতে। কিছুক্ষণ পরে সে চলে যায়। সত্যি কি চলে গিয়েছিল? এলিজাবেথের গা কাঁপতে শুরু করেছে। কোথাও ভয়ানক কোনো ভুল হয়ে গেছে। রিজ নয়। না। ওর মন বলছে।

ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এলিজাবেথ, কাঁপা পদক্ষেপে ঢুকল রিজের অফিসে। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালল এলিজাবেথ। চারদিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চোখ বুলাল, কী দেখতে চায় জানে না। রিজের অপরাধের প্রমাণ খুঁজছে না সে, ওকে নিরপরাধ প্রমাণের তথ্য সন্ধান করছে। একথা বিশ্বাস করতে অসহ্য লাগছে যে-মানুষটিকে সে ভালোবাসে সে একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি।

রিজের ডেস্কে এনগেজমেন্ট-বুকটা চোখে পড়ল এলিজাবেথের। সেপ্টেম্বর মাসের পাতায় চলে এল যেদিন জিপ-অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল। ক্যালেন্ডারে নাইরোবি লেখা। রিজের পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখবে এলিজাবেথ, সত্যি ও সেখানে গিয়েছিল কি না। মনে অপরাধবোধ নিয়ে রিজের ডেস্ক ঘাঁটতে লাগল পাসপোর্টের জন্য।

রিজের ডেস্কের নিচের ড্রয়ার তালা বন্ধ। ইতস্তত করল এলিজাবেথ। জানে তালা ভাঙার অধিকার নেই ওর। এতে বিশ্বাসের অমর্যাদা করা হবে। একটি নিষিদ্ধ সীমানা পার হতে হবে যেখান থেকে আর ফিরে আসার উপায় নাও থাকতে পারে। তবে রিজ বুঝতে পারবে সে এ-কাজ কেন করেছে। এলিজাবেথ তাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে। লেটার-ওপেনার দিয়ে তালা ভেঙে ফেলল ও। কাঠের ছিলকা ছড়িয়ে পড়ল।

ড্রয়ারভর্তি কাগজপত্র। একটা খামে মেয়েলি হাতের লেখা। রিজকে উদ্দেশ করে প্যারিস থেকে লিখেছে কেউ। তবে চিঠি নয়, এলিজাবেথের নজর কেড়ে নিল রিপোর্টটা। সেই চুরি করা রিপোর্ট। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা :

মি. স্যাম রোফ
গোপনীয়
কোনো কপি নেই

ঘরটা বনবন ঘুরতে লাগল, ডেস্কের কিনারা হাত দিয়ে চেপে ধরল এলিজাবেথ। নইলে মাথা ঘুরে পড়ে যেত। চোখ বুজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুস্থির হওয়ার জন্য। খুনির মুখটা এখন দেখতে পাচ্ছে সে। ওর স্বামীর মুখ।

দূর থেকে ভেসে আসা টেলিফোনের শব্দে ভেঙে গেল নীরবতা। আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগল এলিজাবেথের। ধীরপায়ে ফিরে এল নিজের অফিসে। ফোন তুলল।

লবির অ্যাটেনডেন্ট। উৎফুল্ল গলায় বলল, 'আপনি অফিসে আছেন কি না জানার জন্য, মিসেস উইলিয়ামস। মি. উইলিয়ামস আসছেন।'

আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য।

রিজের মুখোমুখি হতে পারবে না এলিজাবেথ। ও কিছু জানে না এমন ভান করতে পারবে না। রিজ ওকে দেখামাত্র সব বুঝে ফেলবে। এলিজাবেথকে পালাতে হবে। অন্ধকারে পার্স আর কোট নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তে গেল এলিজাবেথ। থমকে দাঁড়াল। একটা জিনিস নিতে ভুলে গেছে। ওর পাসপোর্ট। রিজের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে ওকে। এমন কোথাও যেখানে রিজ ওর খোঁজ পাবে না।

আবার ডেস্কে ফিরে এল এলিজাবেথ। পাসপোর্ট নিয়ে ছুটতে শুরু করল করিডোরে। দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড, যেন ফেটে যাবে। প্রাইভেট লিফট ওপরে উঠে আসছে।

আট...নয়... দশ।

এলিজাবেথ ছুটে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে প্রাণের ভয়ে।

আটচল্লিশ

সিভিটাভেচ্চিয়া এবং সার্ডিনিয়ার মাঝখানে একটা ফেরিঘাট আছে, যাত্রী আর গাড়ি পারাপার করে। এলিজাবেথ রেন্টাল কার নিয়ে আরও কয়েক ডজন গাড়ির মধ্যে মিশে গেল। এয়ারপোর্টে রেকর্ড রাখা হয়, তবে প্রকাণ্ড বোটটিতে সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। শত শত যাত্রীর মধ্যে এলিজাবেথও একজন, যে সার্ডিনিয়ার দ্বীপে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। জানে ওর কেউ পিছু নেয়নি, তবু অজানা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। রিজ এতদূর এগিয়ে গেছে যে কেউ এখন ওকে থামাতে পারবে না। এলিজাবেথই একমাত্র ওর মুখোশ খুলে দিতে পারে। কাজেই এলিজাবেথকে সে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে।

অফিস থেকে পালিয়ে আসার পর এলিজাবেথ জানত না কোথায় যাচ্ছে। শুধু জানত তাকে জুরিখ থেকে পালাতে হবে। লুকিয়ে থাকতে হবে কোথাও। রিজ ধরা না-পড়া পর্যন্ত সে নিরাপদ নয়। সার্ডিনিয়া। প্রথমে এ-জায়গাটার নামই মনে এল। একটা ছোট গাড়ি ভাড়া করেছে এলিজাবেথ, এরপর ইতালি যাওয়ার পথে ফোনবুথ থেকে অ্যালেককে ফোন করেছে। পায়নি। ম্যাসেজ রেখেছে। বলেছে অ্যালেক যেন সার্ডিনিয়ায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ডিটেকটিভ ম্যাক্স হোরনাংকে না-পেয়ে একই ম্যাসেজ রেখেছে তার জন্যও।

সার্ডিনিয়ার ভিলায় থাকবে এলিজাবেথ। তবে একা নয়। পুলিশ ওকে পাহারা দেবে।

ফেরিঘাট ওলবিয়ায় পৌঁছুল। পুলিশের কাছে যাওয়ার দরকার পড়ল না এলিজাবেথের। ডিটেকটিভ ব্রুনো কামপাংগা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। কামপাংগা এলিজাবেথের গাড়ির কাছে এসে বলল, 'আমরা আপনার জন্য খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম, মিসেস উইলিয়ামস।'

অবাক-চোখে তার দিকে তাকাল এলিজাবেথ।

'সুইস পুলিশের কাছ থেকে ফোন পেয়েছি আমরা', ব্যাখ্যা করল কামপাংগা। 'তারা আপনাকে পাহারা দিয়ে রাখতে অনুরোধ করেছে। আমরা সমস্ত বোট এবং এয়ারপোর্টের ওপর নজর রাখছি।'

কৃতজ্ঞ বোধ করল এলিজাবেথ। ম্যাক্স হোরনাং! সে ওর ম্যাসেজ পেয়েছে। ডিটেকটিভ কামপাংগা এলিজাবেথের ক্লান্ত মলিন চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি গাড়ি চালাই?'

'প্লিজ', কৃতজ্ঞ গলায় বলল এলিজাবেথ।

সে প্যাসেঞ্জার সিটে সরে গেল। লম্বা ডিটেকটিভ হুইলের পেছনে বসল। 'কোথায় যাবেন— থানায় নাকি আপনার বাড়িতে?'

'আমার বাড়িতে। আমার সঙ্গে যদি কেউ থাকত। আ-আমি ওখানে একা থাকতে চাই না।'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কামপাংগা। 'ভাববেন না। আমি রাতে আপনার সঙ্গে থাকব। আপনার বাড়ির কাছে একটি রেডিও কারও রাখা হবে। কেউ আপনার ধারেকাছে আসতে পারবে না।'

স্বস্তিবোধ করল এলিজাবেথ। ডিটেকটিভ কামপাংগা ওলবিয়ার সরু রাস্তায় দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে। এদিকে রিজের সঙ্গে কৈশোরে এসেছে এলিজাবেথ। জিজ্ঞেস করল, 'আমার— আমার স্বামীর কোনও খবর আছে?'

কামপাংগা একবার এলিজাবেথের দিকে তাকাল, এরপর দৃষ্টি ফেরাল রাস্তায়। 'উনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তবে পালিয়ে থাকতে পারবেন না। কাল সকালের মধ্যে তাকে আমরা ধরে ফেলব।'

স্বস্তির বদলে বুকের মধ্যে বেদনার কাঁটা বিঁধল খচ করে। রিজকে ওরা তাড়া করেছে। অথচ মানুষটাকে ও কত বিশ্বাস করত! শিউরে উঠল ও। কামপাংগা জিজ্ঞেস করল, 'শীত করছে?'

'না। আমি ঠিক আছি।' এক ঝলক গরম হাওয়া ঝাপটা দিয়ে গেল মুখে। কামপাংগা বলল, 'ঝড় আসবে। সিরোক্কো।'

এক ঘণ্টা পর ভিলার কাছাকাছি চলে এল ওরা। ড্রাইভওয়েতে মোড় নিল কামপাংগা। খালি গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে বন্ধ করল ইঞ্জিন। এলিজাবেথের দিকের দরজা খুলে বলল, 'আপনি আমার পেছন পেছন থাকবেন, মিসেস উইলিয়ামস।'

'ঠিক আছে', বলল এলিজাবেথ।

অন্ধকার বাড়ির সদর-দরজার দিকে পা বাড়াল ওরা। কামপাংগা বলল, 'আমি জানি না সে এখানে আছে কি না। তবু কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। চাবিটা আমাকে দিন।'

দরজার চাবি গোয়েন্দার হাতে দিল এলিজাবেথ।

একহাতে বন্দুক বাগিয়ে ধরে অন্যহাতে দরজার তালা খুলল। তারপর সুইচ টিপে বাতি জ্বালল। আলোর বন্যায় ভেসে গেল ঘর।

'আপনি আমাকে বাড়িটি ঘুরিয়ে দেখাবেন।' বলল কামপাংগা। 'প্রতিটি ঘর আমি পরীক্ষা করে দেখব। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

প্রতিটি ঘর, ক্লজিট দেখল সে। দরজা-জানালা বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করল। তারপর হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে জানাল রাতটা সে ভিলায় কাটাচ্ছে। ড্রাইভওয়েতে একটা ক্রুজার পাঠিয়ে দিতে বলল।

একটা চেয়ারে বসল এলিজাবেথ। নার্ভাস লাগছে খুব। ও হয়তো নিরাপদ থাকবে। কিন্তু কাল সকালের মধ্যে হয়তো রিজ মারা যাবে কিংবা ওকে জেলে ঢুকতে হবে। কামপাংগা এলিজাবেথের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখে বলল, 'আমি কফি খাব। আপনার জন্যে বানাই এক কাপ?' মাথা দোলাল এলিজাবেথ। 'আমি বানিয়ে দিচ্ছি।' উঠতে গেল সে, বাধা দিল গোয়েন্দা। 'আপনি বসুন, মিসেস উইলিয়ামস। আমার বৌ বলে আমি নাকি পৃথিবীর সেরা কফি বানাই।'

কষ্ট করে মুখে হাসি ফোটাল এলিজাবেথ। 'ধন্যবাদ।' আবার শরীর এলিয়ে দিল চেয়ারে। রিজের কথাই শুধু মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। রিজ কি সত্যি খুনি? মন যে মানে না। রিজ এ মুহূর্তে কোথায়? পুলিশ ওকে ধরতে পারলেই মেরে ফেলবে ভাবতে কান্না পেয়ে গেল ওর। ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

'মিসেস উইলিয়ামস....' ডিটেকটিভ কামপাংগা কফির কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। 'নিন। এটা খান। ভালো লাগবে।'

'আ-আমি দুঃখিত' বলল এলিজাবেথ।

নরম গলায় বলল গোয়েন্দা, 'না, ঠিক আছে।'

গরম কফিতে চুমুক দিল এলিজাবেথ। কামপাংগা কিছু একটা মিশিয়েছে এতে। ও তাকাল। হাসল গোয়েন্দা। 'সামান্য স্কচ দিয়েছি।'

ওর সামনে নীরবে বসে রইল লোকটা। তার প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করল এলিজাবেথ। একা থাকতে পারবে না ও। অন্তত রিজ বেঁচে আছে না মরে গেছে না-জানা পর্যন্ত। কফি শেষ করল ও।

ঘড়ি দেখল কামপাংগা। 'পেট্রোল কার যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসবে। দুজন সারারাত বাড়ি পাহারা দেবে। আমি নিচে আছি। আপনি ওপরে গিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করুন।'

বাধ্য মেয়ের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠল এলিজাবেথ। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। বিছানায় শুতেই রাজ্যের ঘুম নেমে এল চোখে। যদিও জেগে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করল ও, কিন্তু তীব্র ক্লান্তি ওকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেঙে গেল তীব্র চিৎকারে।

উনপঞ্চাশ

বিছানায় উঠে বসল এলিজাবেথ, ধড়ফড় করছে বুক। আবার চিৎকারটা শুনতে পেল। ভৌতিক, তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আর্তনাদ। জানালার বাইরে দিয়ে আসছে। কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। টলতে টলতে জানালার সামনে গেল এলিজাবেথ। উঁকি দিল। ঠাণ্ডা শীতের চাঁদ আলো বিলোচ্ছে। গাছগুলো কালো, তীব্র বাতাসের আঘাতে নাচছে ডালপালা। অনেকটা দূরে টগবগ করে ফুটছে সমুদ্র।

আবার শোনা গেল চিৎকার। আবারও। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল এলিজাবেথ। পাথরের গায়ে বাড়ি খেয়ে আর্তনাদ তুলছে বাতাস। ঝড় এসেছে। এর নাম সিরোক্কো। প্রবল ঘূর্ণিবাতাস। পাথরের খাঁজের মাঝ দিয়ে বয়ে যাবার সময় মেরুদণ্ড-হিম-করা শব্দটা সৃষ্টি করছে। এলিজাবেথের মনে হল রিজ যেন চিৎকার করে ওর কাছে সাহায্য চাইছে। আর সহ্য করতে পারল না ও। কানে হাত চাপা দিল। কিন্তু মুক্তি পেল না শব্দের অত্যাচার থেকে।

বেডরুমের দরজার দিকে পা বাড়াল এলিজাবেথ। খুব দুর্বল লাগছে শরীর। হলওয়ে দিয়ে হেঁটে এল, তাকাল নিচে। মাথাটা ঘুরছে, যেন ড্রাগ দেয়া হয়েছে ওকে। ডিটেকটিভ কামপাংগাকে ডাকার চেষ্টা করল, গলা দিয়ে ব্যাঙের কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল এলিজাবেথ, ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। জোরে ডাকল, 'ডিটেকটিভ কামপাংগা।' কোনও জবাব নেই। টলতে টলতে লিভিংরুমে ঢুকল এলিজাবেথ। গোয়েন্দা নেই এখানে। একের-পর-এক ঘর খুঁজল ও, আসবাবগুলো ধরে ধরে এগোল যাতে পড়ে না যায়।

ডিটেকটিভ কামপাংগা বাড়িতে নেই।

ও একা।

হলওয়েতে দাঁড়িয়ে রইল এলিজাবেথ। কী করবে বুঝতে পারছে না। কামপাংগা হয়তো টহলগাড়ির পুলিশদের সঙ্গে কথা বলতে গেছে। তাই হবে নিশ্চয়। সদরদরজার সামনে এগিয়ে গেল এলিজাবেথ। খুলল। তাকাল বাইরে। ওখানে কেউ নেই। শুধু কালো রাত আর বুনো বাতাসের গর্জন। ভয়ে ছমছম করল শরীর, ঘুরল এলিজাবেথ, ফিরে এল স্টাডিতে। থানায় ফোন করে জানবে কী হয়েছে। ফোন তুলল, লাইন ডেড।

এমন সময় নিভে গেল বাতি।

পঞ্চাশ

লন্ডনে, ওয়েস্ট মিনস্টার হাসপাতালে অপারেশন রুম থেকে বের করে আনার সময় জ্ঞান ফিরে পেল ভিভিয়ান নিকলস। অপারেশনে আট ঘণ্টা সময় লেগেছে। দক্ষ সার্জনদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভিভিয়ান আর হাঁটতে পারবে না। প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে জ্ঞান ফিরল তার, ফিসফিস করে বারবার অ্যালেকের নাম ধরে ডাকল, অ্যালেককে তার পাশে এখন খুব দরকার। ভিভিয়ান শুনতে চায় অ্যালেক তাকে ছেড়ে কখনও চলে যাবেন না। কিন্তু হাসপাতালের কর্মচারীরা অ্যালেককে কোথাও খুঁজে পেল না।

বার্লিনে, শহরের বাইরে একটি ব্যয়বহুল, প্রাইভেট স্যানাটোরিয়ামের দামি ওয়েটিংরুমে বসে আছে ভালথার গাসনার। দশ ঘণ্টা ধরে পাথরের মূর্তি হয়ে আছে সে। কিছুক্ষণ পরপর নার্স কিংবা অ্যাটেনডেন্টরা তার সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে খেতে অনুরোধ করল। কিন্তু তাদের কথা কানে গেল না ভালথারের। সে অ্যানার জন্য অপেক্ষা করছে। দীর্ঘ এক প্রতীক্ষা।

ওলগিয়াটায় সিমোনেটা পালাজ্জি ফোনে এক মহিলার কথা শুনছে। 'আমার নাম ডোনাটেলা স্পোলিনি', বলল কণ্ঠটি। 'আপনার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি, মিসেস পালাজ্জি। তবে একটা ব্যাপারে আমাদের মিল আছে। বালাগনিজে পিয়াজ্জা ডেল পোপোলোতে আসুন একসঙ্গে লাঞ্চ করি। কাল বেলা একটায়।'

সিমোনেটা কাল বিউটিপার্লারে যাবে। কিন্তু মহিলার ফোন করার রহস্য তাকে জানতে হবে। 'আমি থাকব ওখানে।' বলল সে। 'কিন্তু আপনাকে চিনব কী করে?'

'আমার সঙ্গে আমার তিন ছেলে থাকবে।'

নো ভেসিনেটে, নিজের ভিলায় হেলেন রোফ মার্টেল একটি চিঠি পড়ছে। ড্রইংরুমে ম্যান্টলপিসের ওপর ছিল চিরকুটটি। চার্লস লিখেছে। সে ওকে ছেড়ে চলে গেছে।

'আমার দেখা আর কোনোদিনই পাবে না তুমি', চিঠিতে লেখা, 'আমাকে খোঁজার চেষ্টা কোরো না।'

হেলেন ছিঁড়ে ফেলল চিঠি। চার্লসকে সে খুঁজে বের করবে।

রোমে, ম্যাক্স হোরনাং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমানবন্দরে এসেছে। গত দুঘণ্টা ধরে সার্ডিনিয়ায় ফোন করার চেষ্টা করছে । কিন্তু ঝড়ের কারণে ভেঙে পড়েছে

যোগাযোগব্যবস্থা। ম্যাক্স ফ্লাইট অপারেশন অফিসে গিয়ে এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকে বলল, 'আমাকে প্লেনে সার্ডিনিয়ায় পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিন। বিশ্বাস করুন এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।'

এয়ারপোর্ট ম্যানেজার বলল, 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি, সিনর। কিন্তু কিছু করতে পারব না। সার্ডিনিয়ার এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফেরিবোট পর্যন্ত যাচ্ছে না। ঘূর্ণিঝড় শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ওই দ্বীপে কোনোকিছু যাবে না, দ্বীপ থেকে কিছু আসবেও না। যোগাযোগব্যবস্থা চালু হতে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা সময় লাগবে।

এলিজাবেথ উইলিয়ামস ১২ ঘণ্টা বাঁচবে না।

একান্ন

অন্ধকার ভয়ানক। অদৃশ্য শত্রুরা ওকে আঘাত করার জন্য অপেক্ষা করছে। এলিজাবেথ বুঝতে পারছে ওর বাঁচা-মরা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ওদের দয়ার ওপর। ডিটেকটিভ কামপাংগা ওকে এখানে নিয়ে এসেছে খুন হতে দেয়ার জন্য। সে রিজের লোক। কামপাংগা ওকে ইচ্ছে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সে হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করেনি। করেছে রিজের কাছে। ফোন করে জানিয়েছে ওরা ভিলায় আছে।

ওকে পালাতে হবে। কিন্তু গায়ে শক্তি নেই। চোখ খুলে রাখাই দায়, হাত-পা পাথরের মতো ভারী। কামপাংগা ওর কফিতে ড্রাগ মিশিয়েছে। ও রান্নাঘরে ঢুকল। একটা গ্লাসে খানিক ভিনেগার আর পানি মিশিয়ে পান করল। একটু পর সামান্য ভালো বোধ হতে লাগল। কিন্তু এখনো দুর্বল শরীর। কাজ করতে চাইছে না মস্তিষ্ক। 'না', মনে-মনে বলল এলিজাবেথ, 'এভাবে তুমি মরতে পারো না। তোমাকে লড়াই করতে হবে।'

হঠাৎ এক ঝলক বাতাস ঢুকল ঘরে। আর তক্ষুনি এলিজাবেথ বুঝতে পারল ও একা নয় বাড়িতে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্টের মার্সি এলাকায় একটি হেলিকপ্টার নামল। পাইলট দরজা খুলে নামতে তার দিকে এগিয়ে গেল ম্যাক্স হোরনাং। 'আমাকে সার্ডিনিয়া নিয়ে যেতে পারবেন?'

পাইলট স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। 'ব্যাপারটা কী? আমি এইমাত্র একজনকে নামিয়ে দিয়ে এলাম ওখানে। ভয়ানক ঝড় হচ্ছে সার্ডিনিয়ায়।'

'আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন কি না বলুন?'

'তিন গুণ বেশি ভাড়া লাগবে।'

দ্বিধা করল না ম্যাক্স। উঠে পড়ল হেলিকপ্টারে। কপ্টার আকাশে উড়াল দেয়ার পর ম্যাক্স পাইলটকে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে সার্ডিনিয়ায় পৌঁছে দিলেন?'

'তার নাম উইলিয়ামস।'

আঁধার এখন এলিজাবেথের বন্ধু। ওকে ওর শত্রুর হাত থেকে আড়াল করে রেখেছে। এখন আর পালাবার উপায় নেই। বাড়ির কোথাও লুকিয়ে পড়ার জায়গা

খুঁজেছে এলিজাবেথ। উপরে গিয়েছিল। সিঁড়ির মাথায় উঠে ইতস্তত করে ঢুকেছে বাপের শোবার ঘরে। অন্ধকার থেকে কিছু একটা লাফিয়ে উঠে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ওকে। চিৎকার শুরু করেছিল এলিজাবেথ। ওটা বাতাসে উদ্বাহু নৃত্য করা গাছের ছায়া বুঝতে পেরে থেমে গেছে। এমন জোরে হৃৎপিণ্ড বাড়ি খাচ্ছিল পাঁজরে মনে হচ্ছিল নিচতলা থেকে রিজ শুনতে পাবে শব্দ।

হলঘরের শেষ মাথার বেডরুমে ঢুকে ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিল এলিজাবেথ। দরজার সঙ্গে আসবাব ঠেকাল। কাঠের টেবিল, একটা আর্মচেয়ার, তারপর আরও একটা টেবিল। নিচতলা থেকে কিছু একটা ভাঙার শব্দ শোনা গেল। রিজ বেডরুমের দরজা ভেঙে ওকে খুঁজছে। কিন্তু রিজ যদি ওর মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে প্রমাণ করতে চায় তাহলে দরজা ভাঙবে কেন? ফ্রেঞ্চডোর দিয়ে বাইরে তাকাল এলিজাবেথ। গর্জাচ্ছে ঝড়ো বাতাস। ঝুলবারান্দার নিচে ঝপ করে নেমে গেছে ঢাল, ছুঁয়েছে সাগর। এ ঘর থেকে পালানো যাবে না। রিজ এখানে আসবে ওকে ধরতে। একটা অস্ত্রের বড় দরকার এলিজাবেথের। কিন্তু এমন কিছু পাওয়া গেল না যার সাহায্যে শত্রুকে ঠেকানো যায়। অন্ধকারে সে তার খুনির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু রিজ কিসের জন্য অপেক্ষা করছে? দরজা ভেঙে ওকে ধরতে আসছে না কেন? ও ভাবতে লাগল : রিজ আসলে কী প্ল্যান করেছে। এমন কোনো পরিকল্পনা নিশ্চয় রিজের আছে যাতে এলিজাবেথের মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশের কোনো সন্দেহ না জাগে। রিজের কথা ভাবছে এলিজাবেথ, নাকে ধাক্কা দিল ধোঁয়ার গন্ধ।

বায়ান্ন

হেলিকপ্টার থেকে ম্যাক্স সার্ডিনিয়ার উপকূল দেখতে পাচ্ছে। লাল ধুলোর ঘূর্ণয়মান ঘন কম্বলে ঢাকা। রোটর ব্লেডের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচাল পাইলট। 'অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। জানি না ল্যান্ড করতে পারব কি না।'

'পারতেই হবে।' ম্যাক্সও চেঁচাল। 'পোর্টো কার্ভোর দিকে চলুন।'

ম্যাক্সের দিকে ঘুরে তাকাল পাইলট। 'ওটা পাহাড়চুড়োয়।'

'জানি আমি', বলল ম্যাক্স। 'নামতে পারবেন?'

'আমাদের চান্স সত্তর-ত্রিশ।'

দরজার নিচ থেকে গড়িয়ে ঢুকছে ধোঁয়া, মেঝের ফাঁক দিয়েও উঠছে। নতুন একটা শব্দ যোগ হয়েছে আর্তনাদের সুর তোলা বাতাসের সঙ্গে। আগুনের শিখার গর্জন। ফাঁদে পড়ে গেছে এলিজাবেথ। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ি এবং সে কোনোকিছুর চিহ্ন থাকবে না। আগুনে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে যেভাবে ল্যাবরেটরিতে শেষ হয়ে গিয়েছিল এমিল জোয়েপলি। রিজের কাছে পরাজিত হতে হল এলিজাবেথকে। ওর কাছে সবাই পরাজিত হয়েছে। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসছে এলিজাবেথের। দরজায় আগুনের হলুদ জিভ দেখতে পেল সে। উত্তাপ টের পাচ্ছে।

প্রচণ্ড রাগ শক্তি জোগাল এলিজাবেথের গায়ে।

চোখ-অন্ধ-করা ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে ফ্রেঞ্চডোরের দিকে হেঁটে এগোল ও। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল, পা রাখল ঝুলবারান্দায়। দরজা খোলামাত্র হলওয়ের অগ্নিশিখা ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে পড়ল। দেয়ালে ছোবল দিল। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথ তাজা বাতাস টানল বুক ভরে। হাওয়ায় ওর পোশাক পতপত করে উড়ছে। নিচে তাকাল ও। ঝুলবারান্দাটা বিল্ডিঙের একপাশ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, অতল খাদের মুখে ঝুলছে যেন একটুকরো দ্বীপ। কোনো আশা নেই, পালাবার পথ নেই। যদি না... মাথার ওপরে স্লেটপাথরের ঢালু ছাদের দিকে তাকাল এলিজাবেথ। কোনোমতে ছাদে উঠতে পারলে বাড়ির অপরপাশে যেতে পারবে সে। ওদিকটাতে এখনও আগুন লাগেনি। হাত উঁচু করে ছাদের কিনারা ধরার চেষ্টা করল এলিজাবেথ। কিন্তু ওটা নাগালের বাইরে। আগুনের শিখা নাচতে নাচতে কাছিয়ে

আসছে ঘরটাকে গ্রাস করে। একটা উপায় এখনও আছে। সেটাই কাজে লাগাল এলিজাবেথ। জোর করে দৃষ্টি ফেরাল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন জ্বলন্ত ঘরের দিকে। ডেস্কের পেছন থেকে বাবার চেয়ারটা টেনে নিয়ে এল ঝুলবারান্দায়। উঠে দাঁড়াল ওটার ওপর। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করা গেল ছাদ তবে মুঠো করে ধরতে পারল না। অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগল এলিজাবেথ।

ঘরের ভেতর পর্দায় আগুন ধরে গেছে, হামলা চালিয়েছে বইপত্র, কার্পেট এবং আসবাবে। শিখা নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে ব্যালকনির দিকে। এলিজাবেথের আঙুল হঠাৎ ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা শ্লেট খুঁজে পেল। হাত ব্যথায় টনটন করছে, জানে না ধরে রাখতে পারবে কি না। নিজেকে টেনে তুলতে লাগল এলিজাবেথ, টের পেল চেয়ারটা পড়ে যাচ্ছে। শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে নিজেকে ছাদের উপর টেনে তুলল এলিজাবেথ। চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল বেদম। তারপর জোর করে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল ইঞ্চি ইঞ্চি করে। পিছলে গেলেই নিচের অতল খাদে পড়ে যাবে। ছাদের মাথায় চলে এল এলিজাবেথ। ব্যালকনি দাউদাউ জ্বলছে। এখন আর ওখানে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।

বাড়ির দূরপ্রান্তে তাকাল এলিজাবেথ। গেস্ট বেডরুমের ঝুলবারান্দা দেখতে পেল। ওখানে আগুন জ্বলছে না। তবে ওখানে পৌঁছুতে পারবে কি না জানে না এলিজাবেথ। ছাদ খাড়াভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে, শ্লেটগুলো আলগা, বাতাস ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চাইছে। পিছনে গেলে আর রক্ষা নেই। ও যেখানে বসেছিল মূর্তি হয়ে থাকল সেখানেই। চেষ্টা করতে ভয় পাচ্ছে।

এমন সময় অলৌকিক ঘটনার মতো গেস্ট ব্যালকনিতে একটা মূর্তি উদয় হল। অ্যালেক। উপরের দিকে তাকালেন তিনি, শান্তগলায় বললেন, 'তুমি পারবে, বুড়ি। আস্তে আস্তে এসো।'

এলিজাবেথের বুকটা মোচড় দিল। ওকে আদর করে 'বুড়ি' ডাকেন অ্যালেক।

'আস্তে নামো', পরামর্শ দিলেন অ্যালেক। 'প্রতিবারে একটা পা ফেলবে। কোনও সমস্যা হবে না।'

এলিজাবেথ এগোতে শুরু করল। সাবধানে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়ল। শ্লেটপাথরের একটা অবলম্বন না-পাওয়া পর্যন্ত আগেরটা ছাড়ল না। মনে হল অনন্তকাল সময় লাগছে। অ্যালেক সারাক্ষণ ওকে সাহস জুগিয়ে গেলেন। ঝুলবারান্দার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, একটা পাথর আলগা হয়ে গেল। পিছলে পড়ে যেতে শুরু করল এলিজাবেথ।

'ধরো।' চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যালেক।

এলিজাবেথ আরেকটা খাঁজ খুঁজে পেল, প্রাণপণে চেপে ধরল ওটা। ছাদের একেবারে কিনারে চলে এসেছে ও, নিচে হাঁ করে আছে খাদ। অ্যালেক যেখানটাতে

দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে নিজেকে খসে পড়তে দিতে হবে। যদি হিসেবে ভুল হয়ে যায়...

অ্যালেক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, চেহারায় আত্মবিশ্বাস, 'নিচে তাকিয়ো না।' বললেন তিনি। 'চোখ বোজো এবং খসে পড়ো। আমি তোমাকে ক্যাচ করব।'

চেষ্টা করল এলিজাবেথ। গভীর দম নিল ও, তারপর আরেকটা। ওকে এখন খসে যেতে হবে জানে তবু কাজটা করতে সাহস পাচ্ছে না। টাইলসে ধরা আঙুল ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে।

'এখন !' চেঁচালেন অ্যালেক। অবলম্বন ছেড়ে দিল এলিজাবেথ, শূন্যে খসে পড়তে লাগল। হঠাৎ টের পেল অ্যালেকের বাহুর মধ্যে সে। তিনি ওকে নিরাপদ টেনে নামিয়েছেন।

স্বস্তিতে চোখ বুজল এলিজাবেথ।

'চমৎকার।' বললেন অ্যালেক।

এলিজাবেথ টের পেল তার মাথায় বন্দুকের নল ঠেসে ধরা হয়েছে।

তেপান্ন

বাতাসের হামলা এড়াতে খুব নিচু দিয়ে উড়ছে হেলিকপ্টার, প্রায় গাছের মাথা ছুঁয়ে। এত নিচেও ঝড়ের উন্মত্ততা থেমে নেই। পাইলট দূরে, পাহাড়চুড়োয় পোর্টো কার্ভো দেখতে পেল। ম্যাক্সও একই সঙ্গে দেখল। 'ওই তো ওটা।' চেঁচাল সে। 'ভিলা দেখতে পাচ্ছি আমি।' তারপর যে-দৃশ্য দেখতে পেল, ধক করে উঠল বুক। ভিলায় আগুন লেগেছে।

বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল এলিজাবেথ। মুখ তুলে চাইল। অ্যালেক ওদিকে নজর দিলেন না। তিনি এলিজাবেথকে দেখছেন, তার চোখে বেদনার ছায়া। 'এটা ভিভিয়ানের জন্যই। ভিভিয়ানের জন্য এটা করতে হল আমাকে। তুমি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? তোমাকে ওরা আগুনের মধ্যে আবিষ্কার করবে।'

এলিজাবেথ শুনছে না। শুধু ভাবতে পারছে। রিজ নয়। এসব রিজের কাজ নয়। সবকিছুর পেছনে ছিলেন অ্যালেক। অ্যালেক ওর বাবাকে খুন করেছেন এবং ওকে হত্যার চেষ্টা করেছেন। উনিই রিপোর্ট চুরি করে ফাঁসিয়ে দিতে চেয়েছেন রিজকে। অ্যালেক ওকে রিজের ব্যাপারে আতঙ্কিত করে তুলেছেন। কারণ তিনি জানতেন এলিজাবেথ এখানে আসবে।

হেলিকপ্টারটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অ্যালেক বললেন, 'চোখ বোজো, এলিজাবেথ।'

ভয়ংকর গলায় বলে উঠল এলিজাবেথ— 'না।'

রিজের গলা ভেসে এল, 'বন্দুক ফেলে দাও, অ্যালেক।' দুজনেই তাকাল নিচের দিকে। লনে, আগুনের আলোয় রিজ আর পুলিশপ্রধান লুইগি ফেরারোকে দেখা গেল আধডজন সশস্ত্র গোয়েন্দার সঙ্গে।

'সব শেষ, অ্যালেক', চেঁচাল রিজ। 'ওকে ছেড়ে দাও।'

টেলিস্কোপ রাইফেল হাতে এক গোয়েন্দা বলল, 'ভদ্রমহিলা লোকটার সামনে থেকে সরে না দাঁড়ালে আমি গুলি করতে পারছি না।'

'সরো', প্রার্থনা করল রিজ, 'সরে যাও।'

গাছের আড়াল থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল ম্যাক্স হোরনাং। রিজের সামনে এসে থমকে গেল উপরের দৃশ্য দেখে।

রিজ বলল, 'আপনার ম্যাসেজ আমি পেয়েছি। তবে আসতে দেরি হয়ে গেল।' দুজনেই ঝুলবারান্দায় মূর্তিদুটোর দিকে তাকিয়ে আছে। ভিলার দূরপ্রান্তের আগুনের আলোয় ওদেরকে পুতুলের মতো লাগছে। বাতাস পেয়ে আগুন বাড়িটাকে প্রকাণ্ড একটা মশালে পরিণত করেছে। আশপাশের পাহাড়গুলোও আলোকিত রাতটাকে নরকে পরিণত করেছে।

ঘুরল এলিজাবেথ, তাকাল অ্যালেকের দিকে। মুখ না যেন মৃত্যুর মুখোশ, চোখ দেখা যাচ্ছে না। অ্যালেক ওর পাশ থেকে সরে ব্যালকনির দরজার দিকে ঘেঁষে দাঁড়ালেন। লনের গোয়েন্দা বলল, 'এবার পেয়েছি ওকে।' রাইফেল তুলল সে। একবার গুলি করল। টলে উঠলেন অ্যালেক, তারপর দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একমুহূর্ত আগে দুজন মানুষ ছিল ব্যালকনিতে, এখন একজন।

এলিজাবেথ চেঁচিয়ে উঠল, 'রিজ।' রিজ ইতিমধ্যে ওকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে।

তারপর সবকিছু ফাস্টমোশন ছবির মতো দ্রুত ঘটতে লাগল। রিজ এলিজাবেথকে কোলে তুলে নিল, স্বামীকে শক্তহাতে জড়িয়ে থাকল ও।

এলিজাবেথকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিল রিজ, এখনও চোখ বোজা, রিজ ওর হাত ধরে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, লিজ। তোমাকে ভালোবাসি, সোনা।'

এলিজাবেথ ওর গলা শুনছে, আদর টের পাচ্ছে শরীরে। কিন্তু কথা বলতে পারছে না। ওর চোখে চোখ রাখল এলিজাবেথ। ভালোবাসা আর বেদনা চোখে। ওকে অনেক কথা বলার আছে এলিজাবেথের। স্বামীকে সন্দেহ করার অপরাধবোধে ভুগছে সে। সারাটা জীবন ওর লাগবে এ অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে।

তবে এ নিয়ে এখন ভাবতে চায় না এলিজাবেথ। ওর কাছে এখন সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হল রিজ আর ও একসঙ্গে আছে। ওর শক্তিশালী বাহু ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। চিরজীবনের জন্য।

চুয়ান্ন

এ যেন জ্বলন্ত নরকের মধ্যে প্রবেশ। ধোঁয়া ক্রমে ঘন হয়ে উঠছে, নাচছে অগ্নিশিখা। অ্যালেকের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ছে, তার চুল পুড়িয়ে দিয়েছে। আগুনের শিখার শব্দ ভিভিয়ানের কণ্ঠ বলে মনে হল অ্যালেকের কাছে।

তীব্র উজ্জ্বল আলোর মধ্যে হঠাৎ ওকে দেখতে পেলেন তিনি। বিছানা থেকে নামছে, অপূর্ব নগ্ন শরীর, শুধু ঘাড়ে লাল একটি ফিতে বাঁধা, সেই একই রঙের রিবন যেটা গলায় বেঁধে ভিভিয়ান প্রথম প্রেম করেছিল তাঁর সঙ্গে। অ্যালেকের নাম ধরে আবার ডাকল ভিভিয়ান। সে এবার শুধু অ্যালেককে চাইছে, অন্য কাউকে নয়। তিনি এগিয়ে গেলেন, ভিভিয়ান ফিসফিস করে বলল, 'আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি।'

অ্যালেক বিশ্বাস করলেন একথা। ও যে-কাজগুলো করেছে সেজন্য ওকে শাস্তি পেতে হয়েছে। আর যেসব ভয়ংকর কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন সবই ভিভিয়ানের জন্য। ভিভিয়ানের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, সে আবার ফিসফিস করল। 'আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি।' তিনি জানেন ভিভিয়ান সত্যিকথাই বলেছে।

ভিভিয়ান ওঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি ভিভিয়ানের মাঝে বিলীন হয়ে গেলেন। দুটি শরীর মিলে এক হয়ে গেল। এবার তিনি ওকে তৃপ্তি দিতে পারলেন। তিনি এত আনন্দ পেলেন সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। ওর শরীরের তাপ টের পাচ্ছেন তিনি। বিস্মিত চোখে দেখলেন ভিভিয়ানের গলার লাল রিবন আগুনের জিভে পরিণত হয়ে তাকে আদর করছে। পরমুহূর্তে সিলিং থেকে জ্বলন্ত একটি বিম তার ওপর খসে পড়ল। অ্যালেক জান্তব উল্লাস নিয়ে মারা গেলেন।
